গল্প-ভারতী

সপ্তদশ বর্ষ। মাঘ। ১৩৬৮

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ—

বিশ্ব-সাহিত্য
একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস
স্বামী বিবেকানন্দ (সচিত্র)
প্রাণি জগৎ (সচিত্র)

যেমন গন্ধ
তেমনি স্বাদ

লিলির বার্লি বিস্কুট

টিনে ও কার্টনে
পাওয়া যায়।

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

"চলে নীল শাড়ী
নিঙাড়ি নিঙাড়ি"

কত কবি, কত সাহিত্যিক,
কতভাবে শাড়ীর গুণগান করেছেন,—
কিন্তু আমাদের গর্ব্ব, আমরা কবির
সেই কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিই
আমাদের নিত্য-নতুন-ডিজাইনের সিল্কের
শাড়ী, রঙীন সুতোতে বোনা
এক একটি কবিতা।

ইণ্ডিয়ান
সিল্ক হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা

রোডফাইটার

সাইকেল

টায়ার ও টিউব

ন্যাশনাল রবার ম্যানুফ্যাকচারার্স লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • কানপুর • মাদ্রাজ • কোচিন

PATENT NO. 6554 OF—57

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অতিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর ক'রে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে। রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

• বিনামূল্যে একসেট পলতে
• যে কোন অংশ সহজলভ্য

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

প্রস্তুতকারক :

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

গল্প-ভারতী

শ্রাবণ—১৩৬৮

সম্পাদক :

সহঃ সম্পাদক : শ্রীকল্যাণ রায়

মূল্য—এক টাকা

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড ২১৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে
শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড,
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

"..... কেশ সজ্জায় কিসের দেরি?

লোমা

সাদা চুলকে চিরস্থায়ী কালো ক'রতে—অদ্বিতীয়—

সোল এজেন্ট :এম. এম. খাম্বাটওয়ালা, আমেদাবাদ

এজেন্ট :—শা বভিসী এণ্ড কোং
১২৯ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

সোল এজেন্টস্ :—
এম. এম. খাম্বাটওয়ালা
আমেদাবাদ—১

এজেন্ট :—
শাহ বাভিশী এণ্ড কোং
১২৯, রাধাবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—

ফোন :- ২২-১০১৮

Lord's

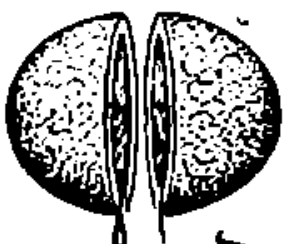

যে কোন উপলক্ষেই

লর্ডের

লজেন্স
ও
টফি

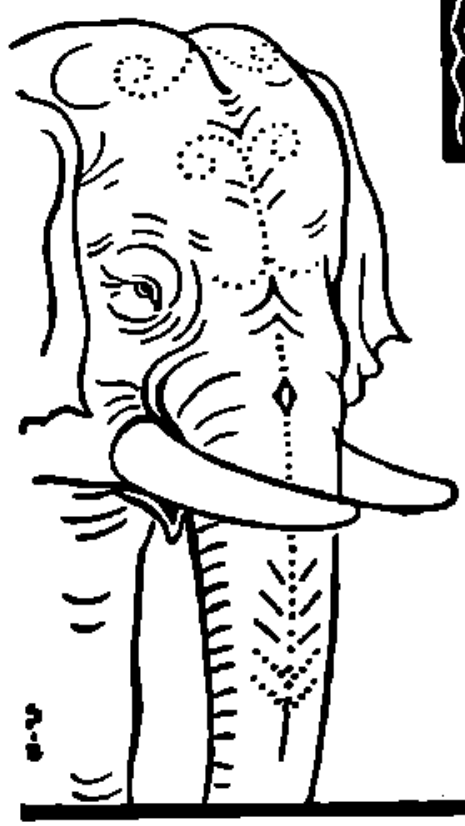

কেশের স্বাস্থ্য

কেশের স্বাস্থ্য রক্ষায় ভৃঙ্গল অতুলনীয়।

ইহা শুধু স্নায়ু সতেজ ও স্নিগ্ধ রাখে না,

মস্তিষ্ক শীতল রাখে ও সুন্দর কাল

কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ভৃঙ্গল

সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

আয়ুর্ব্বেদীয় মতে প্রস্তুত

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, লিঃ

কলিকাতা-২৯

নতুন
জীবনের
নতুন
প্রয়োজন

পূরণ করতে নবজাতকের ও
জননীকে পুষ্টিকর
টনিকের ওপর নির্ভর
করতে হয়।
সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ
ভাইনো-মল্ট
ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায়
সাহায্য করে
এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি
ফিরিয়ে আনে।

ভাইনো-মল্ট

বেঙ্গল
ইমিউনিটি
কোং, লিঃ

আপনি নিশ্চয়ই

ভুল করিবেন না

যদি আপনি

আপনার জীবন ও সৌন্দর্য্য
এতই মূল্যবান যে তাহা নিয়ে জুয়া খেলা চলেনা—কিন্তু
ভাগ্য লইয়া যদি ছিনিমিনি খেলিতে চান—
তবে আপনার সৌন্দর্য্য বাদ দিয়া যে কোন
জিনিষ নিয়া জুয়া খেলিতে পারেন।
যদি একবার আপনার রূপ লাবণ্যকে অবহেলা করেন
হাজার কান্নাকাটিতেও উহা আর ফিরিয়া পাইবেন না।
"আফ্‌গান স্নো" প্রসাধনী ব্যবহার করিয়া আপনার
সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হউন।
এগুলি সত্যই ভাল.....
নির্ভরযোগ্য.....এবং সুলভ।

ক্রয় করেন

আফ্‌গান স্নো

প্রসাধন দ্রব্যাদি

E. S. PATANWALA, BOMBAY-27 (INDIA).

মনমাতানো হাসি
…মুক্তোর মতো ঝক্‌ঝকে দাঁত **ডেন্টনিক**

ব্যবহারেই হয়

নিয়মিত ডেন্টনিক অ্যান্টিসেপ্টিক টুথ পাউডার দিয়ে দাঁত মাজলে মুক্তোর মতো ঝক্‌ঝকে সুন্দর দাঁত ও নীরোগ মাড়ীর জন্যে আপনি সত্যি গর্ববোধ করতে পারবেন। ক্লোরোফিল্-যুক্ত ডেন্টনিক পায়োরিয়া সারাতে সহায়তা করে।
দাদা ও ক্লোরোফিলযুক্ত দু'রকমই পাওয়া যায়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়	৬৪৭
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—শ্রীকালিদাস নাগ	৬৫০
ঢেউ—দিলীপকুমার দাশগুপ্ত	৬৫৪
পাহাড়ী গাঁয়ের কথা—নীলিমা দাশগুপ্ত	৬৬০
চলতি দুনিয়া –	৬৬৬
জাপান দেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চা—অধ্যাপক অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৬৬৮
এ জন্মের ইতিহাস (উপন্যাস)—সুশীল সিংহ	৬৭১
অমৃত কথা ও কাহিনী—	৭৩৪
সাহিত্য সংবাদ—	৭৩৬
বাঙ্গালা ভাষা—স্বামী বিবেকানন্দ	৭৩৮
সাহিত্য ও সাহিত্যিক—শ্রীসুদর্শন পাল	৭৪০
সমাজ ও সাহিত্য—নারায়ণ চৌধুরী	৭৪৩

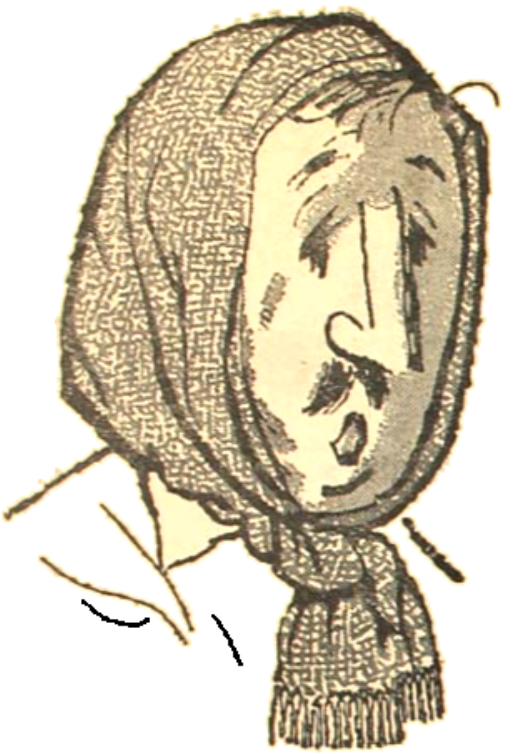

দেহের রোগ প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলুন !

সর্দিকাশি লেগেই আছে...হরদম হজমের গোলমাল...শরীরে অবসাদ, দুর্বলতা—এ সব লক্ষণগুলোকে অবহেলা করবেন না। কারণ, এগুলো আরও কোন গুরুতর পীড়ার সঙ্কেত হতে পারে। আজ থেকেই নিয়মিত মাল্ট ইমালশন খেয়ে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলুন।

সহজে শরীর সুস্থ ও সবল করে তুলতে হলে এই সুস্বাদু ইমালশনটির মত এমন জিনিস আর নেই।

MANDH
মাল্ট

ইমালশন

মার্টিন অ্যাণ্ড হ্যারিস (প্রাইভেট) লিমিটেড
কলিকাতা · বোম্বাই · নিউদিল্লী · মাদ্রাজ

এই সংখ্যায়

ভারত ভ্রমণে—সুনীল কুমার নাগ	৭৪৯
গ্রন্থ-পরিচয়—	৭৫১
ভক্তি-সৈকত—বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়	৭৫৪
ইতিহাসের পাতা থেকে—	৭৬০
সেকালের সভা-সমিতি—	৭৬৩
পুরাতন পাতা—	৭৬৫
উপেন্দ্রনাথ স্মরণে—	৭৬৭
দেশ-বিদেশ—	৭৬৯
শিল্পীর তুলিতে—	৭৭৩
স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণে—	৭৭৫
সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ—	৭৭৭
প্রাণি-জগৎ—	৭৭৮

অব্যাহত গতি

একদা মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া ইহাকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একজন লেখকের খোঁজ করিতেছিলেন। কিন্তু কেহই এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে পার্বতী-তনয় গণেশ এই শর্তে রাজি হইলেন যে তাঁর লেখনী মুহূর্তের জন্যও থামিবে না।

আধুনিক যুগের লেখকরাও চান যে তাঁদের লেখার গতি কোনক্রমেই ব্যাহত না হয়। আর এই অব্যাহত গতির জন্যই সুলেখা আজ এত জনপ্রিয়

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ; কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

পীজো রী মোড় ম্হারী গোরী পাণী হে চালী
সারো হী গাম লুভায়ো গড়া মাহ্মী
অল্লা নে পল্লা সাহিব মোর পধৈয়া
ঘুংঘট ঊপর নগদল বাই রী বীর

মনোহর লাবণ্য

রাজস্থানের সুন্দরী যুবতী, আঁচলায় মযূর ও কোকিলের মনোরম নক্সা-বিশিষ্ট "পীলো" শাড়ীটি দিয়ে নিজের গৌরদেহ আচ্ছাদিত ক'রে জল আনতে চলেছে। আর সমগ্র গ্রাম অবাক হ'য়ে চেয়ে আছে ওর পানে।

হস্তচালিত তাঁত

জাতীয় ঐতিহ্য

বোরোলীন

প্রসাধনে অতুলনীয়!

মুখমণ্ডলের কান্তি এবং লাবণ্য রক্ষা করা যখন কঠিন হয়, বায়বিক পরিবর্তনে যখন ত্বক ও ওষ্ঠাধর শুষ্কতর হয়ে ওঠে, তখনই মনে পড়ে বোরোলীন-এর কথা। ল্যানোলীন-যুক্ত অ্যান্টিসেপটিক বোরোলীন যে শুধু শুষ্ক ত্বককে লাবণ্যময় এবং মসৃণ করে তোলে, তাই নয়....এর মৃদু সুগন্ধ মনকে করে বিমুগ্ধ! নিত্য প্রসাধনে বোরোলীন ব্যবহার করুন।

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাইভেট লিমিটেড

১১/১, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩

কে, সি, দাশের রসগোল্লা

প্রিয়জনের প্রীতিভোজে উপাদেয় উপাদান

বায়ুশূন্য টিনেও পাওয়া যায় এবং বহুদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে বলিয়া দূর দূরান্তরে উপহার স্বরূপ পাঠানো যায়।

●

সেই সঙ্গে পাবেন

রসোমালাই ঃ সন্দেশ ঃ দধি ইত্যাদি

●

রসোমালাই আবিষ্কারক ঃ

কে, সি, দাশ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা—৩

মৃত সঞ্জীবনী সুরা

আয়ুর্বেদোক্ত অমৃত তুল্য মহৌষধ।
গুণে, গন্ধে ও বর্ণে যথাযথ ও শাস্ত্রানুরূপ।

মৃতকল্প ব্যক্তিকেও সঞ্জীবিত করে। বল, বীর্য্য, মেধা, বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিয়া নূতন জীবন দান করে। সর্ব্বপ্রকার দৌর্ব্বল্যে, কঠিন রোগভোগের পর, প্রসবান্তে ও স্মৃতিশক্তিহীনতায় অমৃতের মত কাজ করে ও স্নায়ুমণ্ডলকে সবল ও সতেজ করিয়া স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জীবন দান করে।

মূল্য—৪৲ টাকা পাইট ও ৭৷৹ টাকা কোয়ার্ট

অদ্যকার মধুর বান্ধব

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা প্রাইভেট লিঃ

কারখানা : ঢাকা (পূর্ব্ব পাকিস্তান) ও চন্দননগর (ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন)

'যদি ভাবেন ওঁকে খুশী করা সহজ...'

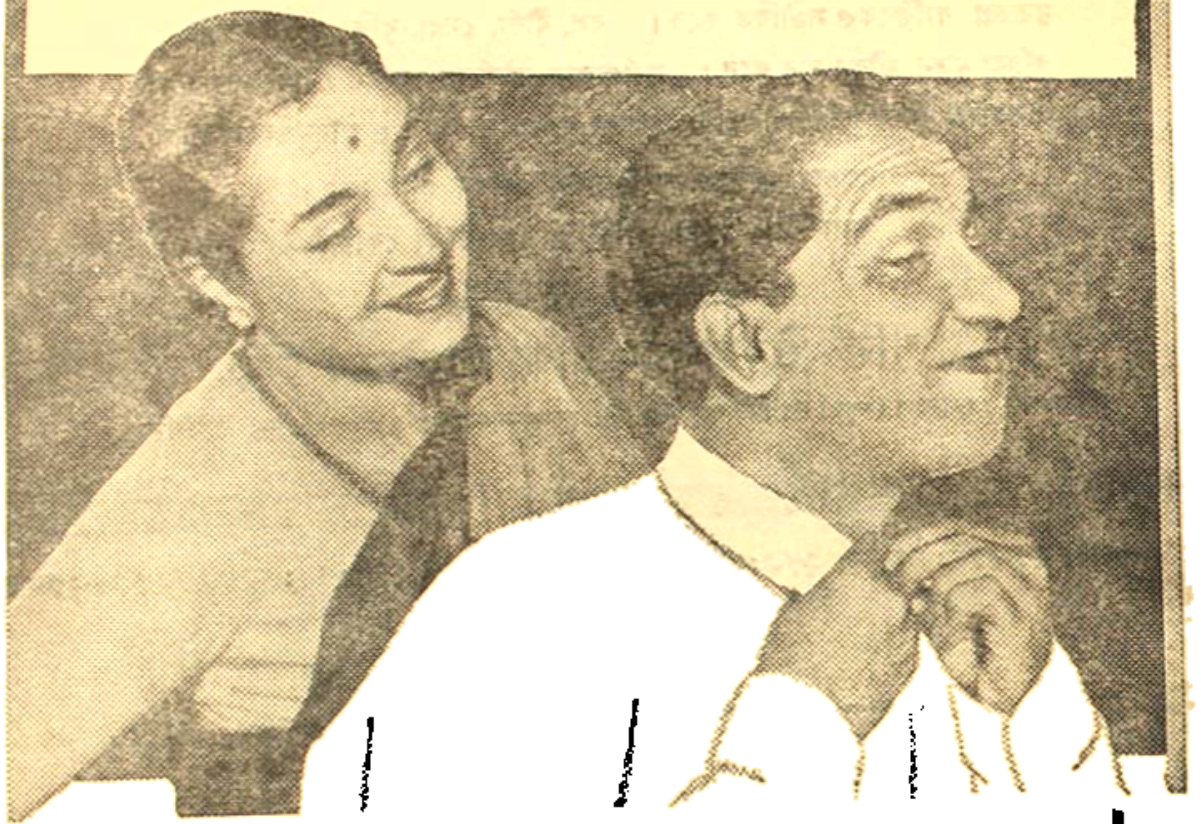

'...তবে নিশ্চয়ই আপনি ভুল করবেন'—বোম্বের শ্রীমতী আর. আর প্রভু বলেন। 'কাপড় জামার বেলাতেও কি উনি কম খুঁতখুঁতে...!' 'এখন অবশ্য আমি ওঁর জামা কাপড় সবই সানলাইটে কাচি—প্রচুর ফেনা হয় বলে এতে কাচাও সহজ আর কাপড়ও ধবধবে ফরসা হয়।...উনিও খুশী!' 'কাপড় জামা যা-ই কাচি সবই ধবধবে আর ঝালমলে ফরসা—সানলাইট ছাড়া অন্য কোন সাবানই আমার চাই না'

পৃথিবীর অতিসস্তার খাঁটি, কোনো সানলাইটের মতো কাপড়কে এত ভাল যত্ন আর কোন সাবানই দিতে পারে না। আপনিও তা-ই বলবেন।

সানলাইট

কাপড়জামার সঠিক যত্ন নেয়!

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

S. 30-X52 BG

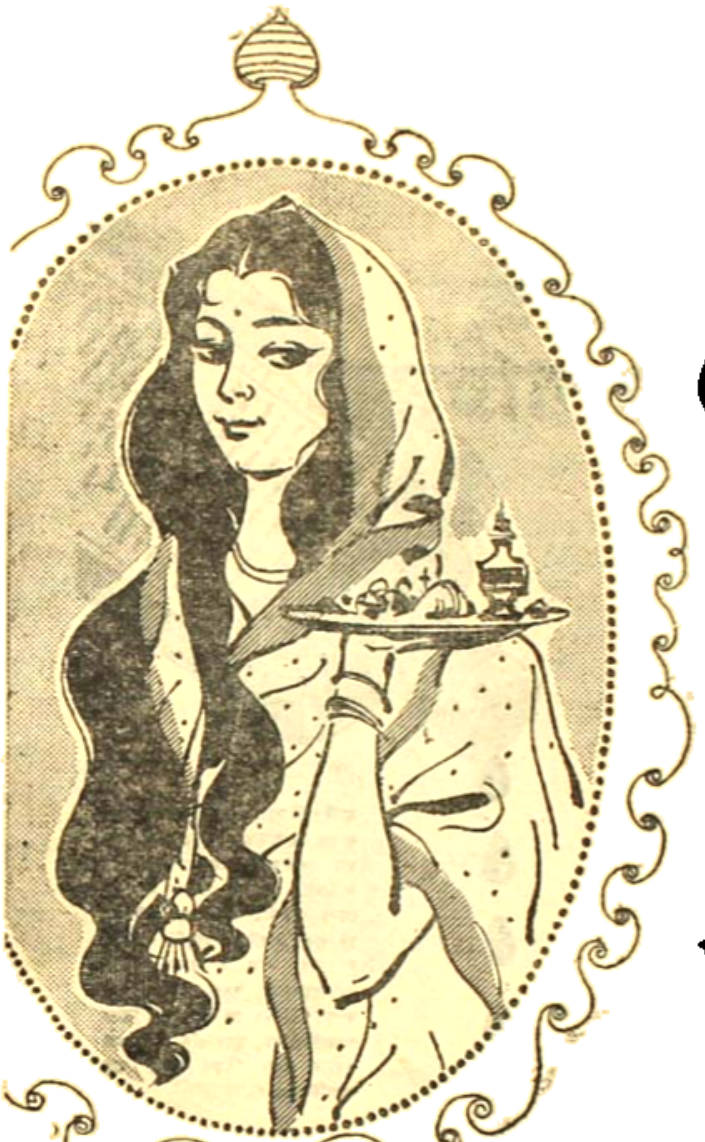

আনন্দে উৎসবে...

প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..

সবার মনোরঞ্জনে...

পরিণামরমণীয়
কেশতৈল

কেশরঞ্জন

কবিরাজ এন্‌ এন্‌, সেন এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

সারিবাদি সালসা

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক মহৌষধ

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা।

মিষ্টি সুরের নাচের তালে মিষ্টি মুখের খেলা
অনন্দ-ছন্দে আজি—হাসি খুসীর মেলা

সুপ্রসিদ্ধ কোলে বিস্কুটএর

প্রস্তুতকারক কর্তৃক
আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১০

পঞ্চবার্ষিকী
পরিকল্পনার
সেবায়

দি ওরিয়েণ্টাল মার্কেণ্টাইল কোং লিঃ
কলিকাতা · দিল্লী · কানপুর · বোম্বাই · মাদ্রাজ

প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধ'রে
সুন্দরী রমণীদের রমণীয় প্রসাধন

ওটিন ক্রীম

পাউডার মাখবার আগে ওটিন স্নো মেখে নেবেন—যেমন হালকা, তেমনি কোমল। মেক্-আপ ধরাবার পক্ষে ওটিন স্নোর মত তিনিস আর হয় না।

রোজ রাত্তিরে ওটিন মেখে আপনার ত্বকের যত্ন নিন—ওটিন লোমকূপের ময়লা দূর ক'রে আপনার ত্বক্ স্বাস্থ্যপূর্ণ ও মুখশ্রী সদ্যফোটা ফুলের মত সারাদিন সতেজ ও স্নিগ্ধ রাখবে।

মার্টিন অ্যাণ্ড হ্যারিস (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১৮২, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪

সুপ্রিয়া চৌধুরীর সৌন্দর্য্যের গোপন কথা...

‘লাক্সের মধুর পরশ আমায় সুন্দর রাখে’

রূপসী সুপ্রিয়া চৌধুরীর স্নিগ্ধ রূপের রূপ, সবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা। আর বিশুদ্ধ, কোমল লাক্সের মধুর পরশে তাঁর বিশ্বাস। লাক্স আপনার রূপেরও গোপন কথা হোক! লাক্স মধুর লাক্সের কুসুম কোমল ফেনার পরশে চেহারায় নতুন লাবণ্য আসবে! সুবাসভরা লাক্সের মধুর স্নান আপনার চমৎকার লাগবে! লাক্সের বারোখানি রাঙের বিচিত্র খেলা থেকে মনের মতো রঙ বেছে নিন। আপনার প্রিয় সাবানটিও পাবেন। সৌন্দর্য্যের জন্য লাক্স ব্যবহার করুন।

চিত্রতারকাদের বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্য-সাবান

, সুপ্রিয়া চৌধুরী বলেন - ‘সাবানটিও চমৎকার, আর রঙগুলোও কত সুন্দর!’

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

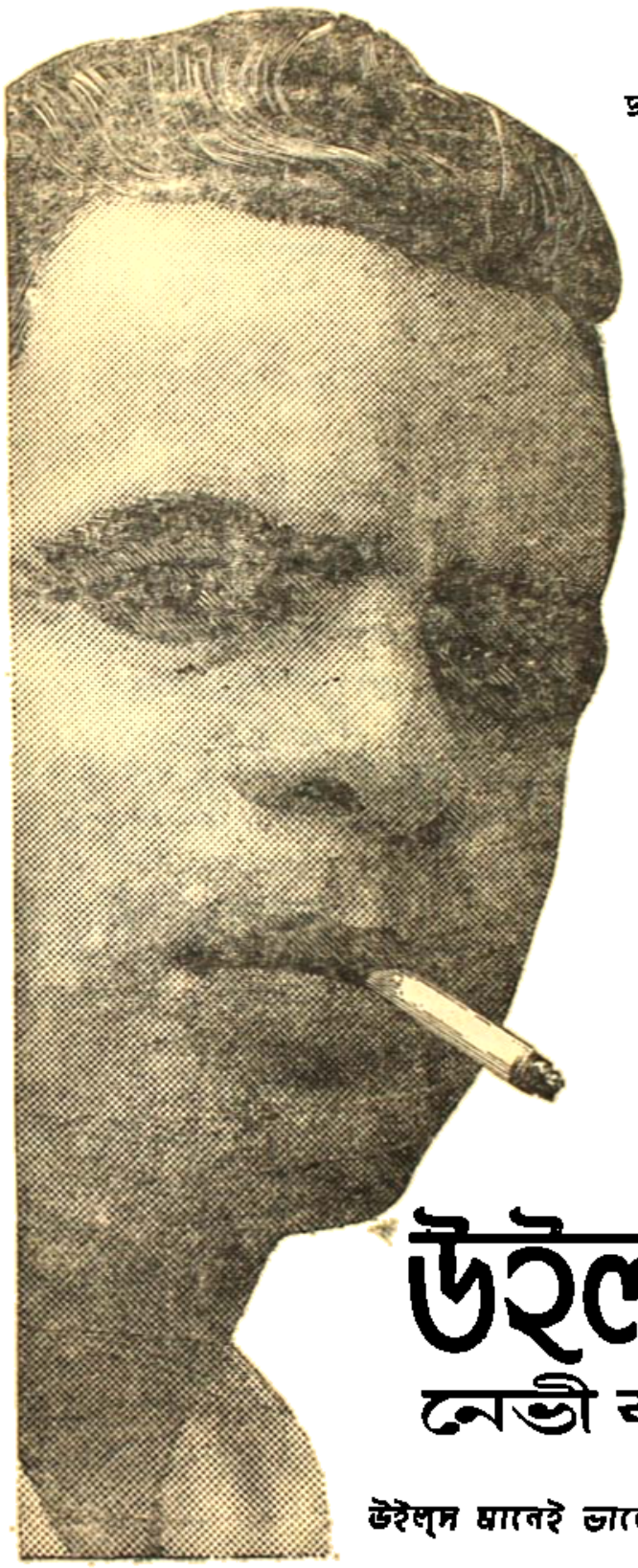

গুণে

ডব্লু ডি এণ্ড এইচ ও উইল্‌স—শ্রেষ্ঠতার প্রতীক

জুড়ি নেই

তৃপ্তিতে

নিজে ধরিয়ে টেনে দেখুন

তুলনা নেই

দামে

১০টি ৭০ নঃ পঃ ৫০টি ২.৫৫ নঃ পঃ

হেরফের নেই

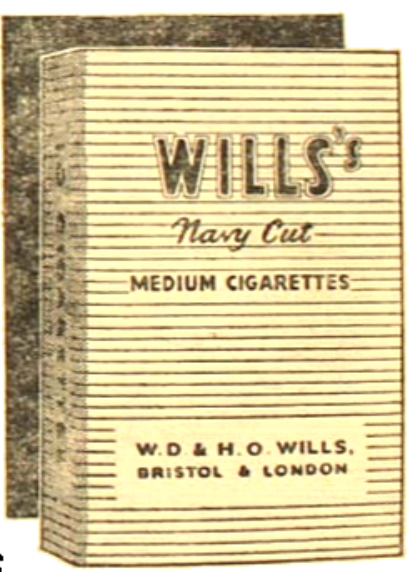

উইল্‌স
নেভী কাট

উইল্‌স মানেই ভালো সিগারেট

রূপ রচনায়
অপরাজেয়

ভেষজ বিশারদ
নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর

হিমকল্যাণ

কেশ তৈল

গুণে ও গন্ধে
অতুলনীয়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা

পঞ্চদশ বর্ষ ॥ ষষ্ঠ সংখ্যা. মাঘ ১৩৬৮

গল্প-ভারতী

সম্পাদকীয়

স্বামিজি ও নেতাজী

বিবেকানন্দ উৎসব শুরু হয়েছে তাঁর ১৯৩ম জন্মদিন থেকেই এবং পূর্ণ হবে ১৯৬৩-৬৪ শ্রীষ্টাব্দে। ৩ নং গৌর মুখার্জী লেনে শিমুলিয়া দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে নরেন্দ্র দত্ত পারিবারিক অশান্তি ও অর্থকষ্ট সহ্য করেন। ফলে ১৮৭৩-১৮৮৩ এই ১০ বছর মানদা মকর্ধনার বড় বাড়িটি বিভক্ত হয়ে যায়, তার কাহিনী আদালতের দলিলপত্র থেকে উদ্ধার করা উচিত, কিন্তু করা হয় নি। 'উদ্বোধন' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় আমি এসব কথা তুলেছি ও জেনেছি তাঁদের প্রকাশিত বিবেকানন্দ-পত্রাবলী শতবার্ষিকী সংস্করণে— ২২৯ খানি পত্রের স্থলে ৫৫৩ খানি চিঠি ছাপা হবে। তা ছাড়া নরেন্দ্রের দুই ভ্রাতা মহেন্দ্র ও ভূপেন্দ্র দত্তদের চিঠি ও রচনাদি থেকেও বহু তথ্য মিলবে। স্বামীজি-শতাব্দী-কমিটির সদস্য রূপে এসব প্রস্তাব তুলেছি ও অন্য ভাষায় অনুবাদ হবার আগে কলিকাতা থেকে definitive texts of the collected works of Swami Vivekananda—অর্থাৎ স্বামীজির সংশোধিত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ ছাপা উচিত। ইংরেজী থেকে প্রথম বাংলায় পরে হিন্দী তামিল প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ করা যাবে। তার জন্য কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার টাকা দেবেন। কিন্তু শুধু টাকার নয় দক্ষ মানুষদের দিয়ে বিবেকানন্দ 'খোঁজ পরিষদ' অবিলম্বে তাঁর জন্মস্থান কলিকাতায় গড়া দরকার। তবেই 'অবিস্মরণ' কথঞ্চিৎ শোধ হবে। মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে স্বামীজি চলে গেছেন। তাঁকে দেখে তাঁর বাণী শুনে যাঁরা বিশ্বনে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সবাই প্রায় চলে গেছেন। শেষ গেলেন বেলুড়ের অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ। তাঁর অভাব গভীর ভাবে অনুভব করি ও স্বামী শিবানন্দকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। কারণ তাঁকে অনুরোধ করায় তিনি সমগ্র গ্রন্থাবলী ও 'কথামৃত' 'লীলা প্রসঙ্গ' প্রভৃতি বই ফরাসী মনীষী Romain Rolland [1866-1944]-কে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে রম্যা রলাঁ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ এই দুটি ফরাসী ভাষা থেকে বহু ভাষায় অনুবাদ হয়েছে [১৯২৯-৩৪]। সে যুগের চিঠিপত্র মাদাম রলাঁর কাছে কিছু আছে। কিন্তু বেলুড় মঠের থেকে পত্রাদির কপি তাঁর সহধর্মিণী [Rolland Centre, 89 Bould. Montparnasse, Paris.] এ পর্যন্ত পান নি ; তাঁর অনুরোধ বিবেকানন্দ শিবদের জানিয়েছি। আশা করি তাঁরা তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা দেবেন। মাদাম রলাঁ যেমন এ বছর Tagore & Rolland ছেপেছেন তেমনি আগামী বছর Vivekananda & Rollanda [সটীক] ছাপাতে রাজী আছেন। আমাদের দায়িত্ব বেলুড় তথা ভারতীয় উপাদান সংগ্রহ করে উল্লিখিত ঠিকানায় মাদাম রলাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া। বিবেকানন্দ শতাব্দী উৎসব ও বক্তৃতাদির হিড়িকে পাছে এই অতি প্রয়োজনীয় কাজ

অসমাপ্ত থেকে যায় তাই সাধারণকে এ কথা জানালাম। উৎসবের সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর Publications কমিটি ও অদ্বৈত আশ্রমের স্বামী সত্যরূপানন্দজীর সাহচর্যও আমাদের বাঞ্ছনীয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দের প্রেরণায় জীবন গঠন করে দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। তাঁকেও এই শতাব্দী উৎসবে বারবার স্মরণ করব। দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস ২৩শে জানুয়ারী দেশের স্মরণীয় দিন।

৺ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামিজির কনিষ্ঠ সহোদর, ৮৩ বছর বয়সে চলে গেলেন—বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীর প্রারম্ভে। তাঁর বহু পরিশ্রমের ফল—বিবেকানন্দের জীবনী সযত্নে পাঠ করা উচিত ও 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে তাঁর কথা ছাপলে আমরা সুখী হব। কংগ্রেস জন্মের আগেই ভূপেন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন ও আদি যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক রূপে স্বদেশীযুগে কারাবরণ করেন। 'পত্রিকা' অফিসের সঙ্গে কর্মীদল তখন থেকে দুঃখকাল পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক বিবরণী ছাপাতে পারেন। মার্কস-বাদী পণ্ডিতরূপে পরিজ্ঞাত হলেও U. S. A. ও ইউরোপে বহুকাল অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন [১৯০৯-২৪]; Indian Social Policy, Land Economies of India, Indian art in relation to culture, Dialectics of Hindu Spiritualism এবং সর্বোপরি Vivekananda the Patriot-Prophet সবাইকে পাঠ করতে অনুরোধ করি। বেলুড়-মিশনের সঙ্গে যোগরক্ষা করতে না পারলেও ভূপেন্দ্র ও তাঁর মেজদাদা মহেন্দ্রনাথ গভীর পাণ্ডিত্যের ও গবেষণার পরিচয় দিয়ে গেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রজ বিবেকানন্দের তাঁরা 'উত্তর সাধক'। তাই শতাব্দী উপলক্ষে তাঁদের সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করি। তাঁদের ভদ্রাসন বাড়িটি কি হবে? উত্তরাধিকারী কেউ নেই। হয়তো পশ্চিমবঙ্গ সরকার—রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এটারও দায়িত্ব নেবেন। তবে এই কাজে দেরি হচ্ছে কেন?

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শতবার্ষিকী [১৮৬১—১৯৬১]

অধ্যক্ষ অমলানন্দ ঘোষ প্রভূত দক্ষতা ও মমত্বের সঙ্গে Indian Archaeological Survey Centenary সুসম্পন্ন করলেন। সেজন্য তাঁকে ও তাঁর সহকর্মীদের অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। পঞ্চাধিক কাল দারুণ শীতে দিল্লীতে কাটিয়ে মস্ত লাভ হল। আমার প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপী ঐতিহাসিক পরিক্রমার বহু সাক্ষীদের সঙ্গে এবার দেখা হল: লণ্ডন প্যারিস বার্লিন ইতালী গ্রীস থেকে শুরু ক'রে এশিয়া আফ্রিকা আমেরিকা ও পলিনেশিয়ার বন্ধুদের অনেকে এবার আমাদের সঙ্গে Asoka বা Ambassador হোটেলে ছিলেন। তাই বক্তৃতা ও আলোচনাদির ফাঁকে তাঁদের সঙ্গে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস নিয়ে নির্ভীক আলাপের সুযোগ পাই, যেমন ১৯৪৬ সনে পেয়েছিলাম Sir W. Jones [1746-1794] Bi-centenary বৈঠকে এবং Moscow আন্তর্জাতিক প্রাচ্য বিদ্যা সম্মেলনে [১৯৬০]। Prof. Tolstov এর প্রবন্ধ আমি Modern Review তে ছাপি; তিনি শক-কুষাণ যুগের বিশেষজ্ঞ Syr Darya অঞ্চলে খনন করে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁর বিদুষী স্ত্রীও নৃতত্ত্বে অভিজ্ঞা ও আমার পরলোকগত বন্ধু ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহের সমজদার। তেমনি মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণের সময় [১৯৫০ ৫১] আমি ইরান-ইরাকে দেখি Prof Mallowan এর নাম সর্বত্র। এখন London University-র অধ্যাপক]। তিনিও সস্ত্রীক দিল্লী এসেছিলেন কিন্তু কলিকাতা যেখেন নাই। তাই তাঁদের আমন্ত্রণ করে এলাম আগামী শীতে Jones এর Asiatic Society [১৭৮৪ প্রতিষ্ঠিত] ও Indian Museum দেখতে। সেখানে এত অমূল্য প্রত্ন সম্ভার আছে যে তাঁদের মত বিশেষজ্ঞরাও বিস্মিত হবেন। বিষ্ণুপুর ঘাট থেকে Supreme

Court পর্যন্ত Jones হেঁটে আসতেন ও "বগী" গাড়িতে ফিরতেন। গঙ্গা ভালবেসে গঙ্গাতীরের এই কলিকাতায় প্রথম সংস্কৃত শিক্ষা ও বৈদিক দেবতার উপর Edwin Arnold রচিত ইংরেজী কবিতা Light of Asia-র শতবর্ষ পূর্বে Jones শকুন্তলা প্রকাশ করে অমর হয়ে গেছেন। এই সব গল্প করছি Prof. Mallowan-কে দলে টানতে। তাঁর প্রখ্যাতা পত্নী Agatha Christie [Pen নাম] মন দিয়ে শুনছেন, তাঁকেও নিমন্ত্রণ করে জানালাম যে শুধু আমার তিন মেয়ে নয় বহু ভারতীয় College girls [গল্প-ভারতীয় বাড়িতেও] Agatha Christie রচিত Detective novels উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়ে। হয়তো রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রও পড়ে গেছেন। তাঁর স্বামী মাটি খুঁড়ে ইতিহাস রচনা করেন আর বিদুষী স্ত্রী মনটা খুঁড়ে অবচেতন স্তর থেকে 'অতুত রস কিম্পুরুষ' থেকে "স্বপ্ন প্রয়াণ" কাব্য গল্প লিখে যাচ্ছেন। পাঁচকড়ি দের ডিটেকটিভ কাহিনী আমরা ছেলেবেলায় পড়েছি আর শেষ বয়সে ঐ সাহিত্যের সাম্রাজ্ঞী Agatha Christie-কে কাছে পেয়ে মুগ্ধ হলাম। আমার গুরুজী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন প্রত্নতত্ত্বের ঔপন্যাসিক। তাঁর কৃপায় আমরা খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকের Alexander যুগ থেকে ৪০০০ Proto-History-তে পৌঁছেছি সে যুগের Mohenjo Daro, Amri, Nal' প্রভৃতি পাকিস্তানে গেলেও Harappan Culture ছড়িয়ে পড়েছিল কাশ্মীর সিন্ধু-দিল্লী থেকে কাম্বিয়াওয়াড় [Lothal বন্দর] গুজরাট—রাজস্থান বিন্ধ্যাদ্রি ও আদিলবা পর্যন্ত। এই সব অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের ফলে দেশবিদেশের প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছেও ভারত 'তীর্থস্থান' হয়েছে এক নূতন তাৎপর্য নিয়ে। বিশাল চীন থেকে কেউ দিল্লীতে আসেন নি Himalayan Blunder-এর ফলে। কিন্তু ভুলটা কার? তাদের না আমাদের? Fa-hien [400] থেকে হিউয়েন সাঙ ও ই-চিঙ [700] পর্যন্ত চীনারা গোবি-মরু পার হয়ে ভারততীর্থ পরিক্রমা করেছে প্রায় হাজার বছর ধরে কিন্তু তাদের ধরে রাখতে আমরা পারলাম না; আজ ভারত-শত্রুরা তাদের কাজে লাগাচ্ছে। জাপানী ও মার্কিন বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ হল। আমি Indian Archaeology and Soviet Horizons ইত্যাদি বিষয়ে ভাষণ দিয়ে সুখী হলাম। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রাখালদাসের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা বাঙালীর অবিলম্বে করা উচিত। কারণ অক্ষয়কুমার মৈত্র—শতাব্দী এই ১৯৬১-৬২ সাল। রাজেন্দ্রলালের 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' পত্রিকা থেকে পণ্ডিত হরপ্রসাদ ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও প্রেরণা পেয়ে স্বীকার করে গেছেন।

বাঙালীর বাণিজ্য-যাত্রা

সখের যাত্রা ও পালা-গান ছিল সেযুগে বাঙালীর প্রাণ। কিন্তু গত ৫০ বছরে সেগুলি মৃতপ্রায়। তাই তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে থিয়েটার ও সিনেমা; এই প্রবল ও অভিনব মাধ্যমগুলি যদি অর্থ লুটতরাজ না করে বাণিজ্য লক্ষ্মীর সাধনায় বাঙালীকে কেরাতে পারে তাহলে 'অর্থমনর্থম্' শ্লোক আউড়ে শোক করব না। কিন্তু বাংলা সিনেমায় সরস্বতী পূজার কিছু ঘটা থাকলেও লক্ষ্মীর আরাধনা যেন শুরুও হয় নি তাই মাতব্বর ডা: বিধানচন্দ্র রায় সেদিন তাঁর ভাষণে অনুযোগ করে বলেন যে capital বিরোধী তত্ত্বকথা যতই যুব-সমাজে চলুক capital formation বাদ দিলে, অলক্ষ্মী বিদায় নেবে না এই হতভাগা বাঙালী সংসার থেকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আজ থাকলে তাঁর "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" নব-রূপে পরিবেষন করতেন। তাঁর 'ভাসের দেশ'খানি উৎসর্গ করে গেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে, যিনি প্রথম National Planning কমিশন গড়তে চেষ্টা করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় Plan উৎরে তৃতীয় Planও এবার

নামছি আমরা প্রধানত কোটি কোটি টাকা ধার করে। Deficit financing যতই চটকদার লাগুক, আজ-বাদে-কাল ধার শোধ করতেই হবে; তখন রবীন্দ্রনাথের 'ঋণ শোধ' অভিনয় করলে বিদেশী পাওনাদারগণ আমাদের ছাড়বেন না। সেকথা প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ও তাঁর নাতি রাজীবও জানেন। তাই বহুভাবে বহুকাল নির্যাতিত বাঙালীদের কোমর-বেঁধে কাজে নামতে হবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, তবেই বেকার সমস্যা মিটবে। আইনে না ও হওকারণোও নয় এ বিষয়ে গঠনমূলক পরিকল্পনা সংক্ষেপে লিখে পাঠালে আমরা গল্পভারতীতে ছাপব। এখন ব্যঙ্গ-চিত্র ছেপে মনটাকে জাগাতে চেষ্টা করছি। কিন্তু বাঙালী-জীবনের চলচ্চিত্র এমনই নিষ্ঠুর [অর্থের অভাবে] যে একটু প্রাচুর্য দেখে গেলে আমরা সুখী হব; সেজন্য চাই "অর্থশাস্ত্র"। পরে ভোগশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র যথাযথভাবে আসবে। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গোরবে আমরা মহাভারত-যুগে অর্থশাস্ত্র। প্রকাশ করেছি এবার প্রয়োগ করতে হবে। তখন দুর্বাসা চাণক্য মুনিও হয়তো প্রসন্ন হয়ে বাঙালীদের আশীর্বাদ করবেন ও দ্বিজ দ্বারকানাথ তাঁর পৌত্রের রহস্য সঙ্গীতে যোগ দেবেন—

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল।
সদাই করছি টলমল—
কিন্তু 'বাণিজ্যেতে বাবই এই প্রাথমাতান সুর

'তালের দেশে' প্রাণের প্রাচুর্য আনবে। বাঙালী ছেলেমেয়ে তখন শুধু সরস্বতী নয় লক্ষ্মীপূজাও করে ধন্য হবে।

প্রকাশচন্দ্র শেঠ

Bengal National Chamber of Commerce and Industries—জাতীয় প্রতিষ্ঠান; তাঁদের ৭৫ বর্ষ পূর্তি উৎসবে যোগ দিয়ে দুঃখের সঙ্গে জানলাম তাঁদের সদস্য প্রকাশচন্দ্র শেঠের অকালমৃত্যু হয়েছে। তিনি ও তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতা প্রবোধচন্দ্র আমাকে দুই বার তাঁদের কারখানা মুরারিপুকুর অঞ্চলে নিয়ে গেছেন ও বাঙালীন ঘোষদের বোমা-কারখানার আস্তানা দেখিয়েছিলেন।

মাত্র ৫৭ বছরে তিনি গেলেন অথচ তিনি প্রায় ২৫।৩০ বছর কঠিন পরিশ্রম করে শিল্প সাধনাকে সার্থক করেন। ১৯০৫-৬ সালের দাদাভাই নৌরোজীর কংগ্রেসের সময় প্রকাশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। অনুশীলন-সমিতি থেকে শুরু করে মুক্তি সংঘ, মারী সমাজ ও ব্যবসায়ী দল তিনি হাওড়ায় এবং বড়বাজারে গড়ে তোলেন। তাঁর পুত্র কন্যা ও পরিজনদের সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাই।

শুধীরচন্দ্র সরকার

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ [১৮৭৮-১৯৬২]

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

শ্রীকালিদাস নাগ

সংবাদসাহিত্যের শিরপাল হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিদায় নিলেন। সন্নতাবতীও স্নেহশীল পিতৃতুল্য শুভানুধ্যায়ীকে হারাল। তাঁর উদ্দেশে আমাদের বেদনা এবং শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি।

তিনি আজীবন খাঁটি বাংলাদী ছিলেন ও বাঙলার কল্যাণ কিসে হবে এই চিন্তাই করে গেছেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে গড়ে তোলা Home Library-র মূল্য জানার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ, সেটি রক্ষার আশু ব্যবস্থা করুন। প্রায় কংগ্রেসের জন্মকাল থেকে এ পর্যন্ত কত পত্র পত্রিকা থেকে মূল্যবান কাঁচি চালিয়ে তিনি ইতিহাসের উপাদান রেখে গেছেন। বাংলার এক সংকটময় যুগের ইতিহাস তা থেকে হয়তো লেখা হবে।

তাঁর বন্ধু ও সতীর্থ ডাঃ হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় হেমেন্দ্রপ্রসাদের কঠিন রোগে ঘুমের ব্যাঘাত না হয় সেজন্য তাঁর বাড়ির রাস্তাগুলি ঘাস বিছিয়ে নিঃশব্দ করেছিলেন। গভর্নর-বন্ধুর সেই সেবার কথা হেমেন্দ্রবাবু সবদা বলতেন ও সেই সঙ্গে গল্প শোনাতেন। স্কুল থেকে পাশ করে, Presidency কলেজে কত বিখ্যাত অধ্যাপকের কাছে দু'জনে পড়েছেন। আশা করি সেই কলেজের ছাত্ররাও তাঁর স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের Journalism ক্লাশ গড়ে তুলতে হেমেন্দ্রবাবু অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন ও সেইখানেই ছাত্র-ছাত্রীরা, আমাদের সঙ্গে মিলে, তাঁর ৮০ বর্ষপূর্তি উৎসব করেন।

১৮৭৬ সনে যখন তিনি যশোহরে জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁর গুরু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদর্শন' 'প্রথম পর্ব' শেষ করেন ও জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ী থেকে 'ভারতী' পত্রিকার আবির্ভাব হয়। যশোহরের কবিযশঃ মাইকেলের সহযাত্রী [১৮৭২] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে শিশুভ্রাতা রবীন্দ্রনাথকে রেখে বিলেত যান তাঁর বাড়ির অনেকের সঙ্গে হেমেন্দ্রবাবুর বন্ধুত্ব ছিল এবং তাঁর পত্নী যে কাবুলীওয়ালা গল্পের 'মিনি' হয়ে দেখা দেন সে গল্পও শুনেছি।

১৮৮৯ সালে ১৩ বছরের বালক হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। তার আগে তাঁর শিক্ষারম্ভ কৃষ্ণনগরে। সেখানে দুই বিখ্যাত বাগ্মী লালমোহন ঘোষ ও মনোমোহন ঘোষ তাঁকে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রেরণা দেন। তাঁর প্রথম কাব্যসংগ্রহের ভূমিকা লেখেন কবিবর নবীনচন্দ্র সেন যাঁর স্মারক সভায় সভাপতি ছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ। তিনি আজীবন বঙ্কিম-ভক্ত। কারণ বিশ্বস্তর সেন-পদক তাঁকে নিজ হাতে দিয়েছিলেন [১৮৯৩] বঙ্কিমচন্দ্র, চৈতন্য লাইব্রেরী বার্ষিক সভায়,—সেকথা আমাদের নিজেই শুনিয়ে গেছেন। যশোহরের মহাত্মা শিশির ঘোষ হেমেন্দ্রপ্রসাদকে সংবাদ-সাহিত্যক্ষেত্রে নামতে প্রেরণা দেন। তাই অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে শুরু ক'রে সুরেশ সমাজপতির "সাহিত্য" ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রদীপ' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখে গেছেন। সব খুঁজে [Bibliography অনুসারে] হেমেন্দ্র-গ্রন্থাবলী শীঘ্র প্রকাশ করা উচিৎ।

১৯০৫-৬ সনের স্বদেশী যুগের প্রায় সব শ্রেষ্ঠ পত্রিকাতেই তিনি ইংরেজী ও বাংলায় লিখে গেছেন। উপাধ্যায়ের "সন্ধ্যা", বিপিন পাল ও শ্রীঅরবিন্দের "বন্দেমাতরম্" ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রকাশিত পত্রিকাদি খুঁজে তাঁর অতীত লেখার তালিকা তৈরি করতে হবে। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত "বসুমতী"র

কর্ণধার রূপে তিনি পত্রিকার প্রসার করে Rotary মুদ্রাযন্ত্র আমদানি করে নবযুগের সূত্রপাত করেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ-শাসনের কড়া সমালোচক হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হেমেন্দ্রবাবু War Correspondent রূপে মধ্যপ্রাচ্যে ও ইওরোপের যুদ্ধক্ষেত্রাদি পরিদর্শন [১৯১৭-১৮] করে প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে বাঙালী সাংবাদিক দল টাকা খরচ করতে এগিয়ে আসেন নি। বহু বিখ্যাত সাংবাদিক ও বিদেশী নেতা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। তাঁদের নাম অপ্রকাশিত "ডায়েরী" থেকে উদ্ধার করা উচিত যেমন যশোহর-খুর্ণ Dr. P. C. Roy শতবার্ষিকীতেও করা আজ প্রয়োজন। এ বিষয়ে তাঁর স্মৃতিসভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা লাইব্রেরী রক্ষার কথাও তুলেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে [১৯৪৫] তাঁকে All India Newspaper Editors সম্মেলনের সভাপতি করে সম্মান দেখান হয়। তখন থেকে ভারত তথা বাংলা বিভাগের বিষময় ফল দেখে তাঁর সতর্ক-বাণী হেমেন্দ্রবাবু আমাদের শুনিয়ে গেছেন। নেতাজী সুভাষের কর্মপ্রণালীর পূর্ণ সমর্থন তিনি করে গেছেন ও শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর গভীর মিল ছিল। সোহরাবগানের বাড়িতে রাজ্যপাল হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় থেকে কত দলের কত নেতা ও কর্মী হেমেন্দ্রবাবুর পরামর্শ নিতে আসতেন তা স্বচক্ষে দেখেছি। "অব্যবসায়ী" বাঙালী কাউকে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখলে তিনি দুর্বল-শরীরেও উৎসাহ দিতে যেতেন। তাঁদেরও অনুরোধ করি হেমেন্দ্র-স্মৃতি রক্ষাকল্পে কিছু করবার। এক্ষেত্রে ৫০।৬০ বছর ধরে তিনি ভেবে এসেছেন ও আমাদের ভাবিয়েছেন, তার প্রমাণ পাই গল্পভারতীর নানা প্রকাশিত তাঁর শেষ রচনাগুলিতে। গল্প-ভারতীর প্রতিটি কাজে তাঁর সহযোগিতা পেয়েছি। বাঙালীর সভাসমিতি, অনুষ্ঠান নিয়ে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ তিনি লিখতেন। তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করার লোক আর নেই, সেই কথা ব্যথিত হৃদয়ে স্মরণ করে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ আজ নিবেদন করি।

কবি ও সাহিত্যিক হেমেন্দ্রপ্রসাদকে ভুলতে বসলেও সাংবাদিক-শ্রেষ্ঠ তাঁকে বহুকাল বহুজন মনে রাখবেন তাঁর আভাষ দিয়েছেন শুধু দেশীয় পত্রিকাগুলি নয়, বিদেশী সাংবাদিকগণও। আমি তাঁর সাহচর্য পেয়ে ধন্য হই যখন দুইজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী সাংবাদিকের স্মৃতি স্থাপন করে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলাম। কবি ঈশ্বর গুপ্ত 'সম্বাদ প্রভাকর' প্রকাশ করে আমাদের ধন্য করে গেছেন অথচ তাঁর ছবি ছিল না। তাই সেই ছবি বহুকষ্টে উদ্ধার করে ঈশ্বর গুপ্তের জন্মভূমি নবীনার "কল্যাণী" সংসদ ভাদ্রা ভিতের উপর আমরা যখন স্মৃতি-সভা করি, হেমেন্দ্রবাবু আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দেন ও দুঃখ করে বলেন আর একজন প্রতিকৃতিহীন বীর সাংবাদিক 'Hindu Patriot' প্রতিষ্ঠাতা হরিশ মুখার্জি, যিনি নীলকরদের উচ্ছেদ করেছিলেন। কিন্তু দেশের লোক চাঁদা তুললেও তাঁর প্রতিকৃতি বা Photo পর্যন্ত রাখেন নি। এই ত্রুটি তাঁকে বাথা দিত। তাই জাতীয় গ্রন্থাগারের বন্ধু-সহায়ে বহু চেষ্টা করেও হরিশ মুখার্জির ফটো বা স্কেচ কিছু পেলাম না। 'ছবির আমিনজা—এই বাঙলা' প্রবন্ধ লিখতে সেকথা বারবার স্মরণ করেছি।

'গল্প-ভারতী'তে তাঁর শেষ রচনাটি "সংবাদপত্রের শতবার্ষিকী" প্রবন্ধ সবাইকে পড়তে অনুরোধ করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণ সহযোগে ঘিরে 'হেমেন্দ্রপ্রসাদ বক্তৃতামালা' শুরু করুন এই প্রার্থনা জানাই। তাঁর গ্রন্থাগার তথা মানসিক ঔদার্য বাংলার সংবাদ-সাহিত্যকে বহুকাল পুষ্ট করে এসেছে। এখন তাঁর উপযুক্ত কিছু করা আমাদের কর্তব্য। হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে তিনি পরিহাস করে গেছেন। তাঁর স্নিগ্ধ হাস্যোজ্জ্বল মুখ বহুকাল মনে থাকবে।

ঢেউ।

দিলীপকুমার দাশগুপ্ত

দুঃখটা আমার চেয়ে মণিমালা সরকারের বেশি হওয়া স্বাভাবিক। কেননা সে মেয়ে। তার জীবনের সুযোগ সুবিধা সীমাবদ্ধ।

আমি পুরুষ মানুষ। যখন তখন কোনারক যেতে পারবো। আমার জীবনের প্রথম কুড়িটি বছর বাদ দিলে বাকি আট বছর অন্ততঃ বারো বার এসেছি এখানে। এর মাঝে একবারও কোনারক যাওয়া হয় নি। কোন দৈব দুর্ঘটনা কিম্বা আকস্মিকতা নয়। এমনি।

মণিমালা বলেছিলেন,—কালীনাথবাবু, আপনি একেবারে হোপলেস লোক। বারো বার এখানে এসেছেন, অথচ সূর্য মন্দির দেখতে যান নি?

কেন যাই নি তা বলতে পারবো না। সমুদ্র ভালো লাগে। তাই বার বার আমি কোলকাতার ব্যবসা-পত্তর ফেলে। আরো আসবো। তা ছাড়া এবার মাকে নিয়ে এসেছি। সিংহদ্বারে বাসা ভাড়া করেছি তাঁর জন্য। এ-বয়সে মা এখানে থাকতে চান কিছুদিন। কালই ও-বাসাতে উঠে যাবো। আর রাত্রে চাপবো কোলকাতার এক্সপ্রেসে। ছোট ভাই এসে মা'র ভারভার করবে। মাত্র সাত দিনের ছুটি পেয়েছে সে। সাতদিন বাদে আমাকে আবার আসতে হবে।

তবু এবার কোনারক যাবো ঠিক করেছিলুম। আমার চেয়ে মণিমালা আর তার ছোট ভাই আঠারো বছরের সুবীরের ঝোঁক বেশি। তাঁরা বললেন, আপনাকে যেতেই হবে। আপনি না গেলে আমাদের যাওয়া হয় না।

বললুম, সে কি সুবীরবাবু। আমাকে ঠাওরালে কি? আমি নিজে যাই নি ওখানে।

মণিমালা বললেন, তা যান নি। কিন্তু আপনি না গেলে, মা আমাদের যেতে দিচ্ছেন না। সেদিন আপনি ভিড়েও যে রকমভাবে জগন্নাথদেবকে প্রদক্ষিণ করার ব্যবস্থা করে দিলেন, তাতে মা আপনার উপর ভরসা করছেন খুব।

বললুম, মিস্ সরকার। ওতে আমার বাহাদুরি নেই। ওটা পাণ্ডাজীর।

তা বটে! কিন্তু পাণ্ডাজী আপনার পরিচিত ছিলেন বলেই ওটা হয়েছে। সেদিন আমরা পুজো দিতে গেলুম, কই সেদিন তো পাণ্ডাজী ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করাতে পারলেন না?

সুবীর বললে, সেদিন অত ভিড় ছিল কেন?

জবাব দিলুম,—সুবীরবাবু, তোমাকে অনেকবার বলেছি যে গঙ্গাসাগর স্নানের পরে এখানে যথেষ্ট ভিড় হয়ে থাকে। সাধারণতঃ তীর্থ যাত্রীরা গঙ্গাসাগর ঘুরে এসে 'প্রভু জগন্নাথ'কে দর্শন করে যান।

আমার স্মরণ-শক্তি বড্ডো কম! ছেলে মানুষের মত সুবীর বলল।

বলতে গেলে ওদের টানা হ্যাঁচড়াতে পড়েই কোনারক যেতে রাজী হয়েছিলুম। আগামীকাল সকালে মাকে নিয়ে ভাড়াটে বাসাতে যেতেই হবে। আর রাত্রে কোলকাতার এক্সপ্রেস। তাছাড়া মণিমালারাও কাল সকালে যাচ্ছেন ভুবনেশ্বর। দু'দিন ওখানে থেকে কোলকাতা ফিরবেন। কাজেই কোনারক যাবার দিন স্থির হয়েছিল আজকে।

কিন্তু যাওয়া হয় নি।

তেতলার বারান্দায় ছায়া নেই। ও কোনে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছিলুম। হাওড়া স্যালেন্জার ট্রেন যাত্রীর রিক্সা এসে থামতে শুরু করেছে এ বাড়ির ফটকের সামনে। একটা হোটেলের একজন লোক যাত্রীদের কাছে তার হোটেলের বিজ্ঞাপনের কাগজ বিলি করছেন। আর বলছেন। কি বলছেন, শুনতে পাচ্ছি না এখান থেকে। কিন্তু ওর বক্তব্য আমার জানা। অনেকবার শুনেছি। প্রতি মিলের কি দাম, খাদ্য তালিকা, রান্না ইত্যাদি। কাউকে হয়তো পেছন ফিরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন হোটেলটি।

মণিমালা কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন টের পাই নি।

তিনি বললেন, ওই লোকটাকে দেখলেই আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে ওঠে। বিমলবাবু আর লোক পেলেন না। অমন অপদার্থকে হোটেলের ম্যানেজার করেছেন। কাজেও অপদার্থ, দেখতেও তাই।

বললুম, মিস্ সরকার! ওকে দিয়ে নিশ্চয়ই কিছু হচ্ছে। না হলে, কেন ম্যানেজার করে রাখা? আর দেখতে কেমন, তা না তোলাই ভালো।

কেন? মণিমালা যেন ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

মিস্ সরকার, ওটা ওর বয়েস। আর রঙের কথা? তা আপনার আমার হাতের বাইরে। ওর বয়সে আমি যখন পৌঁছুবো, তখন আমার রাগটাও ওর চেয়ে ভালো হবে বলে মনে হয় না। ওরই মত শরীরের পেশীগুলো ঝুঁকে যাবে, নিচের ঠোঁটটি ঝুলে পড়বে। নাকও বসে যাবে হয়তো, আর মুখের ওপরে বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মণিমালা বললেন, কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি, আপনার চোখের মণি সে-বয়সে ওর মত ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইবে না। অমন রাঙাও হবে না।

হতেও পারে।

হবে না। আপনি তো আর গাঁজা খান না।

বুঝলুম, মণিমালা গাঁজার কথাটাই মনে করে রেখেছেন। কাল চায়ের দোকানের ভদ্রলোকও বলেছিলেন, ওই বুড়োকে বিশ্বাস করাই আপনাদের অন্যায় হয়েছে। গাঁজার নেশায় সকাল-বিকেল বুঁদ হয়ে বসে থাকে। দু'আনা গাঁজার জন্য বালির মধ্যে দু'ঘন্টা ছুটোছুটি করতেও আপত্তি করবে না ও। আপনারা যেমন—

মণিমালা আর সুবীর আমাকে দোষ দিতে পারবেন না। আসলে বুড়ো ম্যানেজার যে এমনভাবে সব ভণ্ডুল করে দেবেন তা বুঝি নি। কন্ট্রাক্ট সার্ভিসের গাড়ি রোজই কোনারক যায়। আমরা যেদিন যাবো, সেদিনকার গাড়ি গত চারদিন আগে থেকেই কোথাকার একটা দল রিজার্ভ করে বসে আছে। সুতরাং বাইরের স্যালেন্জার নেওয়া চলবে না। ম্যানেজার তারিখের গণ্ডগোল করে মণিমালা আর সুবীরবাবুকে ঝুবিয়ে দিলেন। বাস রিজার্ভ হওয়ার সংবাদটা আগে পেলে সার্ভিস বাসে যেতে পারতুম। সেখানে ভাড়াও এক টাকা বারো আনা কম।

আমি অবশ্য ঠিক করেছিলুম, সকালে সূর্যোদয় দেখে রিক্সাতে সিংহদ্বার গিয়ে বাসে চাপবো। কিন্তু সমস্ত প্রোগ্রামটা নষ্ট হয়ে গেছে।

গতকাল দুপুরের রোদটা যেন আচমকা বড্ডো কড়া মনে হয়েছিল। বাইরে না বেরিয়ে ঘুমুচ্ছিলুম। মণিমালা আর সুবীর গেছেন সমুদ্রের ঢেউ শুনতে। ম্যানেজারবাবু ঠিক তখন তাদের পাকড়াও করেছেন। তারপর ওদের সঙ্গে এসে আমার ঘুম ভাঙালেন।

মণিমালা বললেন, ম্যানেজারবাবু বলছেন ওদের গাড়িতে যেতে।

শুধিয়েছিলুম, আপনাদের গাড়ি যাবে তো?

উনি বললেন, নিশ্চয়ই যাবে। রোজ যায়।

মণিমালা বললেন, সেটাই ভালো হবে কাশীনাথবাবু। আবার সিংহদ্বার গিয়ে বাসে চাপা, সে এক ঝামেলা। সার্ভিস বাসে সময়ও নাকি বেশি লাগে। অনেক জায়গাতে থামতে থামতে যায়। আমাদের এটাতেই সুবিধে।

সন্দেহভরে তবু শুধালুম, শেষে ডুবাবেন না তো ম্যানেজারবাবু?

না না, মোটেই না। আমাদের কন্ট্রাক্ট সার্ভিস। যে ক'টি সিট রয়েছে, ঠিক সেই ক'টি প্যাসেঞ্জার নেবো। কেন মিছিমিছি সার্ভিস বাসে ধুঁকতে ধুঁকতে যাবেন? কন্ট্রাক্ট সার্ভিসের প্রোপ্রাইটার দিবানাথ আমার ভাগনে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

তা পারি নি। এদের বাস আপিস আমি চিনি। স্বর্গদ্বারের মোড়ের ওপরে। দিবানাথ রায়ের সঙ্গে একটু আধটু আলাপও আছে। তিন তিন বার তার আপিসে হানা দিলুম। কিন্তু একবারও সাক্ষাৎ পেলুম না।

আজকে বাসের জন্য রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলুম সাড়ে আটটা পর্যন্ত। সাতটাতে বাস আসার কথা। প্রতিটি মুহূর্তে আশা করেছি, এই বুঝি এলো। কয়েকবার আপিসটাও ঘুরে এলুম। দিবানাথ রায়ের দেখা নেই। পৌনে আটটাতেও যদি বুদ্ধি করে সিংহদ্বারে গিয়ে সার্ভিস বাস ধরতুম, তবে যাওয়া হতো। কিন্তু ম্যানেজারবাবুর আশ্বাসে তাও করি নি। তিনি তখনও বলছেন, আরে ভাবছেন কেন? বাস ঠিক আসবে। নানা জায়গা থেকে লোক তুলবে। তাই একটু দেরি হচ্ছে।

লোকটার ওপরে তখনও রাগ করেন নি মণিমালা। বরং আশার কথাটা ভালোই লেগেছিল। কিন্তু সব নির্মূল করে দিল দিবানাথবাবু নিজে। তিনি এলেন পৌনে ন'টায়। তাঁর কাছে অভিযোগ জানাতেই তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। সমস্ত ব্যাপারটা শুনে বললেন, আপনাদের দিনটাই মাটি হয়ে গেল মামার জন্য।

তার মানে? মণিমালা প্রশ্ন করলেন।

আজকের গাড়ি চলে গেছে। মামা আপনাদের ডুবিয়েছেন। গাড়ি রিজার্ভ করে অন্য বল গেছে। আজকের জন্যে তো কারুর কাছে থেকে টাকা নেওয়া হয় নি?

সুধীর এরই মধ্যে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সে বললো, কিন্তু আমাদের কাছে থেকে নিয়েছেন আপনার মামা। এই দেখুন রসিদ।

দিবানাথবাবু ডাকলেন তাঁর মামাকে। ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন বিড়ি টানতে টানতে।

মামা, আপনি জানতেন না যে দোসরা তারিখ গাড়ি রিজার্ভ রয়েছে?

ম্যানেজারের মুখের কোঁচকানো চামড়া আরো কুঁচকে গেল। ভ্রূ দুটি হলো কুঞ্চিত। বললেন, নিশ্চয়ই জানি।

আজকে কতো তারিখ? দিবানাথবাবু শুধালেন।

কেন,—পরশু? ওইতো, ওই হোটেলের কয়েকজন কালকে যেতে চেয়েছিলেন। তাদের বলনুম, কাল যাওয়া হবে না। আমাদের গাড়ি কালকের জন্য রিজার্ভড্। তা আজকে গাড়ি কেন এলো না তা বলো এখন। এরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

সুবীর চেঁচিয়ে উঠলো, হোপলেস। আজকেই যে মশাই দুই তারিখ।

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ম্যানেজারবাবু সুবীরের দিকে তাকালেন।

বিবানাথবাবু বললেন,—মামা, কাল দুপুরে বুঝি বেশ করে গাঁজা টেনেছিলেন?

গাঁজা। হুঁ, তোর যেমন কথা বিবানাথ। শুনলেও পিত্তি জ্বলে যায়। সব সময় তুই এমনি করে আমার প্রেস্টিজ ডাউন করছিস্। তা, তোর গাড়ির কি হলো বল্।

সুবীর আবার বললো, ম্যানেজারবাবু, আজকে দুই তারিখ।

বিবানাথবাবু আক্ষেপ করলেন, মামা, আপনার জন্ম আমার ব্যবসাটা মাটি হবে। মিছামিছি বয়নাথ কিনতে হচ্ছে আমাকে।

তারপর আমাকে বললেন, আপনি মশাই প্রায়ই তো এদিকে আসেন। আমাকে একবার বললে পারতেন। আপনার তো অচেনা নয় আমার আপিসটা?

কাল তিনবার চেষ্টা করেও তাঁকে পাই নি একথা জানালুম।

মণিমালার জন্ম আমার করুণা হয়। বেচারী কোনদিন হয়তো আসতে পারবে না আর। কার ঘরণী হয়ে কোথায় যাবে কে জানে। মেয়েদের সব সময়, সব জায়গায় যাওয়া হয়ে ওঠে না।

সুবীরের কাছে জেনেছি, মণিমালা নাকি কালাপাহাড় সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনা করেছেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মত, কোনারকের মন্দির কালাপাহাড় ধ্বংস করেননি। ওটা ধ্বংসের কারণ মন্দিরের ওপরের প্রবল চুম্বক। ওর টানে জাহাজ কম্পাসশক্তি হারিয়ে এখানে এসে ঠোক্কর খেত। তাই পর্তুগীজরা মন্দিরটা ধ্বংস করেছে। মণিমালা এ কথা বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতের স্বপক্ষে অনেক জোরালো প্রমাণ রয়েছে। এ সম্বন্ধে মণিমালার কিছু লিখবার ইচ্ছা আছে নাকি।

তেতলার ওপরে পরপর চারখানি ঘর। দু'খানি আমাদের আর মণিমালাদের দখলে। বাকি দুখানাতে যারা রয়েছেন, সমুদ্র পার থেকে ফিরে আসেননি এখনও। মণিমালার মা আমার মায়ের সঙ্গে গল্প করছেন।

আমি বারান্দার এ কোনে। এ জায়গা বেশ লাগে। বলতে গেলে, গোটা সকালটা এখানে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দেই। দেখি ডাঁওতা আর ডলিডার খেলা। সকালের দিকেই স্নান-যাত্রার ভিড়। যত তীর্থযাত্রী এসে ওঠে ধর্মশালাতে, সকাল বেলায় এই রাস্তা দিয়ে তারা আসে স্নান করতে। তার আগেই ভিখারির দল এসে জাকড়া আর চট বিছিয়ে বসে যায়। স্নান করে ফেলে দলকে দল। কেউ-কেউ পয়সা আর চাল ছড়াতে ছড়াতে যায়। সকালের ভিড় দেখে বুঝেছি, বাঙালীরা তীর্থ করতে জানে না। জানে এরা—এই বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ আর রাজস্থানের লোকেরা। মাথা মুড়াবার নিয়ম যাদের আছে, তারা ন্যাড়া হয়ে সমুদ্রে স্নান করতে আসে। জলে নারকেল ভাসিয়ে নাইতে নামে। তারপর পাঁচ সিকে পয়সা দিয়ে সমাধা করে গো-দান। একই গো-বৎস নিবেদিত হচ্ছে বার বার। কারুর অভিযোগ নেই। স্নান পর্ব সমাধার জন্ম চীৎকার, হৈ-হৈ, হুল্লোড়। গো-দান শেষ করে ফেরার পথে ভিখারিদের দান। রাস্তার ডান দিকে বিছানো চট কিম্বা জাকড়ার ওপরে চাল পয়সার ছড়াছড়ি। যেয়ো হাত-পা নিয়ে ভিখারিরা অবিশ্রান্ত চীৎকার করে। ক্ষতস্থানের জাকড়া ভিজে যেন রক্ত উপচে পড়ছে। মাছি উড়ছে, বসছে।

স্বর্গদ্বার আর সিংহদ্বার। স্বর্গদ্বারের রূপ সমুদ্রের। সিংহদ্বারে পাণ্ডা আর ভিখারির শোষণ। তবু সিংহদ্বারেরও রূপ আছে। মাস্তিকের চোখে ধরা পড়বে না। তাদের মনে রেখাপাত করবে না সে সৌন্দর্য। সিংহদ্বারের রূপ মন্দিরের। প্রভু জগন্নাথের। মহিমা ভগবানের।

কিন্তু এই স্বর্গদ্বার আর সিংহদ্বারের মাঝে নরক। ঘিঞ্জি রাস্তার দু'পাশে ভিখারির মেলা। এক সৌন্দর্য থেকে অপর সৌন্দর্যে দেখ। স্বর্গদ্বার আর সিংহদ্বারের মধ্যকার জায়গাটুকুতে লোভ আর ঔনিত্যের মেলা।

সকালবেলায় ডেতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই লোভ আর ঔনিত্যকে আমি দেখি। রাস্তার পাশে শুয়ে আপাদমস্তক নোংরা কাপড়ে ঢেকে যেসো গা কিম্বা হাতকে ঘির ঘির করে কাঁপাতে কাঁপাতে করুণ চীৎকারে পুণ্যকামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে যারা, স্নানের ভিড় কমে গেলে তাদের উঠে বসতে দেখেছি। দেখছি তাদের সুস্থ আর স্বাভাবিক শরীর। শুনেছি অন্যরূপ কণ্ঠস্বর। তারা উঠে বসছে, গল্প-করছে। বিড়ি ফুঁকছে।

পুণ্যকামীর ভিড় সাড়ে ন'টার মধ্যে কমে যায়। ভিখারিরা সেরেস্তা গুটায়। পয়সার হিসেব করে। তারপর শরীরের ক্ষত জায়গার উপর থেকে ন্যাকড়ার প্যাচ খুলতে থাকে। একের পর এক। সব খোলা হয়ে গেলে দেখি ক্ষত কিম্বা ঘা নেই। নেই কোন খুঁত। নিরোগ অঙ্গ। যার সত্যিকারের কিছু আছে, সে বাঁধন খোলে না। স্বর্গদ্বার পর্যন্ত সত্যিকারের রুগ্ন মাত্র গুটি কয়েক নজরে পড়েছে।

নিজেদের স্বার্থে ইংরেজ সুস্থ চীনাদের নেশা করতে শিখিয়েছিল। কিন্তু তীর্থযাত্রীরা এদের ভিখারি বানালে কোন্ স্বার্থে তা আমার কাছে আজও পরিষ্কার হল না। এই দ্বাদশ আগমনেও না। তাদের কাছ থেকে প্রশ্রয় পাওয়া যায় বলেই সুস্থ মানুষ রোগগ্রস্তের অভিনয় করছে। ভিক্ষা না পেলে ওরা খেটে খাবার চেষ্টা করতো। পুণ্যকামীর এতে কি পুণ্য-লাভ হবে?

দানের তৃপ্তি আছে জানি। কিন্তু যে-দান সুস্থ মানুষকে লোভী আর রুগ্ন হ'তে শিক্ষা দেয়, সে দানে পুণ্যলাভ হয় কিনা আমার জানা নেই।

বিকেলে রাস্তাঘাটকে অনেক শান্ত আর নম্র মনে হয়। সন্ধ্যার খানিক পরে হাওড়া প্যাসেন্জারের যাত্রীর টিকণা এসে থামে আশ্রমের ফটকের সামনে। তখন থেকেই কানের কাছে ঘ্যান-ঘ্যান করেন হোটেলের ম্যানেজার। আমি সাধারণত এ সময়তে সমুদ্রের বালুর ওপরে বসে থাকি। আর এখানকার অস্থায়ী সংসারের জিনিসপত্তর কিনতে হয়েছে বলে আজ আর সমুদ্রের ধারে যেতে পারি নি। ও কাজ সেরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছি। খানিক বাদেই মণিমালা এসেছেন। উনি আজকে বোধ হয় বেড়াতে যান নি। তা হলে ফিরতে দেখতুম।

সমস্ত যাত্রী আশ্রমের ভেতরে ঢুকতেই ম্যানেজারবাবু ফিরে গেছেন। রাস্তাটাকে তখন ফাঁকাই বলা যায়।

ম্যানেজার চলে যেতেই ও প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটেছে।

কাল তা হলে আপনারা যাচ্ছেন, মিস্ সরকার?

হ্যাঁ। কেমন ভিজে ভিজে ওর কণ্ঠস্বর।

কোনারক তা হলে এ যাত্রাতে যাচ্ছেন না? মণিমালা প্রশ্ন করলেন।

ভবিষ্যতের কোন যাত্রায় যাওয়া হবে কিনা, তা-ও জানা নেই। বলসুম।

আমাদের সঙ্গে ভুবনেশ্বর চলুন না?

উপায় নেই মিস্ সরকার। ব্যবসাপত্তর গোছাতে যাবে তা হলে।

মণিমালা চুপ করে গেলেন। আমিও ওখান থেকে চলে আসবো ভাবছিলুম।

হঠাৎ মণিমালা বললেন,—এ ক'দিনের স্মৃতি মনে থাকবে ?

কোলকাতায় আমাদের বাড়িতে যাবেন সময় করে।

বললুম,—এখানে দেখছেন অকাজে ডুবে রয়েছি। ওখানে অনেক কাজ। ব্যবসায়ী লোক। নানা দাঙ্গায় ঘুরতে হয়। কথা দেওয়া মুশকিল।

কয়েক সেকেণ্ড বিরতির পরে মণিমালা আবার মুখ খুললেন,—আমাকে মনে থাকবে ?

মণিমালার স্বর যেন কেঁপে উঠেছে। যেন কান্নার মতো শুনালো।

আমি কাশীনাথ বসু। হোঁচট খেয়ে খেয়ে কোন রকমে ইণ্টারমিডিয়েটের চৌকাঠটা ডিঙিয়েছি। চাকরি না পেয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশগুলো কালিয়ে নিয়ে ব্যবসাতে নেমেছি। কোলকাতার কয়েকটা হাসপাতালে চাল-ডাল-তরকারি-মাছ-মাংস সরবরাহ করি। কাজ আমার দিন রাত সাইকেল নিয়ে টো-টো করা। আর মণ-সেরের হিসেব রাখা। মেয়েদের মনের হিসেব করবার সুযোগ কখনও পাই নি।

মণিমালার দিকে তাকালুম। রেলিংএ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছেন উনি। চাঁদের আলো কোনাকুনি ওর মুখের ওপরে পড়ে একটু পাশ উদ্ভাসিত করে অপরকে অস্পষ্ট করে দিয়েছে। দেখলুম, ওর ঠোঁট কাঁপছে। হাত দু'টিকে বুকের নিচে ভাঁজ করে দাঁড়িয়েছেন মণিমালা। বাঁ হাতের আংটির ইংলিস কাটিং এর কমল হীরেটা অনেকগুলি উজ্জ্বল বিন্দুতে ঝিলমিল করছে।

দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে সামনে তাকালুম। সোঁ-সোঁ করে বাতাস আসছে সমুদ্রের। এখানে দাঁড়িয়েই সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি। চাঁদের আলোতে ঝলমল করছে বঙ্গোপসাগর। বেলাভূমির কাছে এসে ঢেউগুলি ভেঙে অজস্র শুভ্র বুদবুদ মন্ত্র দিয়ে আছড়ে পড়ছে বালুর ওপরে।

আমাকে মনে থাকবে ? মণিমালা ফিস্‌ফিসিয়ে আবার শুধালেন।

আমি ব্যবসায়ী কাশীনাথ বসু। মেয়েমানুষের মনের কিনারায় পৌঁছতে চাই নি কোনদিন। আজ যেন প্রচণ্ড ঢেউ আকস্মিকভাবে আমাকে কিনারাতে এনে ফেললো।

সে এক আশ্চর্য অনুভূতি। মনে হল, আমার শরীরের সমস্ত রক্তে বঙ্গোপসাগরের মতো ঢেউ খেলতে শুরু করেছে। ভৌগোলিকদের মতে বঙ্গোপসাগর নাকি ঠাণ্ডা সমুদ্র। তাই যদি হবে তো আমার মনটা এমন উত্তাল হয়ে উঠলো কেন ? বুঝি ভেঙে-চুরে গেছে আমার ব্যবসায়ী মনটা। নতুন এক অনুভূতি আর সুর মণ-সেরের হিসেবের মাঝে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে।

মণিমালা এগিয়ে এসে আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছেন।

———

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

'সেকী! তারপর পথের মাঝে আবার যদি তুমি মাথা ঘুরিয়ে ব'সে পড়ো তখন উপায় হবে কী? এই দীর্ঘ চড়াই ওৎরাই তোমাকে কাঁধে করে আমার ওঠা নামা করতে হবে দেখতে পাচ্ছি—' মুখ ঘন ঘষে ক'রে পর্ণা জবাব দিলো।

ফুলমু ছিলো পর্ণার পাশে দাঁড়ানো। মুখটা নামিয়ে এবং গলা তার চেয়েও নামিয়ে আস্তে বলে ফেললো,

'অত ভাগ্য আমার কোনোদিনও হবে না—'

কর্ণাক গলা বাড়িয়ে পর্ণাকে জিগেস করলো,

'দিলরাজ কী বললো রে বেটা?'

পর্ণা, ফুলমুর কথা শুনতে পায় নি, এমন ভঙ্গি ক'রে মুখ ঘুরিয়ে উইলো গাছের একটা শুকনো ডাল নিরীক্ষণ করছিলো। কর্ণাকের প্রশ্ন শুনে ওর কানের দু'পাশটা একটু গরম হলো। মুখ ঘুরিয়ে হেলা-ফেলা ভাব দেখিয়ে বললো,

'ও পাগলের কথার কী কোনো মাথামুণ্ডু আছে নাকি। চলো এবার আমরা যাই—।'

ওরা এখন ওৎরাই পথে নামতে লাগলো। একটু পথ নেমেই পর্ণার একটা কথা খেয়াল হলো। ওদের শুনিয়েই সেটা বললো, 'ঘোড়াওয়ালা কোনো পয়সা না নিয়েই চলে গেলো, ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো!'

ফুলমু পর্ণার দিকে চেয়ে বললো,

'পয়সা চেয়েছিলো ঘোড়াওয়ালা। আমার কাছে তো পয়সা কড়ি কিছু ছিলো না, নতুন মগটা দিয়ে ঘোড়াওয়ালাকে বিদায় করেছি'—কথা শেষ ক'রে ফুলমু সুন্দর হাসি হাসলো। এমন মন ভোলানো হাসি মেয়েরাই শুধু হাসতে পারে। আর ওর হাসিটা যেন অনুনয় করলো পর্ণাকে—

অনেক তো বকেছো আমাকে, আর বকো না।

পর্ণা এবার না হেসে পারলো না। হেসে বললো,

'বেশ করেছো দিলরাজ, ভালোই করেছো।'

কর্ণাক কিন্তু খানিকটা বকাবকি না করে ছাড়লো না।

পর্ণারা দুর্গের আড়াল হতেই, লালসাহেব আর ডিক্ উইলো গাছের কাছে এসে দাঁড়ালো। এরা দু'জনেই কাংড়া উপত্যকায় একসঙ্গে ব্যবসা শুরু করেছিলো। লালসাহেব চায়ের আর ডিক্ সিনকোনার। সিনকোনার ব্যবসায় তেমন লাভ না হওয়াতে ডিক অনেকদিন আগেই ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে। চায়ের ব্যবসায় কিন্তু লালে লাল লালসাহেব। লালসাহেবের চা-বাগিচা পালমপুরের বাজারে। কাংড়া থেকে পালমপুরের দূরত্ব চব্বিশ মাইল। আজকাল কিছুদিন ধরে ওদের দু'জনকে ঘন ঘন মোটরে

ক'রে কাংড়ায় আসতে দেখা যাচ্ছে। সকলে ভাবে শিকারের নেশায় আর কতো তোলার নেশায় ওরা কাংড়ায় আসে। এগুলো উদ্দেশ্য থাকলেও গৌণ। আসল উদ্দেশ্য হলো,—কাংড়ায় ছোটো ছোটো সব কিছু ব্যবস্থা করবে লালসাহেব। বাঙ্গলা চা-বাগিচার নাম ডাক খুব। কাংড়া উপত্যকায় চা-বাগিচা অসংখ্য। কাংড়ার আবহাওয়া এবং জমি, চা চাষের পক্ষে খুবই অনুকূল। ছোটো বড়ো মিলিয়ে আড়াই হাজারের ওপর চা-বাগিচা আছে এখানে। আর এই বাঙ্গলা চা-বাগিচা কাংড়া উপত্যকার মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম বাগিচা। কাজেই ডিক ও ব্যাপারে বন্ধুকে মুরুব্বী ধরেছে।

লালসাহেব আর ডিক দ্রুত পথে নেমে এলো। দেখলো ওরা তিন জন আস্তে আস্তে ওৎরাই পথে নেমে যাচ্ছে। ডিকের কাঁধে বন্দুক। ও বন্দুকটা ভাগ্ করে এক নজর দেখে নিলো। তারপর, বন্দুক নামিয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললো,—'বন্দুকের পাল্লার মধ্যেই ওরা এখনো আছে, দিন কাল খারাপ, না হ'লে দুড়ো আর সর্দারের বুক ছেঁদা ক'রে এখুনি তোমার ফিয়াসেকে এনে দিতাম তোমার হাতে।'

লালসাহেব পকেট থেকে একটা রঙীন পানীয়ের ছোট বোতল বার ক'রে, ছিপি খুলে একেবারে সবটা মুখে ঢেলে দিলো। গাল ফুলিয়ে বিশ্রীরকম একটা ঢেকুর তুলে সজোরে ডিকের কাঁধ চাপড়ে দিলো, 'থাঙ্কস্! তা হলে ডিক, গুলিবিদ্ধ না করতে পারো, একটা কিছু উপায় করো। ওই যৌবনবতীকে কোনোমতেই আজ রাত্রে পাওয়া যায় না?'

ডিক্ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হাসলো,

'মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গেছে হে। শেষের বোতলটা না গিললেই পারতে—'

'আরে না, না,—আমি ঠিক আছি। কোয়াইট ও-কে।'

ঠাট্টা নয়, আমি ঠাণ্ডা মেজাজেই বলছি—

'ওই রূপবতীকে আজ রাত্রেই যদি পাইয়ে দাও, তা হলে কালকেই তোমাকে একটা চা-বাগিচার কর্তা ক'রে দেব সিওর।'

ডিক বললো,

'অত অস্থির হয়ো না লাল, সব নষ্ট হবে তা হলে—। রূপবতীকে তুমি পাবেই, মনে কর পেয়েই গেছো। কিন্তু, আমাকে সময় দিতে হবে সাত দিন। ঘাঁটি ঘাট বেঁধে এগোতে হবে তো! কেমন একটি এডিকং রূপবতীর সঙ্গে ঘুরছে, সেটা ভুলে যাচ্ছো কেন? আচ্ছা লাল, আমাদের তো ভুলও হতে পারে। হয়তো ও, সেই রূপবতীর ভাই, দুইনের একজন—'

হো-হো ক'রে হেসে উঠলো লালসাহেব,

'তোমার অবজারভেশন বড় ফিকে ডিক্, দেখছো না, এই গরমে গায়ে একটা মোটা চাদর পেঁচিয়েছে—'

'হো-হো—'! ডিকও বন্ধুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসতে লাগলো,

'যখন আমিও পাবো তো?'

'ও সিওর!' ডিকের কাঁধ আবার চাপড়ে দিলো লালসাহেব।

দুলু আর কর্ণার কথা বলে বলে নামছিলো। কিন্তু পর্দা একেবারে চুপ। দুর্গের চারিদিক ঘিরে উঁচু পাষাণ প্রাচীর। ভূমিকম্পের পর প্রাচীরের অনেকখানি ভেঙে গেছে। তবু কিছু কিছু অংশ এখনো দাঁড়িয়ে আছে সোজা হয়ে। এই অংশগুলো ঘেঁষিয়ে কর্ণার বললো,

'বেটা, দেখেছিস, দুর্গপ্রাচীর কী মজবুত ছিলো!'

ফুলমু কিছুক্ষণ প্রাচীরের অন্তর অংশটা নিরীক্ষণ করলো, প্রাচীরের মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো খুপ্‌রির মতো ছিলো, ফুলমু আঙুল দিয়ে দেখালো,

'চাচাজী, ও গুলো কী?'

'ও-গুলোকে বলে মোরচা, রক্ষিবাহিনী ওখানে দাঁড়িয়ে বাইরেটা পর্যবেক্ষণ করতো। আর ওই যে প্রাচীরের ওপর দেখা যাচ্ছে ছোটো ছোটো ছেঁদা, দূর থেকে অত ছোটো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ফুটোগুলো খুব ছোটো নয়,—শত্রু দুর্গ আক্রমণ করলে, দুর্গের ভেতর থেকে ওই ছেঁদা দিয়ে বাধা দিতো।'

আনমনা পর্মার কানে কিছু কিছু গেল, ও মন দিয়ে কর্ণাক্ষর কথা শুনতে চাইলো, শুনতে চাইছে, কিন্তু মনটা যেন আজ ওর নাগালের বাইরে, কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না। না হলে দুর্গের আরো অনেক কিছু জানবার, জেনে নেবার ছিলো। ওর তীক্ষ্ণ চোখ নিরীক্ষণ করেছিলো, বিরাট বাঁধানো একটা চত্বর, চত্বরের একদিকের খানিকটা জায়গা অনেকখানি উঁচু, চত্বরের একপাশে মোটা মোটা মাথা ভাঙা কতগুলি থাম,—বোধ হয় এটা কাটোচ রাজাদের দরবার ঘর ছিলো, কর্ণাক্ষ চাচা এর পরিচয় হয়তো ইতিমধ্যে দিয়েছে, ও তখন অন্যমনস্ক ছিলো,—মনের এমন অসীম ক্ষমতা, ওর এতবড় তাগড়া শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়েও তাকে ঠেকানো যায় না, ফেরানো যায় না, যেন আজই সেটা বিশেষ ক'রে উপলব্ধি করলো পরমবার। দুর্গ চূড়ো থেকে নেমে আসার সময়, কর্ণাক্ষ কতগুলি কূপ দেখিয়েছিলো, দীঘি দেখিয়েছিলো,—পর্মা এখন ভেবে দেখলো, সে সবের একটা নামও ও এখন মনে করতে পারছে না।—এমন ঘটনা এর আগে ওর জীবনে আর কখনো হয় নি। পাথরে-পাড় বাঁধানো একটা মস্তবড় জলাশয়ের নাম এবার ওর মনে পড়লো—কর্পূর সাগর। বোধ হয় এইজন্য মনে পড়লো যে কর্পূরের গন্ধটা ও ছোটোবেলা থেকে খুব পছন্দ করে। ফুলমু কর্পূর সাগরের জলে হাতমুখ ধুয়েছিলো। সবুজ পানায় ঢাকা কর্পূর সাগরের এত কটকটে জল, ফুলমু হাত দিয়ে পানা না সরালে বোঝাই যেতো না। এত পরিষ্কার জল, জলের নিচের নুড়িগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো, ফুলমুর হাতখানা যেন গল্প হয়ে ফুটেছিলো কর্পূর সাগরের বুকে···।

'এই পর্মা, ভাবছিস কী? বানগঙ্গা, পাতাল গঙ্গা দেখে নে—' কর্ণাক্ষর কণ্ঠস্বরে পর্মা যেন চমকে চোখ তুললো।

বান গঙ্গাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে, পাতাল গঙ্গা কিছু অস্পষ্ট। ফুলমু দাঁড়িয়ে পড়লো। ওরাও দাঁড়ালো। ফুলমু বললো,

'চাচাজী, পাতালগঙ্গার জল যেন লাল পানা বলে মনে হচ্ছে—'

'হ্যাঁ। একেবারে লাল। যেন রক্তের মতো লাল—' কর্ণাক্ষ জবাব দিলো। সকলেরই নজর পাতাল গঙ্গার দিকে।

ফুলমু আর কর্ণাক্ষ পাশাপাশি সামনে দাঁড়ানো, আর ওদের একটু পেছনে পর্মা। হঠাৎ ওপর থেকে একটা বড় পাথরের চাঁই গড়াতে গড়াতে ছিটকে এসে পর্মার বাম কাঁধে পড়লো। পর্মার শরীরটা একটা চক্কর খেয়ে পড়ে গেলো, আর মুখ দিয়ে আওয়াজ বার হলো,

"অ,-মা-মা—"

ফুলমু ছুটে এসে পর্মাকে দু' হাত দিয়ে ধরে এমন ক'রে কেঁদে উঠলো, ওর সেই বুকফাটা

আর্তনাদ তখুনি মিলিয়ে গেলো না ; এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে মিলালো। পর্ণা তার অসহ্য ব্যথা ভুলে চোখ বড় ক'রে ফুলমুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো একটু কাল। তারপর উঠে দাঁড়ালো। যন্ত্রণা চেপে মুখে একটু হাসিও ফোটালো পর্ণা,

'ঠিক আছে। চলো যাই—।'

কর্ণাক বিশ্বাস করলো, কিন্তু ফুলমু বিশ্বাস করলো না। ও পিছিয়ে গিয়ে পর্ণার পেছন পেছন চলতে লাগলো। কর্ণাক রইলো সামনে আর পর্ণা মাঝখানে। পর্ণা একবারও পেছন ফিরলো না। কিন্তু যেমন না তাকিয়েও, না কান পেতেও কিছু কিছু জিনিস দেখা যায়, কোনো কোনো শব্দ শোনা যায়,—তেমনি ক'রেই পর্ণা সারা পথে ফুলমুর কান্না শুনতে পেলো, দেখতে পেলো।

বাড়ি ফিরে ফুলমুর অবরুদ্ধতিতে কোর্তা খুলে কাঁধ দেখাতেই হলো পর্ণাকে। শুধু ফুলমু নয়, কর্ণাক পর্যন্ত চমকে উঠলো,—কাঁধ ফুলে একেবারে ঢোল হয়ে গেছে।

কর্ণাক বললো,

'এঃ, পর্ণা, কাঁধ ফুলিয়ে বসলি, পরশুর ভোজে তা হলে যাবি কী ক'রে ?'

ফুলমু মনে মনে কর্ণাকর ওপর ভয়ানক খেপে গেলো,

বুড়ো হলে এমনি বাহাদুরেই ধরে। অমন চোট খেলো, পর্ণারের তার জন্য কোনো আক্ষেপ নেই, খাওয়াই বাতানো নেই ;—না, পরশুর ভোজে যাবি কী ক'রে ? লোভী পেটুক কোথাকার।

পরমরাজ,—দুপুরে কিছু খাবে না, ব'লে—বিছানা বিছিয়ে,—কোলা জায়গায় একটা জলপট্টি লাগিয়ে শুয়ে পড়লো। ফুলমুকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কয়েকটা রুটি বানাতে হলো—। বুড়ো তামাকু টানতে টানতে বললো,

'ফিলরাজ, তোরা থাকতে, এই বুড়ো বয়সে আমি আর হাত পুড়িয়ে খানা পাকাবো কেন ?'

কর্ণাক ফরমাস মতো ফুলির (ফুটার) রুটি বানালো ফুলমু। ঘন খানা বানালো। পর্ণারের জন্য সরিয়ে রাখলো দু'খানা, নিজে দু'খানা খেলো, জোর করে জল দিয়ে দিয়ে খেলো—ওর শরীর ঠিক রাখতেই হবে, দুর্বল হলে চলবে না।—আর কর্ণাক খেলো দু'খানা।

দুপুর বেলা কর্ণাক যখন ঘুমিয়ে পড়লো, ফুলমু পর্ণার পাশে এসে দাঁড়ালো। পর্ণার ঘুমোচ্ছে। জলপট্টিটা শুকিয়ে গেছে। ফুলমু পট্টিটা আস্তে ক'রে তুলে নিলো। ফোলা একটুও কমে নি, বরং আরো বেড়েছে। অনেকক্ষণ ফোলার দিকে তাকিয়ে একেবারে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো ফুলমু। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে ওর নিজের ছোট পোঁটলাটা খুললো। পোটলা হাতড়ে কী যেন বার ক'রে নিয়ে কোর্তার পকেটে পুরলো, তারপর নিঃশব্দে পা টিপে টিপে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

পর্ণার ঘুম ভাঙলো কর্ণাকর বক্ বকানি কানিতে। চোখ মেলে ও যেন আচ্ছন্নের ঘোরে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো।

—এ কোথায় ও শুয়ে আছে ? এত অন্ধকার কেন ?

একটু নড়তে গিয়েই ব্যথাটা চাটিয়ে উঠলো আর তখুনি ওর মনে পড়ে গেল সব।—এটা চাষা নয়, এটা ওর নিজের ঘর নয়। এটা কাংড়া, এটা কর্ণাক-চাচার ঘর। শুধু কাঁধ নয়, বাঁ হাতটাও খুব টাটাচ্ছে। ওর এই এতখানি বয়েসে, ও কখনো কোনো দাওয়াই খায় নি, ব্যবহৃত করে নি,—সেজন্য ব্যথাটাকে তেমন আমল দেয়নি ও। ভেবেছিলো জলপট্টি দিলেই নরম হয়ে যাবে ব্যথা। কিন্তু, ফোলাটাকে অবহেলা করা

ঠিক হয় নি। চাঁয়ালী গাঁয়ের জয়রাজ ওঝা শুনেছি খুব ভণ্ডী লোক। ও, বাড়ফুঁক ক'রে শুধু অপদেবতাই তাড়ায় না, অসুখ সারায়, ব্যথা সারায়। কিন্তু, পর্ণা তাকে এখন পাচ্ছে কোথায়……?

'দিলরাজ, বেটা—! দাচিস্‌টা কোথায় রাখ্‌লি, দিয়ে যা—'

কর্ণাক্ষর হাঁক ডাক শুনে পর্ণা বিছানায় আস্তে আস্তে উঠে বসলো। বাঁ হাতটা তুলতে গিয়ে দেখলো নাড়তে পারছে না একেবারে। কেমন যেন একটু অসহায় বোধ করতে লাগলো পরমরাজ।

কর্ণাক্ষ গলা চড়িয়ে আর একবার দিলরাজকে ডাক দিলো কোন সাড়া নেই।

'গেলো কোথায় বেটা—' কর্ণাক্ষর গলায় একরাশ বিরক্তি ঝরলো।

—তাইতো. ফুল্‌মু গেল কোথায়! —পর্ণাও ভাবলো এ কথাটা।

—আরে, এ ই তো দাচিস্—কাঠকয়লার বস্তার পাশ থেকে দাচিস্‌টা টেনে নিয়ে খুশি গলায় বললো কর্ণাক্ষ, তার পর মাথা নেড়ে বলতে লাগলো,

'বেটা নিশ্চয়ই শহর ঢুঁড়তে গেছে, বেটার খুব নজর আছে, জানবার আগ্রহ আছে,—এটা ভালো, খুব ভালো'।

পরমরাজ কিন্তু খুশি হতে পারলো না। যেন ভাবিত হয়ে পড়লো। অচেনা শহরে ফুল্‌মুর একা একা ঘাওয়াটা আদৌ ঠিক হয় নি—মরণা ভুলে এই কথাটাই বারে বারে মনে হতে লাগলো পর্ণার। দরজার দিকে তাকিয়ে রইলো।

যেন এক ঝলক বাতাসের মতো ঘরে ঢুকলো ফুল্‌মু। কপাটের সামনে থেকে কাকে যেন জোর ক'রে তাড়িয়ে দিলো। মনে হলো যে আসছিলো তার যেন কিছুতেই ফেরার ইচ্ছে ছিলো না—ফুল্‌মুর জবরদস্তিতে ফিরে গেলো ক্ষুণ্ণ হয়ে।

পর্ণা জিগ্যেস করলো,

'কাকে তাড়ালে দিলরাজ? কেন আসতে দিলে না?'

কর্ণাক্ষও সেই একই প্রশ্ন করলো।

'বলছি, পাঁচ মিনিট পরে সব বলছি—' ছড় ঘুড়িয়ে ফুল্‌মু সামনের ছোট্ট ঘেরা বারান্দা, যেখানে রান্না হয় কর্ণাক্ষর, সেখানে গিয়ে ঢুকলো। ওই আবছা অন্ধকারের মধ্যেই পর্ণার চোখে পড়লো, ফুল্‌মুর কাঁধে একটা নতুন ঝোলা আর ঝোলার পেটটা বেশ মোটা। প্রথমে ফুল্‌মু একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে ঘরের দাওয়ায় রেখে গেলো। তার মিনিটখানেক পরেই, বাঁ হাতের তালুতে কতকগুলো পাতা নিয়ে ডান হাত দিয়ে ডলতে ডলতে পর্ণার সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো,

'সর্দার, শুয়ে পড়ো দাওয়াই লাগাবো—'

পর্ণা ক্ষুব্ধ কঁচকে জিগ্যেস করলো,

'কী দাওয়াই শুনি?'

'পরে শুনো সর্দার, শিগ্‌গির শোও, শুকিয়ে যাচ্ছে—'

পরমরাজ আর কিছু না ব'লে শুয়ে পড়লো। একেবারে পর্ণার বুক ঘেঁসে বসলো ফুল্‌মু। পর্ণা জানে যে আর একটু ঘুরে বসেও কাঁধে ওষুধ লাগানো যায়,—কিন্তু, ফুল্‌মুকে সে সব বলা বা বোঝানো নিরর্থক। কাজেই অন্য কোনো উপায় না দেখে পর্ণা চোখ বুজলো। আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে পর্ণার কোলা জায়গায় পাতার রস লাগিয়ে দিতে লাগলো ফুল্‌মু। চোখ বুজে ফুল্‌মুকে না দেখা ঢেকানো যায়

কিন্তু ফুল্‌মুর স্পর্শ? পাতার রসের প্রত্যেকটা ফোঁটা যেন বিন্দু বিন্দু প্রেম হয়ে ঝরছে। ওর মতো সর্দারের শরীর এত স্পর্শ সচেতন কেন, নিজের শরীরের এই দুর্বলতায় নিজের ওপর নিজের বিরক্ত হলো পরমরাজ।

'সর্দার! তোমার কী খুব কষ্ট হচ্ছে?' দিলরাজের প্রশ্ন নয় এটা, এটা ফুল্‌মুর। পর্দাকে চোখ খুলতেই হলো। ব্যথার কথা কিছু বলতে গিয়েই ও অনুভব করলো, যেন জাদু মন্ত্রে ওর ব্যথার উপশম হয়েছে,—নেই বললেই হয়। এতক্ষণ ওর মনে হচ্ছিলো, কাঁধের ওপর যেন ধসধসি একটা জগদ্দল পাথর চাপানো রয়েছে। এখন কাঁধটা হাল্‌কা একেবারে। তারি আশ্চর্য ওষুধ তো ফুল্‌মুর!

চোখ খুলে হাসলো পরমরাজ, বললো,

'না, দিলরাজ। এখন, আর আমার কোনো কষ্ট নেই'—

একটা দীর্ঘ নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ফেলে ডাইনে বাঁয়ে মাথা দুলিয়ে একটু আহ্লাদের হাসি হেসে নিলো ফুল্‌মু। তারপর লাফিয়ে উঠে আবার চাকা বারান্দায় চলে গেল। একটু পরে ঘরে ঢুকলো দু'হাতে দুটো ধূমায়িত চায়ের বাটি নিয়ে। এক বাটি কর্দারু-চাচার হাতে দিয়ে, আর এক বাটি পর্দার পাশে নামিয়ে রেখে বললো,

'সর্দার। উঠে চা খাও'—আবার ছুটে চলে গেলো ভেতরে। পেতলের থালায় ক'রে রুটির রুটি দু'খানা গরম ক'রে নিয়ে এলো, আর নিজের জন্য এক বাটি চা। পর্দাকে রুটি দিয়ে নিজের চায়ের বাটি নিয়ে পর্দার সামনেই বসে পড়লো। পর্দা চা খেতে খেতে, ফুল্‌মুর ছুটোছুটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো। ফুল্‌মুর ওষুধে কাঁধের যন্ত্রণা এক নিমেষে কমে যাওয়াতে, ও বেশ কিছুটা অভিভূত। তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে মনে হলো, এইটেই ওর শরীর চাইছিলো এখন। তারপর রুটার রুটি খেতে খেতে মনে হলো, কী দারুণ খিদে পেয়েছিলো ওর, ওর শরীর এইটেই চাইছিলো। কৃতজ্ঞ চোখে ফুল্‌মুর দিকে তাকালো পর্দা। ফুল্‌মুর মিষ্টি গালে টোল পড়লো। অর্ধস্বগতোক্তির মতো বললো ফুল্‌মু—'ওষুধটা আর একবার লাগাতে হবে, কোদাটা সবটা কমে নি'। কর্দারু চায়ের বাটি নামিয়ে রেখে বললো,

'তুই বড় ভালো চা বানাস দিলরাজ'—

ফুল্‌মু বললো,

'আমি মাংসও খুব ভালো বানাই চাচাজী, খেয়ে দেখো'—

'মাংস,.....মাংস কোথায় পাবো?' কর্দারু বোকা বোকা মুখ ক'রে বললো।

'এখানেই পাবে। এই ঘরে বসেই আজ মাংস দিয়ে রুটি খাবে'—

'বলিস কীরে দিলরাজ? মাংস কোথায় পেলি'?

আনন্দ উত্তেজনায় কর্দারু কোমর সোজা ক'রে উঠে দাঁড়ালো। ফুল্‌মু কর্দারুর কথার জবাব না দিয়ে পর্দার দিকে চেয়ে বললো, সর্দার তুমি আবার শুয়ে পড়ো। মাংস রুটি না হওয়া পর্যন্ত তুমি শুয়ে আরো একটু বিশ্রাম করো।

[ক্রমশঃ

চলতি দুনিয়া

ইউরোপ আমেরিকার সুসভ্য অধিবাসীদের আজ জীবন যাত্রায় প্রাচুর্যের অন্ত নেই। যতদূর সম্ভব আরামে তারা বাস করতে চায়। গল্পগুজব করার জন্যে শুধু বসার ঘর হলেই তাদের চলে না, চাই সুন্দর সুন্দর বাগান, ঘাসে ছাওয়া লন, সেই সঙ্গে আরামের প্রভূত উপকরণ।

কিন্তু আজকাল কি হয়েছে ওদেশের মানুষগুলির, একটু সময় পেলেই তারা সব ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাইছে দূরে, অনেক দূরে। যেখানে শহরের কোলাহল নেই, নেই লোকালয়ের বিলাস বাহুল্য। তার বদলে রয়েছে কেবল প্রকৃতির উদার আকাশ, মুক্ত বাতাস, পাখির কূজন আর সবুজ বৃক্ষের শোভা যা কোন মানুষ কোন উদ্যানে ফুটিয়ে তুলতে পারে না।

একটু অবসর পেলেই ওরা তাই বেরিয়ে পড়ছে—মোটরে, পায়ে হেঁটে, সাইকেলযোগে। একা একা নয়—সংসারের সকলকে নিয়েই। প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর প্রাচীনতম ঐশ্বর্য আর তাকেই বিস্মৃত হয়ে কৃত্রিমতার স্বর্গ রচনা করতে চেয়েছিল মানুষ। তাদের ভুল ভেঙেছে। আজ নতুন তীর্থযাত্রীর দল যন্ত্রসর্বস্ব সভ্যতাকে পরিহার করে মুক্ত প্রকৃতির আশ্রয় প্রার্থনা করছে। —ওম্যান্।

• • • •

মানুষের আকাশ-জয়ের ইচ্ছা অনেক কালের। তাই একালের মানুষ কেবল বিমানে পরিভ্রমণ করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে যেতে চাইছে।

কিন্তু সে কেবল অত্যাধুনিক বহুবিধ যন্ত্রযোগে।

মিঃ ওয়াল্টনের ইচ্ছেটা একটু বিচিত্র ধরনের। ভেইশ বছরের এই যুবকটি চান শরীরে ডানা লাগিয়ে পাখির মতো উড়তে। তাই তাঁর নামকরণ হয়েছে বার্ডম্যান বা পক্ষীমানব।

ঘরে তৈরি এক জোড়া ডানা দেহে ধারণ করে ১০০ ফুট উঁচু ক্রিস বারো পাহাড় থেকে তিনি সত্যিই নিচের দিকে ছুটতে থাকেন প্রয়োজনীয় গতিবেগ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। বড় বড় পাখা দুটি আন্দোলিত হতে থাকে ডানার মতোই। কিন্তু উৎসাহী দর্শকদের সম্মুখে তারপরই ঘটে এক দুর্ঘটনা। ১০০ গজ যেতে না যেতেই সামনে পড়ে যায় গোরুর পাল আর তাই সামলাতে গিয়ে কাঠের ডানা যায় ভেঙে।

তাঁর আশা পূর্ণ হবে কিনা সে বিষয়ে তিনিও কিছু জানেন না। তবে শীঘ্রই আবার তিনি ওড়বার চেষ্টা করবেন। —ডেলি মিরর

• • • •

জ্ঞান-আলোয়ার পোষা মানুষের শখ। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে এই শখ শেষ পর্যন্ত উদ্ভট সব খেয়ালে পরিণত হয়। আর তার জন্যে ভোগান্তিটাও কম হয় না।

মিঃ বুথ, ইংলণ্ডের জনৈক প্রমিক, শখ করে পুষেছেন বিষাক্ত সাপ। একদিন সাপকে খাওয়াতে খাওয়াতে তিনি নিজেই সাপের ছোবল খেলেন।

তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর স্ত্রী জ্যানেটকে বলেন, আমায় সাপে কামড়েছে, এখনি হাসপাতাল যেতে হবে।

পায়ে হেঁটে বাস স্ট্যাণ্ডে গেলেন তিনি, সেখান থেকে বাসে করে গেলেন ন'মাইল দূরের হাসপাতালে।

ডাক্তার দেখলেন—মহা বিপদ। ঠিক সিরাম এখনি না পেলে ওর মৃত্যু ঘটবে।

তখন তিনি লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় ফোন করলেন।

মোটর এবং বিমানযোগে সিরাম এসে পৌঁছল।

এখন মিঃ জন বুথ আরোগ্যলাভের পথে।

কিন্তু তেষট্টি বছরের বৃদ্ধা বাড়িওয়ালী মিসেস সারা মিত্ত মহাক্যাসাদ বাধিয়েছেন এই বলে যে, তিনি কিছুতেই তাঁর বাড়িতে বিষাক্ত সাপ সহ্য করবেন না। কাউন্সিল স্বাস্থ্য বিভাগকেও তিনি এ কথা জানাবেন।

সম্ভবতঃ সাপটিকে বিদায় নিতে হবে।　　—ডেলি মিরর

• • • •

ব্রিটেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী Tamara Karsavina বলেছেন যে ব্যালে নৃত্য অত্যন্ত কঠিন শিল্প। একে আয়ত্ত করতে হলে প্রতিদিন কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে। একজন অলিম্পিক রানার যতখানি মেহনত করেন ঠিক ততখানি শ্রমসাধ্য দায়িত্ব পালন করতে হয় শিল্পীকে এবং সেই পরিমাণেই তার পুষ্টিকর খাদ্য চাই। শরীরের ভারসাম্য রক্ষা ও মাংসপেশী নিয়ন্ত্রণের জন্য শিক্ষার্থীকে বছরের পর বছর কঠিন সাধনা করে যেতে হয়। তবেই দেহে আসে ছন্দ, চলনে লালিত্য,—সমস্ত শরীর যেন পাখির মতো উড়ে যেতে চায়।　　—ডেলি মিরর

• • • •

সোভিয়েট ইউনিয়নে নিপার নদীর খাত থেকে বালি তুলে স্তূপ করা হয়েছিল। ফলে একটা উঁচু দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছিল। পর্যটকরা এর ওপর হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে, যখন তাঁরা এর ওপর দিয়ে চলেন তখন বালি যেন গান করতে থাকে। সকালে সুর যেন চড়া, আর সন্ধ্যায় তা নেমে আসে খাদে। বালিতে জল থাকার জন্যে এরকম হয়েছে। তবে একটা পরিমাণ মত জল থাকা চাই, খুব বেশি নয়, খুব কমও নয়।

স্কটল্যাণ্ডের আইল দ্বীপেও সুরেলা বালুর সন্ধান পাওয়া গেছে।　　—ইভ্‌নিং ষ্টাণ্ডার্ড

• • • •

অধ্যাপক মি. ক্রুশ্চিনোভের নেতৃত্বে কয়েকজন মস্কোর চিকিৎসক সোফিয়া শহরে একজন যুবককে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

গত ৩০শে অক্টোবর তারিখে স্লিভনিৎসা গ্রামের দোইচিন দোইচিনোভ নামে একটি যুবক সোফিয়া শহরের কাছাকাছি কোন জায়গায় কাজ করবার সময় সাংঘাতিকভাবে তড়িতাহত হয় এবং তৎক্ষণাৎ তার জীবনাবসান হয়। এর প্রায় পঁচিশ মিনিট পরে তার বন্ধু ও সহকর্মীরা তাকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে দুর্ধর্ষ সংগ্রাম করে অধ্যাপক মি. ক্রুশ্চিনোভ, ডাঃ ই. ক্রুস্তেভ, ডাঃ টি. মানোলোভা, ডাঃ এস. ফিলিপোভ্‌ এবং ডাঃ এ. তোইচোভ যুবকটির হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি ফিরিয়ে আনেন। বুকের বাঁ দিকটা চিরে অধ্যাপক ক্রুশ্চিনোভ্‌ হাত দিয়ে তালে তালে যুবকটির হৃৎপিণ্ড মালিশ করতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে পাঁচ মিনিট ধরে মালিশ করবার পর হৃৎপিণ্ডে প্রথম সংকোচনের লক্ষণ দেখা যায় এবং ক্রমশঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া নিয়মিত হয়ে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুবকটি স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে শুরু করে।

পুনর্জীবন লাভ করার পর তৃতীয় দিনে যুবকটির হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় এবং তার মুখে গোলাপী রং ফিরে আসে। মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কের প্রতিবর্তমূলক ক্রিয়াও আংশিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। রোগী এ অবস্থায় তরল পদার্থ পান করতে পারে এবং লক্ষ্য করা যায় যে তার চোখের প্রতিবর্তমূলক ক্রিয়াও ক্রমশঃ ফিরে আসছে।

মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রাপ্ত দোইচিনোভ্‌কে এখনও ডাক্তার ও নার্সদের সতর্ক তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে এবং তার চিকিৎসার জন্য সবচেয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

জাপান দেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চা ॥

অধ্যাপক অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ভাষা ও শিল্পকলা এশিয়ার নানাদেশে প্রসার লাভ করে। সেই প্রসারের ইতিহাস অতীব বিচিত্র ও কৌতূকপ্রদ। বুদ্ধদেবের অমৃতবাণীর সুমধুর রজ্জুতে এশিয়ার নানা প্রদেশ—ঐক্যের বন্ধনে বাঁধা পড়েছিল আজও তাহার বন্ধন ছিন্ন হয় নাই। সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে চীন দেশ বুদ্ধের বাণী ও বুদ্ধের মূর্তি পূজা সসম্মানে গ্রহণ করেছিল—ক্রমে চীন থেকে কোরিয়া, কোরিয়া থেকে জাপানে—বৌদ্ধধর্মের শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ মন্দিরে, মঠে ও মূর্তিতে তাহার অসংখ্য চিহ্ন রেখে গেছে,—তাহার রূপ ও আকৃতি অত্যন্ত সুন্দর এবং চিত্তগ্রাহী। এইসব বুদ্ধ পূজার অলৌকিক চাক্ষুষ নিদর্শন—এশিয়ার শিল্পকলার এক বিচিত্র ও উজ্জ্বল অধ্যায়—যাহার দর্শনীয় নিদর্শনগুলি বিশ্বের রূপরসিকদের চিত্তহরণ করেছে। ভারতের যে সব শ্রমণ ও সন্ন্যাসীরা বুদ্ধধর্মের প্রচার করেন চীনদেশে, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বোধিধর্ম—যাঁহার জনপ্রিয় চৈনিক নাম—"তামো" বা "দারুমা"। এই মহাশ্রমণের নানা প্রতিমূর্তি চিত্রে ও ভাস্কর্যে রচিত হয়েছে—চীনদেশের শিল্পীদের নিপুণ শিল্পকলায়।

জাপানের সহিত ভারতের সংস্পর্শের ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। কেবল ধর্মপ্রচারের পথ ছাড়াও অন্যপথে জাপান ভারতের সংস্পর্শ পেয়েছে।

৭৩৯ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে একজন বিদেশী একখানি ক্ষুদ্র নৌকাতে আরোহণ করে উপস্থিত হন জাপানের মিকাবো জিলার দক্ষিণ দেশের সমুদ্রকূলে। তাঁহার দেহে এক টুকরো খড়ের আচ্ছাদন ছাড়া আর কোনও পরিধান ছিল না। তাঁহার স্কন্ধে ছিল একখণ্ড নীল বর্ণের বস্ত্র, তাহাতে বাঁধা ছিল—কিছু কার্পাস তুলার বীজ। এই বীজ অবলম্বন করে জাপানে তুলার চাষ প্রথম প্রচলিত হয়। তিনি যখন জাপানের সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত হলেন তখন তাঁহার ভাষা কেহই বুঝিতে পারে নাই। ক্রমে যখন তিনি জাপানী ভাষা কিছু কিছু বলতে শিখলেন তখন প্রকাশ হল যে তিনি গিয়েছিলেন ভারতবর্ষ থেকে। তখন জাপানীরা জানতে পারল যে তাঁহার জন্মস্থান—"তেন্—জিকু"—বা ভারতবর্ষ।

কিন্তু, ভারত জাপানে কেবল মাত্র তুলার বীজই প্রেরণ করে নাই—আরও অনেক প্রকার বীজমন্ত্র প্রেরণ করেছিল তাহার ইতিহাস অতীব বিচিত্র।

জাপানে বৌদ্ধধর্মের বীজবপন করা হয়েছিল খৃষ্টীয় ছয় শতকের দ্বিতীয় পাদে। ৫৫০ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ার রাজা জাপানের রাজাকে কয়েকটি উপহার পাঠিয়েছিল তাহার মধ্যে ছিল—একটি বুদ্ধ প্রতিমা, একখানি বৌদ্ধসূত্রের পুথি, কয়েকখানি রেশমের পট। এইসব উপহারের সহিত একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন কোরিয়া দেশের রাজা—এই বাণীতে বলা হয়েছিল—যে বৌদ্ধধর্ম সকল ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠ ধর্ম—এই ধর্ম অবলম্বন করিলে জাপানের প্রজাদের প্রভূত কল্যাণ হইবে। ইহার কিছু কাল পরে জাপানের রাজকুমার শোতোকু জাপানে বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র অধ্যয়ন করিতে কয়েকজন জাপানী বিদ্যার্থীকে চীনদেশে পাঠিয়েছিলেন। তাঁহারা জাপানে ফিরে এসে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার করিলেন। নানাস্থানে বৌদ্ধমন্দির রচিত হইল এবং সেখানে পূজাপাঠ ও সাধনার জন্য অসংখ্য পুরোহিত ও ধর্মযাজক নিযুক্ত হইল।

এই ধর্মসাধনার কেন্দ্র ছিল—টোকিও শহরের নিকট নারার পবিত্র ক্ষেত্র। নারামন্দিরের প্রভাবে রাজারা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলেন এবং এই নারা যুগে (৭০৮—৭৯৪) জাপানে বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত প্রভাবশালী হইল। ইহার কিছুকাল পূর্বে ভারতের এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও ধর্মযাজক তিনি ছিলেন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ—তাঁহার নাম বোধিসেন, তিনি শুনেছিলেন—যে চীনদেশে একজন সিদ্ধপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন—তাঁহার নাম মঞ্জুশ্রী। তাঁহার সহিত মিলনের ঔৎসুক্য নিয়ে ওই দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, চীনের ইয়াং-সি-কিয়াং নদীর সমুদ্র-সংগমে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তিনি চীনে এসে শুনলেন যে মঞ্জুশ্রী চীন থেকে জাপানে চলে গেছেন। এই সময় একজন জাপানী বৌদ্ধশ্রমণ তাঁহার নাম মত্তো হিরনারী চীন রাজসভায় জাপানের দূতরূপে বাস করিতেছিলেন। তিনি বোধিসেনকে জাপানে যাইতে অনুরোধ করেন। বোধিসেন আরও কয়েকজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সহিত এক জাহাজে যাত্রা করেন।

প্রথম চিত্র

৮ই আগস্ট ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে বোধিসেন জাপানের নানিয়া জেলায় (বর্তমান নাম ওসাকা) সমুদ্রের উপকূলে জাহাজ হতে জাপানের ভূমিতে পা দিলেন। ভারতের এই প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের আগমন বার্তা শুনে—জাপানের সম্রাট শোমু নারা মন্দিরের পুরোহিত গোশিকে পাঠালেন বোধিসেনকে স্বাগত জানাইতে। গোশি ও বোধিসেন পরস্পর কথাবার্তা বলিলেন—তাদা তাদা মিশ্রিত সংস্কৃত ও জাপানী ভাষায়। বোধিসেনকে নারার সুপরিচিত দেবর মন্দিরে স্থান দেওয়া হইল। বোধিসেন এই জাপানী মন্দিরের অলৌকিক শুচি পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন এবং ভারতের গান গেয়েছিলেন। এই গান শুনে নারার নিকটস্থ বন হইতে উপস্থিত হইলেন আর এক জন বিদেশী যিনি বোধিসেনের সহিত ভারতীয় ভাষায় কথা কহিয়াছিলেন। তাহার পরে নারার সুবিখ্যাত দাইয়ান্-জি মন্দিরে বোধিসেনের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। এই মন্দিরের জাপানী পুরোহিতদের বোধিসেন সংস্কৃত ভাষা শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। বোধিসেন মহাযান শাস্ত্রের "গণ্ড-ব্যূহ-সূত্র" পড়াইতেন এবং অমিতাভ-বুদ্ধের পূজা প্রবর্তন করেন। জাপানের সম্রাট বোধিসেনকে নানা উপাধি ও সম্মানে বিভূষিত করেন।

তাঁহার একটি উপাধি হইল "সোজো" বা "গুরু পুরোহিত"। তাহার পর যখন বৈরোচন-বুদ্ধের বিরাট প্রতিমা নির্মিত হইল—সম্রাট বোধিসেনকে যথাযোগ্য অনুষ্ঠানের সহিত এই প্রতিমা—প্রতিষ্ঠিত করিতে অনুরোধ করিলেন। সেই সময় বোধিসেন জাপানে বৌদ্ধধর্মের নূতন পূজা-আরতন তোদাই-জি মন্দিরের প্রধান প্রতিষ্ঠাতার সম্মান লাভ করিলেন। বৃদ্ধ বয়সে বোধিসেন আর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন—তাহার নাম রিশো-সেন্-জি মন্দির। এই মন্দিরে তিনি অনেক শিষ্যের সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষার ফলে জাপানী অক্ষর মালা "গজুয়োন্" সংস্কৃত অক্ষরের অনুকরণে সুসজ্জিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় চিত্র

ইতিমধ্যে বৌদ্ধধর্ম ভারতের প্রবল যোগিধর্মের শিক্ষার মাধ্যমে নূতন রূপ ধারণ করিল—ইনি ছিলেন ধ্যানবাদী বেদান্ত-বাদী সাধক। তিনি বলিতেন বুদ্ধকে মন্দিরের প্রতিমায় পাওয়া যাইবে না—তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে হইবে—নিজ নিজ আত্মার মধ্যে ধ্যানের পথে। এই থেকে এক নূতন বৌদ্ধবাদ উদয় হইল তাহার নাম ধ্যানবাদী সাধনা বা জেন্ বৌদ্ধবাদ [জেন্—ধ্যান]। এই ধ্যান-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আসিল "মন্ত্রযান"—ধ্যানের পথে উপযোগী "বীজমন্ত্র" অবলম্বন করে আধ্যাত্ম-সাধনা। এই সমস্ত মন্ত্রমালা বিভিন্ন "মণ্ডল" বা নক্সার প্রকোষ্ঠে —সংস্কৃত অক্ষরে লিখিত হইত। সাধকের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি অনুসারে উপযোগী বীজমন্ত্র চয়ন করিতে হইত। জেন্‌বাদী পুরোহিতের হাতে লেখা নানা "ফলক" বা "মণ্ডল" ["জাঃ মন্ত্রার"] পাওয়া গিয়াছে—যাহাতে বীজ মন্ত্রগুলি অতি চমৎকার অক্ষরে লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছে। এইসব মন্ত্রমালার "মণ্ডল"—জেন্ সাধনার যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে জাপানের নানা জেন্‌বাদী মন্দিরে। সংস্কৃত ভাষার অক্ষর এইরূপ অপূর্ব সুষমা ও সৌন্দর্যে অলংকৃত হইয়া জাপানে যে রূপ গ্রহণ করেছে মূল ভারতবর্ষে তাহার তুলনা নাই।

জাপানে মন্ত্রযানের সাধনার চাক্ষুষ প্রধান স্বরূপ দুইখানি চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রথমচিত্র—নানা বীজমন্ত্র লিখিত একখানি মণ্ডল চিত্র। নেবারী অক্ষরের আলংকারিক রূপের সহিত জাপানের লিখিত সংস্কৃত অক্ষরের কিছু সাদৃশ্য আছে। জাপানের অক্ষর নেবারী অক্ষরের তুলনায় অধিক অলংকার-ধর্মী ও চিত্তহারী। দ্বিতীয় চিত্র—রেশমে চিত্রিত পদ্মাসনে প্রতিষ্ঠিত ওঁ-কারের চমৎকার চিত্র। পদ্ম দুইটির পাদদেশ হইল দুইমুখী বজ্র—এই বজ্র একটি প্রস্ফুটিত পদ্মকোরকের মধ্যদেশে প্রোথিত। পদ্মের মধ্যে ওঁ-কারের চিত্র বিখ্যাত ত্রিবর্তী মন্ত্র—"ওঁ মণি পদ্মে হুঁ" [মণি পদ্মের অন্তরে হুঁ-কার মন্ত্র]—এই মন্ত্রের স্মৃতি বহন করিতেছে। ধর্মসাধনার এইরূপ চিত্রে লিখিত উপকরণ জাপানের অলৌকিক চিত্রকলার অপরূপ নিদর্শন।

—এজমের ইতিহাস

উপন্যাস

সুশীল সিংহ

প্রথম যৌবন যেন তানপুরা। হাওয়া লাগলে এর তার কেঁপে ওঠে, বাজে। এর স্বভাবের মধ্যে সুর আছে।

পরিচিত মহলে অনেকের প্রথম যৌবনের নানা রঙের দিনগুলি ফুটে উঠতে দেখেছি। হরমোহন ঘোষকে যখন আলাদা করে চিনলাম তখন তার ত্রিশ চলছে। তার সঙ্গে ভালোমতো চেনা জানা হওয়ার বেড় বছর আগেও আমি জানতাম না যে ইতিপূর্বে তার বিয়ে দেওয়ার বহু চেষ্টা হয়েছে। আর তার মধ্যে দু'বার তার বিয়েটা হয়েও হয় নি। কারণ সকলেই জানে। পারবেলিয়াতে কোন একটি পরিবারের কর্তা বিয়েতে কন্যাপণ হিসেবে দুটো শূওর দিতে চেয়েছিলেন। বিয়েতে এ হেন যৌতুক কল্পনা করাও কঠিন। সকলেই আন্দাজ করেছিল যে হরমোহন এতে রাজী হবে না। কিন্তু তার সিদ্ধান্ত ছিল অন্য সকলের অনুমানের উল্টো দিকে। সে রাজী হয়েছিল। তবে পাকা দেখার দিন কনের বাপ হবু জামাই দেখে—অর্থাৎ তাকে দেখে—বাতিল করে। এ ঘটনায় সে হতাশ হয় নি। হতাশা তাকে ছুঁতে পারে না। আর তাই, এর পরও তার বিয়ে নিয়ে যৌতুকপ্রিয় উদ্যোগী পাঁচ জনের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। একদিক থেকে তার চরম হয়ে গেছে। রতিবাটি ক্যাম্পে সত্যি তার বিয়ে হয়েছিল। বাসর রাতের ভোরবেলায় হরমোহনের ঘুম ভাংলে সে স্পষ্ট দেখেছিল যে তার বউ তখনো ঘুমোচ্ছে। ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছে। তবে কিনা সন্ধ্যা বেলায় বিয়ের সময় যেটা মেয়ে ছিল, এখন দেখা যাচ্ছে সেটা মেয়ের 'ম' ও নয়। ছেলে! রতিবাটি ক্যাম্পের চৌদ্দ বছরের রিফুজী ছেলেটা পাঁচ টাকা পেয়ে মেয়ে সেজেছিল। বিয়েতেও বাধা দেয় নি। বাসর রাত সকাল হলে পাঁচ জনের সামনে দাঁড়িয়ে হরমোহন তার চিরকালের হাসি হেসে [তার সামনের পাটির দাঁত নিশ্চয়ই বার দরে পড়েছিল] বলেছিল, ধুর!

—কি ধুর?

—কি হলো কি, হরমোহন?

—আর, তোমার বউ কেমন হয়েছে?

—রাতটা কেমন কাটালে বলো।

—কিছু রসের কথা ছাড়ো বাবা।

হরমোহন রাগ করলো না, হাত পা ছুঁড়লো না, এমন কি মুখ তার পর্যন্ত করলো না। ওর দু'আনা বাইনে বাড়ার দিন যেমন হেসেছিল, অস্থায়ী চাকরীটা স্থায়ী হয়ে গেছে জেনে যে ভাবে হেসেছিল, যার সঙ্গে ওর বিয়ে হল সে মেয়েই নয় জেনে ও অবিকল তেমনিভাবে হাসতে থাকলো। সবাই ভেবেছিল রাগে ফেটে পড়বে, খাঁচড়ে কামড়ে দেবে। সে নিশ্চিন্ত মনে বিবি বিড়ি ধরালো। অন্য কোন দিকেও গেল না।

যাকে নিয়ে এই মজা সেই মূল গায়েন এমন ঠাণ্ডা হলে মজা জমে না। ওকে খাতিরে তোলার চেষ্টায় একজন ফুট কাটলো, হরমোহনের বউ কিন্তু বে হয়েছে বাপু!

—হ্যাঁ হে, বউ নাকি বদলে গেছে?

এই 'বদলে গেছে' কথাটা শুনে হরমোহনের চোখ দুটো নাকি চক্‌চকে হয়েছিল।

—আহ্ হা বদলেছে মানে?

গলা বাড়াল আর একজন।

—বদলেছে।

—বলি হ্যাঁরে হরমোহন, ভালো করে দেখেছিলি তো?

—ওকি আর কাঁচা হে! নাকি বলো—

—ওর বউর নাকি পরে দাড়ি গজাত।

—বউর দাড়ি?

খুব জোরে টিন বাজাতে শুরু করেছিল ওরা। হাতিবাটি ক্যাম্প থেকে নিমচা ওরা টিন বাজাতে বাজাতে এসেছিল দল বেঁধে, পায়ে হেঁটে। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা, হরমোহনও ওদের সঙ্গে চললো। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো যেন যাকে নিয়ে ওরা এ'যেন কৌতুক গড়ে তুলেছিল তাকে যেন ওরা ঘটনাস্থলেই ফেলে এসেছে। সে লোক যে সঙ্গে চলেছে, তা কে বলবে? টিনের বাজনা, কোমর দুলিয়ে নাচ ইত্যাদি কেমন তাৎপর্যহীন হয়ে গেল।

গোড়াতেই বলেছি যে হরমোহনের সঙ্গে আমার যখন আলাপ তখন তার প্রথম যৌবন কোন্ দেশান্তরে চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে। তার যৌবন—যৌবন? কোন দিন কি সে যৌবন পেয়েছে?

নির্বিকার হরমোহন। নির্লিপ্ত। তাই বলে নিস্পৃহ নয়। যে কোন অবস্থায় যে কোন ঘটনায় তার কোন বিকারের বিন্দুমাত্র আমি দেখি নি। এর চেয়েও বিস্ময়কর তার নির্লিপ্ততা। কারখানার কাজের ফাঁকে ফাঁকে দিনের পর দিন খুব কাছে থেকে তাকে আমি দেখেছি। তাকে দেখতে দেখতে আমার প্রায়ই আমাদের স্কুলের এক সহপাঠীকে মনে পড়ে। মনে আছে ক্লাসের সবাই তার নাম দিয়েছিল: 'খল্লী'। খল্লীনাথের ইতিহাসের পিছনে অবশ্যের কোন বৈশিষ্ট্য বা কোন ঘটনা ছিল কিনা আমার মনে নেই,এমনকি তার আসল নামটাও ভুলে গেছি। শুধু মনে আছে সেই সহপাঠীর ওপর অনেক ছেলে অকারণে বড় নিষ্ঠুর ছিল। খল্লী কোন কোন দিন কাঁদতো। চেঁচাত, লাফাতো, হেডমাস্টার মশাইকে বলে দিত, বাড়ি থেকে আবার চিঠি পর্যন্ত এনেছিল। তারপর একদিন আড়াল থেকে তাক্ করে কার যেন মাথায় ইঁট মেরেছিল। ফার্স্ট ক্লাশে খল্লী তাই স্বাভাবিক ভাবেই বলে দিয়ে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই ইঁট মারতে পেরেছিল বলেই।

ভাবছি, বছর মধ্যে থেকেও হরমোহনের এই একেবারে আলাদা একা একা, তার এই চিরকেলে খল্লীর দশা ঘুচবে কবে? কবে ঘুচবে তার এই নির্বাসন? বিয়ে হলে?

আমার মনে হয় হরমোহন সেই জাতের লোক—একবার দেখলেই যে ফুরিয়ে যায় না। তার মধ্যে যে অবশ্য কিছু দেখবার আছে এ কথাটা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু চোখে যার পড়ে দেখে দেখে তার আর ফুরোয় না। বার বার দেখতে হয়। বহুদিন দেখতে হয়। ইচ্ছে হয়, সকলকে ডেকে হরমোহনের গল্প শোনাই। এই শতকের মুখোমুখি দাঁড়ানো যায় এমন যদি কোন যন্ত্র থাকত, তাহলে তার ওপর তাকে একবার দাঁড় করাতাম। আর কিছু নয়। সে তার নিজস্ব ভঙ্গীতে একবার মাত্র হাসতো। বলা যায় না, হয়তো বা কস্ করে একটা বিড়িও ধরিয়ে ফেলতো। ঠিক তখনই ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ না কেউ ডেকে উঠতো, ধারা সিং।

—হো হারা সিং।

হরমোহন আবার হাসতো। অনেকেই তাকে হারা সিং বলে ডাকে। যারুন বলা যায় তারা, তাকে এই নামে ডেকে।

বস্তুতঃ হারা সিং মস্ত পালোয়ান। পৃথিবী জানে সেই নাম। মাথায় ছ'ফুট সে। পেল্লায় তার ছাতি। ওজন কয়েক মণ।

আর হরমোহন?

বলছি। মাথায় বড় জোর চার ফুট দু' ইঞ্চি। পাতলা চুলে সিঁথির বালাই নেই। ওর পকেটে সব সময়েই যে লাল চিরুনিটা থাকে তা দিয়ে ওলটানো চুল আর একবার উলটে নেয়। ছোট্ট মানুষ। হাত, পা, মুখ সবই আনানসই ছোট। বড় কেবল দু'হাতের নখ। নখগুলি ময়লা। মুখের গড়নটা পেয়ারার মতো লম্বাটে। থুতনির দিকটা ছুঁচলো। চোয়াল আবডাঙা। ওপরের পাটির সামনের কয়েকটা দাঁত বড় বড়। হাসলে পর যার হবেই হবে। আর কথায় কথায় হরমোহন হাসবেই হাসবে। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে যাবে, বার হয়ে আসবে দাঁত। দাঁতগুলো হলদেটে। হাসিটা চোখ থেকে ছড়িয়ে যাবে দাঁতে। যাবেই। মুখের গড়নের তুলনায় বেমানান বড় কান দুটো তখন চোখে পড়ে। মনে হয়, হয়তো ওগুলো এখুনি নিজের থেকে পাখা করার মতো দুলে উঠবে।

সারা মুখে দাড়ি গোঁফ খুঁজে নিলে তবে দেখা যায়। গোঁফের অংশে একজন বছর ষোলোর ছেলের মতো মসীচ্ছন্ন ভাব। হরমোহন যখন কোন কোন দিন সেটাকে সেলুনে বসে কামিয়ে ফেলে তখন কিছুদিন খোঁচা খোঁচা, তারপর হপ্তা দুই তিন পরে আবার সেই বছর ষোলোর অবস্থা। দাড়ি বলতে থুতনির কাছে কিছু আছে। সেগুলির প্রত্যেকটিকে আলাদা করে বাছা যায়।

হরমোহনের সঙ্গে কাজ করে যজ্ঞেশ্বর কামার। দু'জনেই সুইপার। যারা কাচ কাটে তাদের ক্যালেট (collet) বীন উপচে উঠলে, হাতের বুরুশে করে ওদের সাফ করতে হয়। আর সব সময় সে সব বীন যেন উপচেই আছে। যজ্ঞেশ্বরের দৃঢ় ধারণা যে হরমোহনের মতো ফাঁকিবাজ আর নেই। একবার সে খইনি ভাগ করবার সময় 'দেখি দেখি তোর মুখে কি লেগেছে' বলে হরমোহনের একটা দাড়ি গোড়াশুদ্ধ তুলে দিয়েছিল। দাড়ি তুলে দিয়েছে বলে ছৈ চৈ করবে হরমোহন তেমন লোকই নয়। যজ্ঞেশ্বর নিজেই পকমুখে কথাটা রাষ্ট্র করে দিয়েছে।

হরমোহনের বয়স যদি ছত্রিশ, যজ্ঞেশ্বর তবে নিঃসন্দেহে বাহান্ন। দু'জনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান এক যুগেরও বেশি। তা হোক। ওরা দু'জনেই কাজুয়ার। আর তাই দু'জনের মধ্যে সব সময়েই এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতা আছে। হরমোহন বলে যে যজ্ঞেশ্বরের মুখ ভরা গোঁফই সার। ওর মাথায় বুদ্ধি বলতে কিছু নেই। সব গোবর।

আর যজ্ঞেশ্বর রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে হরমোহনের মুখের ওপর বলে, কাজ যা করার প্রায় সবটাই সে করে। হরমোহন ফাঁকি দিয়ে হারাবের পয়লা খায়।

কথা শুনে হরমোহন তার হাসিটি হাসে। যেন যজ্ঞেশ্বর নিতান্ত অবোধ শিশু, না জেনে কি বলেছে। হাসি দিয়ে ক্ষমা করা গেল। যজ্ঞেশ্বরই যেন হারাল।

যজ্ঞেশ্বরের জীবনের কথাও কৌতুককর, সভা জগতকে শোনানোর মতো। তার বিস্তারিত বিবরণ থাক। তবে যজ্ঞেশ্বর কামারের জীবনের সেই সব ঘটনার দুই একটা না জানলে হরমোহন ঘোষের এ জন্মের ইতিহাস ঠিক ঠিক জানা হয় না।

ব্রজেশ্বরকে দেখলেই বোঝা যায় যে এককালে তার চেহারা দশাসই ছিল। সে একদিন অন্তর সন্ধ্যাবেলায় সিকি বোতল দেশী মদ খায়। তাই তার মেজাজটা ছিলে, বেশ একটা ফুরফুরে ভাব। লোকটা তার অবস্থার তুলনায় বেশ পৌখিন। বাটার জুতো জোড়া পুরানো বটে, দু'চারটে তালিও আছে, তবে ঝকঝকে। পরনে হ্যাক প্যাণ্ট, হাফ শার্ট। পরিষ্কার, কামানো মুখ। ছাঁটা, চওড়া গোঁফ। মাথায় কাঁচা পাকা চুলে সিঁথি। হাঁটে বুক চিতিয়ে। কণ্ঠস্বর সামান্য ভাঙা। কথা বলে একটু হেঁকে। বিনয় আছে, অথচ সব মিলিয়ে হরমোহনের তুলনায় বেশ একটা 'হাম হায়' ভাব। জনশ্রুতি এই যে হরমোহনের হারা সিং নামটা ওরই দেওয়া।

ব্রজেশ্বরের কাছ থেকে কোন কাজ নিতে হলে বলতে হয়, "আরে তুমি আর ও! কাজের কিছু জানে ও। কিস্‌সু জানে না। তোমার কি দায়িত্ব জ্ঞান! সে সব ওর আছে? হেঃ, তোমার কত 'এসপিরিন্'—

এসপিরিন্, মানে 'এক্সপেরিয়েন্স'। অভিজ্ঞতা।

আর বলতে হয় না। গদগদ হয়ে ব্রজেশ্বর তখন বলে,—তবে বলিয়ে হুজুর!

—তুমি যদি বলো

—কা?

—তুমি বললে, তুমি যদি চাও, ওর চাকরি এখুনি চলে যেতে পারে। তা জানো?

পরম বৈষ্ণবের সামনে জীবহত্যার প্রস্তাব করলে সে যেমন চমকে ওঠে, তেমনি ভাবে চোখ দুটো প্রায় বুজে ব্রজেশ্বর বলে ওঠে, ছোড় দিজিয়ে সাব। গরীব কা রোটি মত ছিনিয়ে। হুম্ সমঝা লেগা।

আর দেখতে হয় না। সে একাই তিনজনের কাজ করে যেত।

নিজেকে নিয়ে ব্রজেশ্বরের অহংকার হলো তার 'এসপিরিন্' অনেক। সে রেলে ফিটারের কাজ করতো। আজ সাত বছর ধরে কাচ কারখানার 'ওয়ার হাউসে' (Ware House) সে ভাঙা টুকরা কাচ সাফ করছে, ঘাঁটি দিচ্ছে, ময়দানের মতো বিরাট সিমেন্টের মেঝেয় সকাল বিকেলে ঝাঁকরি দিয়ে জল ছিটিয়ে ধুলো মারছে। আসলে কিন্তু ও রেলের ফিটার। গত সাত বছরে সে বারো চোদ্দ বার সে তার রেলের কাগজপত্র নিয়ে এসেছে, একে ওকে দেখিয়েছে। আমিতো দেখেছি। তার বিশ্বাস, এ অধর্ম চলবে না। রেল তাকে আবার ডেকে নেবে। নিতেই হবে ডেকে, মালিক ভগবান যে আছে মাথার ওপর।

হরমোহন বলে হেসে, কাজ করেছিস না কচু। কাজ করলে তোকে তাগায়? তোর মাথায় গোবরও নেই। আছে এইটা—

এই বলে নিজের বুড়ো আঙুলটা ব্রজেশ্বরকে দেখায়।

দু'জনের কথা বলার ধরণ একেবারে উলটো। ব্রজেশ্বর কথা বলে হেঁকে। আর হরমোহন যেন হাঁপিয়ে ওঠে। মনে হয় সে যেন কঠিন কোন অসুখ থেকে উঠেছে অথবা শারীরিক কোন যন্ত্রণাকে চেপে কোন রকমে কথা বলছে। তার কথার ভঙ্গী বীর, একথা বললে ঠিক বলা হয় না। দু'বছর একটানা তাকে দেখছি। দু'বছর কারো অসুখ থেকে ওঠার অবস্থা থাকতে পারে না। বুঝেছি এটাই ওর কথার ধরণ। আসলে পৃথিবীতে হরমোহনের কোন শত্রু নেই। বন্ধু নেই। একটা বিশেষ ক্ষেত্রে ওকে নিয়ে অনেকে আছে। অনেকের তাই নানাধরনের রকম ফের। চেহারায় কণ্ঠস্বরে হাসিতে বিড়িধরানোয়—সব অবস্থাতেই হরমোহন এক।

ওর নিজের মতো করে বলা কথায়, বুড়ো আঙুল দেখানোর আর তারপর সেই হাসিতে ব্রজেশ্বরের গা জ্বলে যায়। গদগদ্ করে ডাকে, 'হড়মোহন'—

—কি হয়েছে কি! ঠিকই তো বলেছি। না হলে তোকে রেল কুম্পানী তাগাবে কেন? তবে কি তুই চুরি করেছিলি?

কথা হচ্ছিল দু'জনের মধ্যে। অথচ যজ্ঞেশ্বর নাকি রেলে কাজ করার সময় বল্টু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল, এ কথাটা রটনা হয়ে গেছে। রটনা করেছে হরমোহন। যজ্ঞেশ্বর ওর নাম দিয়েছে: ধারা সিং। ঠিক না। এই রটনা তারই বদলা।

প্রায় সাত আট বছর আগে রেলে যজ্ঞেশ্বরের চাকরি দশ বছর পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় কোন্ সূত্রে সেটা ঠিক জানে না ও, ওর তিনমাস ছুটি হয়ে গেল। ছুটি না ছুটি। ছুটি থেকে ফিরে তাকে আর কাজ করতে হল না। বাবুদের কথামতো সে তিন চারটে ছাপান ইংরেজী লেখা কাগজের ওপর সে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের টিপছাপ লাগালো। সাতশো টাকা পেল।

ব্যাস! হয়ে গেল। তার নাকি রিটায়ার হয়ে গেছে।

ব্যাপারটা বুঝতে যজ্ঞেশ্বরের লাগলো আরো ছ'মাস। সে ছিল কিটার খালাসী। আর একজন এই নামের লোক ছিল, সেও কিটার খালাসী। সেই লোকটার অবসর নেওয়ার কথা। কিন্তু বাবুদের টাকা খাইয়ে সে তার কাজ বজায় রাখলে। আর ও গেল বাদ। রেলের বাবুরা চোর। তার কিছুই করবার নেই।

হরমোহন বলে, কারুর বউ কেড়ে নিলে তার কি কোন ইজ্জত থাকে?

কোম্পানীকে 'কুম্পানী', ইজ্জতকে 'ইজ্জৎ' বলে হরমোহন।

যজ্ঞেশ্বর হাসে, তোকে তো কেউ মেয়েই দেয় না। তুই তার কি বুঝবি?

—আর চাকরি কেড়ে নিলে ইজ্জত বাড়ে? কি রে খুড়া?

প্রায়ই যজ্ঞেশ্বরকে খুড়া ডাকে হরমোহন।

খুড়া একথার উত্তর দেয় না। হরমোহন বিড়ি ধরায়। সারা দিনে আঠাশ থেকে আটত্রিশটা বিড়ি খায় ও।

॥ দুই ॥

"শিবের কথায় যেমন নন্দী ভৃঙ্গীর কথা আসে, হরমোহনের জীবন-চরিতে সেইভাবে যজ্ঞেশ্বরের কথা না এসে যায় না", এই বলে বন্ধুবর গল্প শোনাতে শোনাতে সকলের দিকে চাইলেন। বললেন, "ভোলা মহেশ্বরের বিয়ে করতে যাওয়ার প্রসঙ্গে রবি ঠাকুর কি লিখেছেন মনে আছে তো? লিখেছেন—

যবে বিবাহে চলিলা ত্রিলোচন
তার কত শত ছিল আয়োজন।
তার লটপট করে বাঘছাল
তার ডমরু ডমরু বাজে গাল
তার বৃষ রহি রহি গরজে
তত ভূজঙ্গ ফণা তরজে—

ষাঁড়টির পর্যন্ত উল্লেখ করতে কবি ছাড়েন নি। হরমোহনের বিয়ের গল্প শোনাবো কথা দিয়েছি। তার আগে সাধ মিটিয়ে বর আর তার সাজ-পাজর বর্ণনা করতে দাও। অধৈর্য হয়ো না।

শ্রোতাদের একজন বললো, তবে ব্যাপারটা কি জানো? আভাসে মনে হচ্ছে ভারতবর্ষে সত্যিকার সমাজতন্ত্র আমার মতো তোমার গল্পের বিয়েটাও অনেক দূর। চট্ করে একজন নায়িকার আমদানী করে ফেলো না বাবা।

চরিত্রকার বন্ধুবর বললেন, তার মানে তুমি উনুকের কারবার বানাতে বলছো?

একজন—সেটা কি রকম?

অন্যজন—উনি চমৎকার লেখেন।

—আরে আমিও তো তাই বলছি। লিখতে আরম্ভ করলেন যেন, 'ভাবছি মেহারির কথা লিখব। কিন্তু সে কথা লিখতে গেলেই তেঁতুলাদির কথা চলে আসবে। তেঁতুলাদির নামেই ভিতরে ভেতরটা টক্ টক্ লাগছে। অথচ তেঁতুলাদির কথা, লিখতে হলে তার আগে ইমলি কল্যাণের সেই নার্স মহিলাটির কথা লিখতে হয়।.....' গল্পের সুরুতেই এই সব পড়ে পাঠকের মনে হয়েছে, 'ইস্। এতগুলো মেয়ে!' পাতাকলে ইঁদুরের মত পাঠক জমে গেছে। সত্যি, ওঁর ষ্টাইলটা বেশ। যা ইচ্ছে তাই লেখার ব্যাপারে ওঁর তুলনা হয় না।

একজন সিগারেটের প্যাকেট বার করে সকলকে দিয়ে বলল, শান্ত হও। পরচর্চা ছাড়। তারপর চালাও—

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘরটার মধ্যে অবিলম্বে আদর্শ পরিবেশ গড়ে উঠল।

অতিক্রান্ত হরমোহনের বিচার প্রসঙ্গে আমার কথা দিয়ে চরিত্রকার আবার সুরু করলেন—

আমরা যখন সূর্যের দিকে তাকাই তখন ডান হাতের আঙুলগুলো একত্র করে, হাতের পাতা সামান্য ভাঁজ করার মত করে কপালের উপর রাখি। হরমোহনের সেলাম করার ভঙ্গীটা হুবহু সেই রকম। যেন ওর চোখের সামনে তেমন কিছু এসে গেছে। চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার মত অবস্থা। বাধ্য হয়ে তাকাতেও হচ্ছে। এর নাম সেলাম।

সেদিন শ্রাবণ মাসের সকালবেলা আকাশ উপুড় করা বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টি। বৃষ্টি ঝম্‌ঝম্ করে বাজনা হচ্ছে ধারাপাতের। থেকে থেকে গুরু গুরু করে মেঘ ডেকে উঠছে। খল্ খল্ করে জল ছুটেছে নালি দিয়ে। ওপরের ছাদ থেকে বিপুল তোড়ে জল গড়িয়ে নামছে। বৃষ্টির দিকে চেয়ে চেয়ে কি দেখার ছিল কে জানে। সে বৃষ্টি দেখছিল। এক থেকে দুনম্বর ওএর হাউসে যাবার যে ঢাকা সরু পথ তারই পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল সে। অদূরে যে নতুন শেড তৈরী হচ্ছিল বৃষ্টির দাপটে কিছুক্ষণ তার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। তিনটি কাদিন ওই কোণায় দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কল্‌বল্ করছে। হরমোহন আদি বৃষ্টি দেখার নামে আড়চোখে ওই তিনটি টগর, সোনা, বুধ্‌নিকে দেখত, তাহলে কোন কথা ছিল না। সে বৃষ্টি দেখছিল।

এই সময় ডিপার্টমেন্টাল বড় সাহেব মিঃ ব্র্যাড্‌লে সেইখানটায় এলেন। ছ'ফুটেরও বেশী লম্বা, লালচে রং সাহেব। হরমোহন তাঁর চোখেও পড়ল না। তিনটি কাদিনকে চোখের সামনে দেখে তাঁর মুখ শিব বন্ধ হয়ে গেল। তিনিও মিনিট দুয়েকের মত বৃষ্টিতে চোখ রাখলেন। ধরা পড়ে যাবার ভয়ে হরমোহন গুটি গুটি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ান সাহেবের ঠিক পিছনটিতে। তার তুলনায় সাহেব যেন পাঁচিল। সাহেবের মাথা ভিজিবে, শরীরের পাশ বেয়ে বৃষ্টি তার গায়ে লাগতে পেল না। এ হেন অভিজ্ঞতায় মহা খুসী হয়ে সে কাদিন তিনটির দিকে চেয়ে তার সেই হাসি হাসল।

সাহেব দেখে তারা যদিও বা চুপ করে ছিল, হি হি করে হাসিতে ভেঙে পড়ল এখন। হাসির ঘমকে

তিনটি দেহ দুলে দুলে উঠছে। শরীরে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য নাচানাচি করছে। বৃষ্টির বাজনা বাজছে। সাহেবের চোখ থেমে গেল। হয়তো বা আধমিনিট। যেন গায়ে কিছু লেগেছে এই ভাবে পিছন ফিরে চাইতেই ব্র্যাডলে সাহেব দেখলো হরমোহনকে। ততক্ষণে সে সাহেবকে সেলাম করে ফেলেছে। এবং হেসেছে। হাসিটা যথারীতি চোখ থেকে ছড়িয়ে গেছে দাঁতে।

অবাধমিহি চাওয়া দূরের কথা। সাহেবও ফিরে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে তারই ভঙ্গীতে কপালে হাত ঠেকিয়ে ভাঙা ভাঙা ভাবে বললে, সেলাম।

সাহেব চলে গেল। বৃষ্টির যাদু লেগেছে তার চলনে।

ছুটি হয়ে গেল। বৃষ্টির বেগটা কমেছে। ঝির ঝির করে ঝরছে এখনো। মেঘে মেঘে চারদিক ঝাপসা, আঁধার হয়ে আছে। ব্রেক কার্ড পাঞ্চ করে কারখানা গেটের বাইরে এসে দাঁড়াল হরমোহন। রাস্তার ওপর সার সার চা খাবারের দোকান। দুটো মুদিখানা, সেলুন, মন্দির দোকান, ওপাশে। তেলাভাজি চালায় অনেকে। পাঞ্জাবী আর সিন্ধীর চা-খাবারের দোকানে ঘর মুখো ভীড়টা তাড়া তাড়া হয়ে ছটলা হয়ে পাকিয়ে তুলেছে। গরম চায়ের সধুম পেয়ালা, পকৌড়ি আর রেডিওতে 'মেরা দিলমে আনা রে' তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

বর্ষাকালের বৃষ্টিতে গা বাঁচে না। তবু অনেকে সে চেষ্টাতেই ক্রত কদমে হাঁটছে। যারা ছাতা এনেছে তারা তো আপাততঃ নিশ্চিন্ত। হরমোহনের ছাতার বালাই নেই। বৃষ্টি থেকে বাঁচবার কোন চেষ্টাও নেই। তার নিজের কণ্ঠস্বরের মত চিমে তালে সে এগিয়ে চলল।

রাস্তার এধিকে বসে প্রকাশ্যে একজন একটা মুরগী কাটছে। তারই আয়োজন চলেছে। বাদলা দিন। গরম গরম মুরগীর মাংস পাঞ্জাবীর দোকানে পড়তে পাবে না। হোটেলের লোকটা একাই কাটবে। কারো সাহায্য নেবে না। লোকটার পাগড়ীটা ঢিলে হয়ে গেছে। মুরগীটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

হরমোহন দাঁড়িয়ে গেল।

মুরগীটা দু'খণ্ড হয়ে গেছে। পাইপে আচমকা ফুটো হয়ে গেলে যেমন জল বার হয়, তেমনি ভাবে ওর গলা থেকে রক্ত বার হয়ে আসতে চাইছে। লোকটা বুড়ো আঙুলে করে সেই মুখটা চেপে ধরেছে। কাটা মুরগীটা এখনো ঝাপটাচ্ছে। লোকটার হাতে রক্ত লেগে গেছে। মুণ্ডুটা হাঁ করে পড়ে আছে।

—কত করে প্লেট হে ?

হরমোহন তার নিজস্ব ভঙ্গীতে জানতে চাইল।

লোকটা উত্তর দিল না।

—চার আনায় পাওয়া যাবে ?

—কা ?

—সন্ধ্যে বেলায় আসব। চার আনায় রেখে দিও, এই বলে হরমোহন হাসল।

লোকটা বলল, কা হাত ক্যালাতা হায় ?

হেসেই বলল, রাগ কেন করছ হায় ? মানুষের ইচ্ছে তো হায়। বুঝলে ? পাঁচজনকে দিয়ে একটুকরো আর ঝোল একটু ফেলে রেখে দিও। এই চার আনার। ঠিক তো ?

লোকটা যেন কান করলো না।

হরমোহন এগিয়ে গেলে পিছন থেকে ডাকল, এই !

ওটি ওটি ফিরে এলো সে। —কি ?

পাঞ্জাবী হিন্দীতে বাঙলা মিশিয়ে লোকটা জানতে চাইল, কবে পাওনা টাকা শোধ করবি ?

তিলমাত্র উদ্বিগ্ন না হয়ে সে পাল্টা প্রশ্ন করল , কত পাবে কত ?

—সাড়ে ছ। কতবার বলতে হবে ?

—ও ! হোব, হোব।

মুরগী আর ছুরি নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে লোকটা বলল, সামনের হপ্তা পেয়ে যদি না দিবি, তবে সুদ ধরব টাকায় এক আনা করে।

—ইঃ

—কা ?

—বেশ, বেশ। টাকা না দিলে সুদ হোব। আর আমি যে কথাটা বললাম—

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে দাঁড়াল লোকটা।

—একটুকরো রেখে দিও। চার আনার মত। কেমন ? হেঃ—

ইতিমধ্যে সেই কামিন তিনজন—টগর, সোনা আর বুধনি—তাকে পিছনে রেখে এগিয়ে গেছে। ওদের ধরে ফেলার জন্তে সে যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি হাঁটার চেষ্টা করল। একটু আগে রাস্তার একপাশে ওরা দাঁড়িয়ে গেছে। কাছাকাছি আসতে সে-ও দেখতে পেল যে রাস্তার ওপর পিচের সঙ্গে একটা কুকুর পিষ্টে গেছে।

তাকে দেখে নিজেদের মধ্যে চলাচলি করে উঠল কামিনী তিনটে।

—আ মলো। চলানির কি হয়েছে রে ?

তারা তিনজনে তাকে গ্রাহ্যই করল না। হাতে হাত দিয়ে হাঁটা দিল।

—একটা কুকুর মরেছে। আর ওরা এ ওর পায়ে চলছে। সাধে বলে মেয়েমানুষ, সে বিড়বিড় করল নিজের মনে।

সামনে এগিয়ে যাওয়া তিনজনের একজন চলতে চলতে থেমে রাস্তায় ঝুঁকে একটা নতুন এক পয়সা তুলে নিলে। হাত থেকে পড়ে গেছে কিম্বা পড়েছিল। মাঝে একটা ফুটো করে নিলেই নাকের নথনা হবে।

সেই ঝুঁকে নেমে আসা স্ত্রী মূর্তির দিকে চেয়ে একটা বিড়ির জন্তে পকেটে হাত দিয়ে সে টের পেলো যে বিড়ি ফুরিয়ে গেছে।

॥ তিন ॥

রাস্তা পার হল হরমোহন।

সামনে পূজারী বাবার বাড়ী। বাঁ পাশে রেলের লেভেল ক্রসিং। এর বাঁ দিয়ে ছাইকেলা মাটির রাস্তা। রাস্তার মাটি তুলে বিস্তী কাদা হয়ে গেছে। পায়ের ছোপ। পা ডুবে যায়। হরমোহনের কেডসের অর্ধেক গেল ডুবে। লাল মোজায় লাগল ছিটে।

মিনিট সাতেকের পথ। তারপর বার বার কোয়ার্টার।

মোট নটা ব্লক। সাত ব্লক ব্যাচেলার্স কোয়ার্টার্স। দু' ব্লক ফ্যামিলি।

ব্যাচেলার্সরা পায় একটা ঘরের আধখানা। একটা ব্লকে পনেরো খানা ঘর। হিসেব মত প্রতি ব্লকে ত্রিশ জন কুমারের আস্তানা। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে দু পাঁচজনকে তাড়িয়ে হরমোহন ঘোষের সহোদর দাদা মণীন্দ্র ঘোষ একটা পুরো ঘর নিজের দখলে এনে ফেলেছে। নিজেদের মধ্যে আপোষ বন্দোবস্ত আর কি।

ঘরটি লম্বা হাত বারো আর চওড়ায় হাত দশেক হবে। সামনে সওয়া দুহাত চওড়া বারান্দা। নানা কাঠের জোড়াতালি দিয়ে অনেকেই সে বারান্দা ঘিরে নিয়েছে। মণীন্দ্র ঘোষের ওভার টাইম, বোনাস ইত্যাদি মিলিয়ে উপার্জন কোন মাসেই দেড়শো টাকার কম নয়। কিন্তু তার পাঁচটি ছেলে। সে আর তার স্ত্রী। মোট ছটা প্রাণী। আবার তার স্ত্রীর সন্তান হবে। প্রতি দেড় বছর তার বৌ বাচ্চা বিয়োয়। কামাই নেই। চাকরী করে হরমোহনও তার দাদার সংসারে এক হাঁড়িতে ছিল। রাত্রে ঘুমোত বেরা বারান্দায়। গতকাল রাত থেকে মণীন্দ্র তাকে জবাব দিয়ে দিয়েছে। অন্যত্র তাকে জায়গা খুঁজে নিতে বলেছে।

হরমোহন দুঃখ করে দু'একজনকে বলেছে, মায়ের পেটের দাদা আমার। এই বিচার করল।

মণীন্দ্র বলেছে, আমি ছেলে বউ নিয়ে ঘর করি। ওর খাওয়া যে কি পরিমাণ তাতো পাঁচজনে জানে। নিত্যি ওই পুকুর তলানো আমার কর্ম নয়। তাইএর উপার্জনে আমার কাজ নেই।

তা সত্যি। খাওয়া বটে। অনেকেই দেখেছে। পেটে পুকুর না থাক, কিছু একটা আছে। না হলে ওই শরীরে অত খাবার যায় কোথায়? কারখানা ক্যান্টিনে সকাল বেলায় পাঁচ আনায় ভাত, তরকারী, ডাল পাওয়া যায়। একটুকরো মাছও থাকে। কাঁচা পিঁয়াজ বা কাগজি আধখানা থাকে। যার যেমন পেট সে তেমন খায়। হরমোহন বসে আগে, ওঠে শেষের দিকে। কিছু না হোক, তিনজন প্রমাণ মানুষের ভাত ও একলা মেরে দিতে পারে। পেটে বোধ হয় কৃমী আছে।

—কৃমী কিমি নয় গো, পেটে খাবার গত্তি আছে। গত্তি, বলে মণীন্দ্র ঘোষের বউ, হরমোহনের বৌদি।

একবার এই খাওয়া নিয়ে পাঁচজনে পরামর্শ করে হরমোহনকে বাজীতে হারিয়েছিল। সবাই বলেছিল পাল্লাবীর দোকানে চারপ্লেট ভাত মাংস সে কিছুতেই খেতে পারবে না।

—পারবো।

—কখ্খনো না।

—মাংস থাকলে খুব পারব।

—বেশ তাহলে হয়ে যাক আজ দুপুর বেলায়।

হরমোহন হেসে বলে, হোক।

—দশ টাকা বাজী।

—ও, বড্ড বেশি।

—তবে?

—যে হারবে সে খাবারের দাম দেবে, হরমোহন বললে।

চারপ্লেট ভাত মাংসের দাম হয় ছটাকা। ওরা লুকিয়ে পাঞ্জাবীকে বলেছিল যে চারপ্লেটে যেন ছ'প্লেট পরিমাণ ভাত দেওয়া হয়। মোট দাম তাহলে সাড়ে ছ'টাকা। ভাতের পরিমাণে এই কারচুপি হরমোহন জানতো না। জেনেছিল পরে—দাম শুনে। খেতে বসে চতুর্থ প্লেটটা সে আর শেষ করতে পারলো না। ফেরে গেল। সেই থেকে পাঞ্জীর কাছে ধার হয়ে গেছে। রাস্তায় দেখা হলেই ব্যাটা তেড়ে আসে।

গতকাল রাত্রে সে ভাই ধাবার কাছে কথাটা তুলেছিল। বলেছিল, সামনের হপ্তায় আমার সাতটা টাকা লাগবে।

—পাস তো বারো টাকা। আমার কাছে থাকো কেন?

—তা কি করবো। আদিতো এখনো টেম্পোরারী।

—তুই চেষ্টা করিস? কাউকে বলেছিস?

—ফত বাবুকে তো বলেছি সি, এল, (C. L.) করে দিতে। তাহলে মজুরীটা বাড়ে আর বোনাসও পাই।

মণীন্দ্র ঘোষ তখন আমানি আর নুন দিয়ে মাখা ভাতের গোরাসটি মুখে পুরে দিয়েছে।

হরমোহন বলল, সব বাবু বলে যে আমার সি, এল, হবে না।

—কেন?

—বলে আমার ওজন কম, মোট ছাব্বিশ সের। মেডিকেলে আমি ফেল হয়ে যাব, এই বলে হরমোহন হাসল।

—হাসছিস? রাস্কেলা, হাসতে লজ্জা করে না?

হরমোহন নির্বিকার ভাবে বলল, বৌদি চারটি ভাত দাও আরো।

মণীন্দ্র ঘোষের রাগ তখন তাকে ভেতরে ভেতরে কাঁপিয়ে তুলেছে। বলল, তোর ওজন ছাব্বিশ সের, তা জগৎ সুদ্ধ লোক জানল কি করে?

—ওরা সব বলছে।

—ওরা কারা?

—সেদিন সবাই মিলে আমায় ওজন করলো না?

ঘটনাটা মণীন্দ্রও জানে। সেদিন পাঞ্জাবীর দোকানে খাওয়ার পর সবাই মিলে হরমোহনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল মিসিরজীর চাল ডালের দোকানে। কি হবে না, হরমোহনের ওজন হবে। মিসিরজীর দোকানের দাঁড়ি পাল্লা দাঁড়ান। তাতে মণ মণ জিনিষ ওজন হয়। তাতে হরমোহন গিয়ে দাঁড়াল। ওজন হলো ছাব্বিশ সের, এক পো, তিন ছটাক।

দাঁড়িপাল্লা থেকে নেমে হরমোহন বলল, ও শেঠ পাথর নেই তো?

সেই ওজন নেওয়ার কথা উঠতেই মণীন্দ্র আর নিজেকে সামলাতে পারল না। তার মুখের আগল রইল না। বলল, ওজন নিয়েছিস? সঙ্ সাজতে গেছিস?

ঠিক তখনই হরমোহনের বৌদি মোটা চালের একথালা ভাত তার থালায় ঢেলে দিয়ে বলল, আর নেই গো। চেয়ে যেন লোক হাসিও না।

মণীন্দ্র ঘোষ তখন নিজের থালা উল্টে দিয়ে চেঁচাচ্ছে, ঘর, পালা ঘুর ঘর।

আর তার বৌদি বলছে, খাওনা গো। তোমার সেই থিয়েটারের দিদিমণির কাছে থাকো না আবার।

এ'সব কাল রাত্রের ঘটনা। কাল রাতটুকুও হরমোহন তার দাদার বারান্দায় কাটিয়েছে।

॥ চার ॥

বাড়ীর কাছে খানিকক্ষণ ঘুর ঘুর করল হরমোহন। এখুনি ঘরে গিয়ে বসতে পারলে আর এক গ্লাস চা পেলে সে বাঁচে। পা দুটো হরদুর করে ঢুকে পড়তে চায় অথচ সরছে না। কারখানা থেকে যারা এসেছে তারা চলে গেছে কাল।

কল পায়খানার ব্যবস্থা বেশ। দোতলা। নীচে পুরুষদের খোলা স্নান ঘর। পনেরোটা কলে পনেরোজন স্নান করতে পারে। জল প্রচুর। ওপর তলায় ঢাকা বারান্দা আর লাগান আটটি পায়খানা। দুটি মেয়েদের।

ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা আর ধরছে না। কোন কোন বাড়ীতে সন্ধ ধরানো উনুনের ধোঁয়া পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওপর দিকে উঠছে।

অবশেষে ঢুকল।

বারান্দায় এখনো কোলের বছর দেড়েকের ছেলেটা হেগেছে। সেই ময়লার ওপর বসে হাতে করে মুত থাপড়াচ্ছে। কতকগুলি মাছি ভন্ ভন্ করছে ওর চারপাশে। ছেলেটার মুখে চোখে পরমানন্দ। কোমরে কালো কারে মাদুলি দুলছে। তাকে দেখে হাত বাড়াল ছেলেটা। ডাকল, কা—

আরো কটা ছুটে এসে তাকে ঘিরে চেঁচাতে লাগল। কাকা। কাকা।

—দাঁড়া দাঁড়া, বলে তাদের থামিয়ে হরমোহন কোলের ছেলেটাকে তুলে নিল। তার মনটায় তখন কিছু আশার সঞ্চার হয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ না ধুয়ে দাঁতে কিছু না কেটেই বার হয়েছিল। অন্যদিন ছোলা, মুড়ি, চা খেয়ে যায়। আজ সে সব পাওয়ার ভরসা করেনি। দুপুরে ক্যান্টিনে পেটে দিয়েছে। মনে মনে ভয় ছিল যে বারান্দায় পা দেওয়া মাত্র বৌদি রণমূর্তিতে তাকে দূর করে দেবে। দাদা অবশ্য এখন ওভার টাইম করছে। বাড়ী আসে নি।

কোলের ছেলেটা তুলে নিয়ে তার ময়লা পরিষ্কার করে দিয়ে, মুছিয়ে তাকে মেঝেয় বসিয়ে দিল। এসব কাজ করা তার খুব অভ্যাস আছে। তারপর ঘরে ঢুকে দাদার যেখানে বিড়ি থাকে সেখান থেকে একটা বিড়ি নিয়ে এসে উনুনের কয়লায় ধরিয়ে চুপ করে বসলো।

ঠিক তখনই বাইরে থেকে ঘরে এলো বৌদি।

হরমোহন তো অন্য কিছু জানে না। শুধু হাসতে জানে। হাসল।

মণীন্দ্র ঘোষের বৌয়ের মুখখানা যেন হলদে পানা হয়ে গেছে। চোখের কোল কুঁচকে যেখা যাবে সেখানটা দাদা দোপাটির মত ফ্যাকাসে। কিন্তু তার স্বামী চোখে হাত দিয়ে তার শরীর বুঝতে চাইবে তেমন ভাগ্য সে করেনি।

—হাসলে যে।

—একটু চা খাও না।

—এই, এই জন্যে তোমার দাদা আমায় বিশেষ করে না। ঘরে কালসাপ গো। বাড়ীর মানুষ বাড়ী নেই। ভাসুরের চোকে চোকে চেয়ে সোমত্ত দেওরের হাসি?

—যাঃ

—যাঃ? দাঁড়াও ডাকছি পাঁচজন মানুষকে। তারা এসে তোমার হাসি দেখুক। সাক্ষী থাকুক তারা। আমি বারে বারে ভাতারের মার খাবো

নরীন্দ্র ঘোষ তার স্ত্রীকে মোটেই বিশ্বাস করে না। হরমোহন জানে তার দাদা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ছেলেগুলোর মত মাঝে মাঝে তার বৌদিকেও পেটায়। একবার দাদাকে ঠেকাতে গিয়ে সে দাদার ঠেলায় নিজেই উল্টে গিয়েছিল। কপালে কালশিটে পড়েছিল তার। হরমোহন জানে, যে হপ্তায় নিদ্যি ওস্তারটাইম খাকে, সে সপ্তাহে দু'একদিন তার দাদা পাঞ্জাবী কিম্বা সিল্কীর দোকানে দু'চার চোক মেরে নেয়। জলখাবারের মত মনের দাম খাতায় লেখা থাকে। হপ্তা পেলে শোধ দেয়। ওভারটাইম তো। দাদার আজও ওভারটাইম আছে। রাত্রি বারো এসে না জানি কি হবে যায় আজ।

—বৌদি চেঁচামেচি করো না। শোন—

—কি? আমায় আবার বুঝোন হচ্ছে? না, আমি ডাকবো পাঁচজনকে।

—মহা ফ্যাসাদ তো! যাও ডাকোগে তবে, এই বলে হরমোহন খুব রেগে সজোরে একটা তম্বী করতে চাইল। কিন্তু সেটা দাঁড়াল না।

—ঘুরে আশুন, আবার দাঁত দেখানো হচ্ছে।

হরমোহনের হাতের বিড়িটা নিভে গিয়েছিল। সে ক্লান্ত হয়েছিল। তার খিদে পেয়েছিল। একটু হাত পা ধুয়ে একটু চা পেলে সে বর্তে যেত। তার চোখে, মুখে কোন ভাবটাই বোধহয় ঠিক ঠিক ফোটে না। রাগ, অনুরাগ, অসহায়তা, কোনটাই না। যদি ফুটত, তাহলে কি আর তার মুখের দিকে চেয়ে ছেলেপুলের মা বৌদির একটু দয়া হতো না?

ছেলেপুলের মা। এই পর্যন্তই। মায়ের মন কইগো তোমার। বছর বিয়ানী গাই তুমি একটি, দাদার কথাটা মনে মনে ভাবল হরমোহন। মুখে কিছু বলল না। কিসে বলে।

কি বলবে না জেনে শেষ চেষ্টা করার মত ডাকল, বৌদি।

কোন উত্তর না দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল বৌদি। যদি পারত মাটি সাড়িয়ে হেঁটে যেত সে। তার বৌদির পা ফেলার কোন জোর নেই। যেন সোনার পা। একটু হড়কে গেলেই টালমাটাল হয়ে উঠবে। তবু তেজ সেখানে খুব।

তেজের তখনো সবটুকু দেখেনি হরমোহন।

একটা পোঁটলা যেন ছমড়ি খেয়ে এসে পড়ল তার সামনে। সন্দেহ নেই যে এটি তারই সম্পত্তি। —'ও', এই বলে সেটিকে তুলে নিয়ে যেখানে ধুলো লেগেছে সেখানের ধুলো ঝাড়ল। ঝেড়ে আবার রেখে দিল সেখানেই।

বারান্দায়—বারান্দার প্রসঙ্গ বলা যেতে পারত—স্বল্পতম পরিসরে তারা কেউ কোন কথা বলছে না। না হরমোহন। না তার বৌদি। না ওই কুচোগুলো। পর পর তিনবার বিড়িটানার চেষ্টা করে একটা কিছু কাজ করতে হয়েছে। তা-ও আগুন নেই। হরমোহন হয়তো চেয়েই বসতো, একটু আগুন দাওনা বেদি। তারপর যাচ্ছি।

কিন্তু তার আগেই বড় ভাইপোটা গুটি গুটি এগিয়ে এসে তার হাত ধরে টানাটানি আরম্ভ করলে। বড় ভাইপো—কতই বা বয়স হবে? বছর ছয়—? চোখে মুখে একটা গোঁ। কাকাকে ভিতরের দিকে টানছে।

কোথা দিয়ে কি যে হয়ে গেল। কোলের উপরের বাচ্চাটা চিল চীৎকার করে কেঁদে উঠল। চোখ মুখ নীল হয়ে গেছে। বৌদি তার গলাটা টিপে ধরেছে।

বাচ্চাটা যখন কোঁ-ও-ও-ও—করে আর কোন শব্দ করতে পারল না, যখন শুকনো হিক্কার মতো মুখ বিকৃত করল ও তারপর যখন আবার কাঁদতে পারল তখন হরমোহন শুধু বলল, আচ্ছা।

তার কথাটা কেউ শুনতে পেলনা। তখন চারদিকে ব্যাপার দেখে অন্য কুচোগুলোও একযোগে কান্না আরম্ভ করে দিয়েছে। হরমোহন চলে যাওয়ার আগে তার বৌদি সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমি তাড়াচ্ছি না গো তোমায়। তোমার দাদা। এই যে সব দেখাচ্ছে তোমার দাদা দিয়েছে। পেটে ধরেছি। আবার ধরছি। ধরবো। আর তোমায় যে তাড়ালুম, তা-ও তোমার দাদা বলেছে, তাই। বলতো ঠাকুরপো, আমি কি সতী নই?

গৃহস্থ ঘরের বৌকি পাগলা হয়? বলা নেই, কওয়া নেই, অমনি হুট করে খারাপ হয়ে গেল? বৌদি কাঁদছে কেন তবে? বাচ্চাটাকে মারছে বলে না আমায় তাড়াচ্ছে বলে?

চারদিকে বাচ্চাগুলো কাঁদছে। বৌদির মুখ চোখ অন্যরকম দেখাচ্ছে। কিছু না বললেও চলত। শুধু যেন বাইরে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে; একটু পরে ফিরবে, এইভাবে কোনদিকে না চেয়ে 'চলিরে' বলে হরমোহন বার হয়ে পড়ল।

॥ পাঁচ ॥

বার হয়ে পড়ল বটে, কিন্তু যাবে কোথায়? কারখানা আর বাড়ী। বাড়ী আর কারখানা। এইতো তার রাগ। সিনেমায় তার রুচি নেই। থিয়েটার সে বোঝেনা। তবে হাঁ, একবার থিয়েটারের সূত্র ধরেই সে একজায়গায় গিয়েছিল। পাঁচ কাণের কাছে বলতে নেই—সে জায়গাটা খারাপ।

থিয়েটারের সেই ঘিঘিঘিঘির কাছেই আজ একবার যাবে নাকি? একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।

মেঘে মেঘে আকাশ আঁধার হয়ে আছে। বেলা পড়ে এলো। ছিপছিপে, ঝিরঝিরে, কখনো বা ইলশে গুঁড়ি ধরণের বৃষ্টিটা একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। মনে আছে যেন অনন্তকাল আগে এই বৃষ্টিটা সুরু হয়েছিল। যেন সেই থেকে দিন রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে এ-বৃষ্টিটাও আছে।

কোয়াটার পাড়ায় হরমোহন এদিক ওদিক ঘুরল। সবাই কত সহজে সময় কাটায়। তাসের আড্ডা বসিয়েছে কেউ। মুড়ি মেখে চা খেয়ে ঘড়ির খাটিয়ায় লম্বা হয়েছে কেউ। খেলছে, শুয়েছে গল্প করছে, হাসাহাসি করছে, গান করার নামে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে ঘরে ঘরে।

ঠুক ঠুক করে হেঁটে হরমোহন রাস্তায় এলো। তার সময় আর কাটেনা। বিড়ি খাওয়া তার চলেনা। একবেলা ভাত না খাও, কোনরকম করে চালাতেই হবে। কিন্তু বিড়ি? ওরে বাবা—

অথচ বুদ্ধি করে দাদার জায়গা থেকে কটা বিড়ি সে তুলেও আনেনি। উপায়?

রাস্তার পাশে প্রথম দোকানটার মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। মাঝে মাঝে এখান থেকেও যে সওদা করে।

—যে এক বাণ্ডিল বিড়ি যে।

—গান্ধিজী মার্কা?

—না না, নতুন সুতো।

এই কথাটা বলে হাসার কিছু ছিল না। তবু সে হাসল। এই বিশ্রী হাসি বুঝি এর রোগ। যথারীতি হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল চোখ থেকে দাঁতে। আর আশ্চর্য! হাসিটা তার কি কেউ সহ্য করতে পারে

না? সকলেরই কি গা জ্বলে যায়? বিড়িওয়ালাও চোখে মুখে স্পষ্ট বিরক্তি দেখাল। তারপর এক বাণ্ডিল সবুজ সুতো বাড়িয়ে বলল, নে।

বিড়ির বাণ্ডিল নিয়ে হরমোহন বলল, সালাই একটা।

দেশলাই এলো। তাই নিয়ে বিড়ি মৌজ করে হরমোহন সেখানে দাঁড়িয়ে বিড়ি ধরাল। বেশি টানায় খানিকটা ঘন ধোঁয়া মুখ দিয়ে নাকদিয়ে ছিটকে, উদ্গারের মত বার হয়ে এলো। চোখে ধোঁয়া লাগায় চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে গেল। যেন দেখতে পাচ্ছে না কিছুই, এমনি ভাবে হাতড়ে পথ চলার মত পা বাড়াতেই পিছন থেকে হ্যাঁচকা টানে থেঁকিয়ে উঠল দোকানদার। বলল, এই পয়সা?

—দোব। দোব।

'দোব দোব,' ভেঙচে উঠলো দোকানদার বেহায়ী উচ্চারণের জড়তা মেশানো বাঙলায়।

—কখন দিবি?

—হপ্তা শেষে।

এই কথা শুনে দোকানদার তার নিজস্ব মেহাতী হিন্দীতে যা জানাল তার কিছু ছোট ছোট বাঙলা করে যা দাঁড়ায় তা অনেকটা এই রকম—

যদি হপ্তা শেষে পয়সা না দেয় তাহলে সে হরমোহনকে ও তার বাপ চৌদ্দপুরুষকে নির্ঘাত কিছু করে বসবে। এমনকি তার বাকে-ও ছেড়ে কথা কইবে না।

মা তুলে কথা বললে ঠাণ্ডা মানুষ-ও খেপে ওঠে। হরমোহন শুধু বিড় বিড় করে বলল,

ও যে তোর রসলা
বলি সাবান দেনা॥

রামপ্রসাদের অনুকরণে স্বরচিত ছড়া হরমোহনের। তা বুঝল দোকানদার। বলল—কা?

'হপ্তা শেষে' বলায় এত রেগে ওঠার কিছু কারণ আছে দোকানদারের। বিড়ির জন্য মাঝে মাঝে বাকী রাখতেই হয় হরমোহনকে। তার আশ্চর্য স্বভাব আর অভ্যাস এই যে বাকী রাখার দরকার হলেই সে এই দোকানটাতে আসে। আর যখন নগদ কোন তখন গিয়ে হাজির হয় ওই মোড়ের দোকানে। দাঁত বার করে হাসে। ঠুন করে পয়সা দেয়।

কেন?

ও দোকানদারের ডাগর মেয়েটা থাকে দোকানে। খদ্দের এঁটে যায়। ধার করতে 'ইনফ্লুয়েন্স'—মানে, মানে যাবে।

ওই দোকানদারের মেয়ে আছে সত্যি। সে মেয়েকে মাঝে মাঝে দোকানের পাশে দেখা যায় এ-ও সত্যি। কিন্তু তাই বলেই হরমোহন ওখান থেকে নগদ নেয়, এ কথা সে নিজে বিশ্বাস করে না। আসলে পকেট ফাঁকা থাকলে পা যেন আর চলতে চায় না। সবচেয়ে কাছের এই দোকানটায় নেয় ধারে। তাছাড়া —তাছাড়া? থিয়েটারের সেই দিদিমনিকে দেখার পর মেয়ে আর চোখে লাগে না। ওঃ। সেতো আকাশের চাঁদ। মাঝে মাঝে মনে মনে সেই চাঁদ দেখার তার বাসনা হয়। আর যেন খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ইচ্ছে হলেই বা কি? যাবে না হরমোহন। গিয়ে বলবে কি? কোথায় সে কারখানার এক বাদুয়ার। আর সে থিয়েটারের দিদিমণি। রামোচন্দর। গতকাল তার বৌদি খোঁচা দিয়ে বলেছে, 'যাওনা গো। তোমার সেই থিয়েটারের দিদিমণির কাছে গিয়ে থাকোগে না'। বলুক বৌদি

ছিল বটে হরমোহন। দশ দিন। দশ দিন? যেন বিশ্বাস হয় না। মনে হয় যেন এক দিন। দশ দিন মিলিয়ে এক। সেই একটি দিনের পরতে পরতে অনেক নিভৃত, নিঃশব্দ আকুল আর্তনাদের ইতিহাস মুক হয়ে আছে।……বিয়েটারের দিদিমণির কথা মনে হলেই সে যে নিজে ঝাড়ুদার এই কথাটা তার বিশেষ করে মনে পড়ে।

হরমোহনকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দোকানদারটা তখন নতুন করে বিক্রী সুরু করেছে। বিশেষ ভাবে যে দোকানের সে নমুনা নেয়, সেই দোকান মেয়ে ইত্যাদি মিলিয়ে এক রামায়ণ আরম্ভ করেছে সে। দোকানদারটা বোঝে না 'হপ্তা রোজ' হোর বললেই কি কি বার ঠিক দেওয়া যায়? বিড়ির পয়সা আসে কোথা থেকে? দু' এক হপ্তা দেরী হলেই তো পারে বাপু।

ওপরের কথাগুলো নিজের মনে আউড়ে সে প্রকাশ্যে বলল, কাহে গাল মন্দ করতা হ্যায়?

সে যেন ধমক দিতে চাইছে।

—তব কা করে গা? সওগাত করে গা তেরা?

এই বলে সে আবার বিশ্রী গালি দিল।

—সে জন্যেই তো বোলতা হ্যায়, হরমোহন বলে চলল,—যে মুখ দিয়ে গাল দেতা হ্যায়, ওই জিবমে অনেক ময়লা হ্যায়। ধোয়া সাবুন লাগাও। না হলে চিত্রগুপ্ত সব লিখে নেতা হ্যায়।

এই বলে সে আর দাঁড়াল না। অন্য কেউ হলে, এই কথার পর চলে যাওয়ার ভঙ্গী দেখে মনে হত, আসর মাত করে যার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আগেই বলেছি তার চলনে চলনে কোন ভঙ্গীই ঠিক ঠিক ফোটে না। উপরন্তু এবারও সে হেসেছিল। সে হাসি দোকানদারের চোখে পড়েনি। হরমোহন ক'পা এগিয়ে যাওয়ার পর সে শুধু বলল, শা—ল—!

পাঞ্জাবীর দোকানের কাছাকাছি আসতে দেখে আবার মুরগী কাটছে লোকটা। একটা কাটা পড়ে আছে। ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন মাথাটা তখনো থেকে থেকে শেষ খাবি খাচ্ছে। ছুরির প্যাঁচে আর একটা কাটা হলো। জায়গাটার ভেজা ঘাসের ওপর কালচে ছোপ ছোপ রক্ত লেগে রয়েছে। পালক ছিটিয়ে আছে এখানে ওখানে।

হরমোহন লোকটার পিছন দিকে একেবারে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। পেট চিরে ছাল ছাড়ানোর সময় লোকটার কনুই লাগল তার হাঁটুতে। লোকটা একবার চেয়ে আবার তার নিজের কাজে মন দিল। তার দাঁড়িয়ে থাকাটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। বরং বলল, হট।

যেন কোন জানোয়ার তার নোলা বার করেছে। তাকে বলল, হট্।

হরমোহন তার পাশে উবু হয়ে বসল। বলল, ওই যে একটু আগে একটা কাটলে সেটা কি সেব দো গিয়া হ্যায়?

লোকটার পিছু পিছু সে-ও দোকানে এলো। কারখানা ছুটি হওয়ার পর যে ভীড়টা হয়েছিল তার তুলনায় দোকান একটু পাতলা হয়েছে ঠিকই, তবে যারা আছে তারা যেন জমে গেছে।

দুটো উনুনে গন্ গন্ করছে আঁচ। এখানে ওখানে নীলাভে দু'চারটি শিখা আগুনের সোহাগ হয়ে ফুলের মত দুলছে। পকৌড়ি, সিঙারা ইত্যাদি নানা ভাজা খাবার তিন চারটে তামার থালার ওপর খদ্দেরের পথ চেয়ে আছে। আরো ভাজা হচ্ছে।

চারদিকে খাবার আর কারো কারো হাতে সদ্য চা দেখে প্রথমটায় তার জিবে জল এসে গেল।

পেটের মধ্যে একবার কণ্ডুলী পাকিয়ে উঠল। সারাঙ্গ কণ্টকগুলো ঝনিত হলো যেন। তারপর—খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তার মাথাটা ঘুরল। রগ দুটো দপ্ দপ্ করে উঠল।

দোকানের মালিকের সামনে একটা লোক বসেছিল যেন মাটির সঙ্গে মিশে। আর পাঞ্জাবী মালিক তার বিশাল বপু মাঝে মাঝে টনকরে সেই লোকটাকে কি সব বলছিল। আসলে ধার চাইছে লোকটা।

ধার-ও সেয়ে যাবে। ধার চাইলে হরমোহন-ও পায়। কিন্তু ধারের পথ ও মাড়ায় না। এরা সব পঁচিশ টাকা দিয়ে চল্লিশ লেখায়। সেই চল্লিশ টাকার ওপর প্রতি সপ্তাহে টাকায় এক আনা করে চল্লিশ আনা সুদ চায়। মূল চায় না। সুদ না পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা জানে, কুম্পনীর অফিসাররা জানে, সবাই জানে, তবু ওরা কারবার চালায়। কেউ ওদের কিছু করে না। বলে না।

সামনে বসা সেই সঙ্কুচিত লোকটাকে আচমকা হরমোহন বলল, এই তোর আমাশা হবে।

—মানে?

—বুঝতে পারবি না। মরবি।

ততক্ষণে পাঞ্জাবী কটমটে চোখে তার দিকে তাকিয়েছে। সে চাহনির থেকে তফাতে যাওয়ার জন্য বা অন্য যে কোন কারণে সে দোকানের মধ্যে সরে এল।

দোকানটার ভেতরে হাওয়ায় ঝাঁঝাল গন্ধ ভাসছে। 'কয়টি' চলছে। ভিতরে একটা ঘুপসি ঘর আছে। সেই ঘুপসি ঘরটাকে আড়াল করা হয়েছে ঘরলায়, চেলচিট-চিটে একটা চাদর ঝুলিয়ে। পর্দা। ভেতরে মদ চলছে। মেয়ে মানুষের গলাও পাওয়া যাচ্ছে মাঝে মাঝে। একটা মেয়ে মানুষ। পুরুষ বোধহয় তিনজন। গলা শুনে তাই মনে হয়।

পাঞ্জাবীর দোকানে আজ কিছুই পড়তে পাবে না। মুরগী সব ঠেটে পুটে সাফ।

হরমোহন নিজের মনে হেসে ফেলল। হেসে সে বিড়ি ধরালো একটা।

তাকে বিড়ি ধরাতে দেখে দোকানের একজন বলল, এই, কুছ লেগা তু?

সে ফস্ করে ভেবেছিল কিছু খেয়ে নিয়ে বাকী রাখলে কেমন হয়? আগে তো খেয়ে নেওয়া যাক। তারপর পকেটে পয়সা না থাকলে বাকী না রেখে দোকানী করবে কি?

তবু সেটাতে তার মন সায় দিল না। পাঞ্জাবীর রোখ। একে তো সেই বাজীর টাকার জন্যে তার ওপর তেলে বেগুনে হয়ে আছে!

সে শুধু বলল, না।

—তো ভাগ্।

বাইরে এসে দাঁড়াল সে। আর তার আবার মনে হল একবার থিয়েটারের দিদিমণির কাছে ঘুরে আসি। আজ তার চেনা, অল্প চেনা সবাই যেন সমস্বরে এক যোগে তাকে দূর দূর করছে। যদি থিয়েটারের দিদিমণির কাছে গিয়ে দাঁড়াই তাহলে সে আর বেশি কি করবে? এদেরই কথাটা হয়তো নিজের মত করে বলবে, 'কি চাই? এখানে কেন? যাও। চলে যাও। খবরদার বলছি এখানে আর এসো না।'

তবু যাওয়া যাক। অনেকটা পথ এখান থেকে। পায়ে হেঁটে গেলে ঘেড় ঘন্টার মত।

হরমোহন হাঁটতে লাগল।

॥ ছয় ॥

থিয়েটারের দিদিমণিকে হরমোহন প্রথম দেখে গত বিশ্বকর্মা পূজার সময় কারখানার থিয়েটারের এক রিহার্সালের দিন।

থিয়েটার কারখানায় প্রতিবারই হয়। তবু সেবার যে বিশেষভাবে নাটক নিয়ে সাড়া পড়েছে তার কারণ দুটো। প্রথমতঃ যে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে তা কারখানার একজন কর্মীর লেখা। পরিচালনার দায়িত্ব তাঁরই।

কিন্তু এই যাত্র।

যে জিনিসটা রিহার্সাল জমানোর ব্যাপারে চুম্বকের মত কাজ করছে তা হল যে নাটকে নায়িকার পার্ট করবার জন্য কোন মেয়েলি ধাঁচের নটকে, গোঁফ কামিয়ে কৃত্রিম মিহি গলায়, পুরু পেইন্ট মেখে স্টেজে নামতে হবে না। সত্যিকারের মেয়ে করবে নায়িকার পার্ট। কলকাতায় এ হাওয়া অনেকদিন চলেছে। সেবার কারখানাতেও এসে লাগল। নায়িকার ভূমিকায় নারী ছাড়া সেবারের উদ্যোক্তারা অন্য কিছু ভাবতেও পারেন না।

নাটক লেখা হয়েছে সৌখিন নাট্যসম্প্রদায়ের নানা সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রেখেই। স্ত্রী চরিত্র বলতে আগাগোড়া একজন নায়িকার পার্ট। আর একজন আছেন নায়কের পিসিমা। শেষ দৃশ্যে একবার তাঁকে আসতে হবে। সেই রোলটা পুরুষে করবে। ছোট তো।

নায়িকার ভূমিকা দেওয়া হয়েছে এ শহরের এ্যামেচার সম্প্রদায়ের মঞ্চীরাণীকে। শহরে নাটুকে দল অজস্র। নায়িকার বড় অভাব। বলতে গেলে তাকে নিয়ে টানাটানি।

'সিরাজের বেগম' থেকে 'ছেঁড়া তার' 'ঘাষাও রক্তপাত' থেকে পাণ্ডুলিপির অগ্নিগর্ভ প্রতিজ্ঞা তাকে রকেটের চেয়েও তীব্র গতিবেগে পরিক্রমা করতে হয় রাতের পর রাত। মঞ্চীরাণীর অবস্থাটা পেশাদারদের চেয়েও ভয়াবহ। উৎসাহ ব্যাপকও বটে। নাটক মঞ্চস্থ করার উপলক্ষের অভাব নেই। ছাপা নাটকের অভাব নেই। পাণ্ডুলিপির অভাব তার চেয়েও কম।

মঞ্চীরাণী তাই তার মুখে একাধারে হাসি, কৃত্রিম কোপ আর বিরক্তির ভঙ্গি-ফুটিয়ে বলে, আটটা রিহার্সাল? কম করুন। প্লীজ।

প্লীজ উচ্চারণে অন্তে জেড্ (z) চলে আসে। কেননা বিদ্যার দৌড় তার সদাগরা পৃথিবী উল্টে দেওয়ার মতো।

সপ্রতিভ উদ্যোক্তা হলে বলে, আটটা রিহার্সাল তো কম বলেছি। দরকার হলে আরো খান তিনেক দিতে হবে।

—বলেন কি? এ-গা-রো-টা? আপনারা কি আমায় মেরে ফেলবেন!

এই বলে মঞ্চীরাণী চিত্রা রায় দুই এর মাঝে অর্ধবৃত্ত ভঙ্গি করে।

—বালাই ষাট। আপনি মরতে যাবেন কেন?

এই বলে উদ্যোক্তা মুখ তুলে চোখে চোখে চায়। তারপর যোগ করে, স্বার্থপরের মত বলি, আপনি মরে গেলে আমাদের চলবে কি করে?

অর্থাৎ চলার কথাটা হলো মঞ্চীরাণী চিত্রা রায় না হলে এ শহরের সৌখিন নাট্যজগতের মথুরা আঁধার।

কথাটা মিথ্যে নয় একবারে। কেবলমাত্র বয়সের যৌবন নিয়ে অভিনয়ের অপচেষ্টায় চিত্রা রায় যেন মঞ্চ থেকে মঞ্চান্তরে উড়ে বেড়াচ্ছে এমন সাহস আছে ক'জনের?

কিন্তু চিত্রা রায় সে সব কথায় আসে না। শুধু বলে, নাকি ?

—নয় ? আমাদের কথা বাদ দিন। আপনার ভক্ত সংখ্যা কত জানেন ?

—ভক্ত, না হাই।

হঠাৎ যেন সবকিছু ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার মত ভঙ্গি করে চিত্রা রায় বলে উদ্যোক্তাদের মুখের ওপর, কিন্তু অতগুলো রিহার্সাল আমার কি দরকার বলতে পারেন ?

—দরকার আপনার নয়। দরকার আমাদের। আপনি তো স্টেজে নেমেই চালাতে পারেন। সবাই তো তা পারে না। আর টীম ওয়ার্ক না হলে ড্রামা জমে না।

উদ্যোক্তাদের কথা দিয়ে এমনি প্রচ্ছন্ন স্তুতি লুকোন থাকে। স্তুতি অভিনেত্রীকে নয়, এমনকি চিত্রারায়ের অভিনয় ক্ষমতাকেও নয়। তার যে আদৌ অভিনয় করার ক্ষমতা আছে, তা-ই অনেকে স্বীকার করতে চায় না। স্তুতি এক্ষেত্রে একটা খোঁচা। সেই খোঁচায় চিত্রারায়ের আগুনটাকে খুঁচিয়ে দেওয়া। সেই কৌশলই তো তার একমাত্র পুঁজি।

—তাই বলে এ-গা-রো-টা রিহার্সাল ?

—বেশ তো আপনি কিছু টাকা না হয় আমাদের কাছে বেশি নিন।

—নাঃ, মাফ কথা বলে বলে সপ্রতিভ উদ্যোক্তা।

—দেখুন,

যেন খুব রাগ হয়েছে, যেন টাকার কথা তোলায় চিত্রার মান গিয়েছে এমন একটা ভাব করে সে বলে, আমি ঠিক শুধু টাকার জন্য অভিনয় করি না। ঠিক আছে, যতগুলো পারি ততগুলি রিহার্সালই আমি দোব।

এ-ও এক গর্ব চিত্রা রায়ের। সে টাকার জন্য অভিনয় করে না। এ'কথাটা সে কথার ছলে ঘুরিয়ে যত সব জায়গায় জাহির করে। না জানলে স্বস্তি বোধ হয় না তার। তৃপ্তি পায় না।

তাহলে অভিনয় করে কেন ? একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্র পরিবারের মেয়ে রাতের পর রাত অভিনয় করে কেন তবে ?

সোজা কথা। অভিনয়, নাটক ভালোবাসি বলে। কতলোকে কত নিন্দে করে। করুক। যারা এগিয়ে এসে সাহস করে উচিত কাজে হাত দেয়, নিন্দা তাদের প্রথম দিকে প্রাপ্য। চিত্রা রায় তাই ওসব আদপে গ্রাহ্যই করে না।

চিত্রা রায় এ-সব কথা খুব জোর দিয়ে বলে। কেননা সৌখিন দলের অভিনয়ই তার আয়।

মোট কথা, যে কোন নাটকের মহড়ায় ঘন ঘন চিত্রা রায়কে আনতে হলে উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে খানিকটা সাধ্য সাধনা সে উপরি পাওনা হিসেবে আদায় করে নেয়।

নায়িকার ভূমিকায় চিত্রা রায়। কারখানার রিহার্সাল তাই খুব জমত। বসার জায়গা দেওয়া যেত না সবাইকে।

সেদিন হরমোহন গেল রিহার্সাল শুনতে। প্রথমে বাইরে থেকে উঁকি দিল। ছোট্ট মানুষ। এর ওর পায়ের ফাঁক দিয়ে কোনমতে চাইছে। কে যেন তাকে ঠেলে এগিয়ে দিল।

আর সেই মুহূর্তে অদৃশ্যলোক থেকে হরমোহনের ভাগ্যবিধাতা হরমোহনের এ জন্মের ইতিহাস সম্পূর্ণ করার জন্যে আপন মনে মুচকি হাসলেন।

এই পর্যন্ত বলে চরিতকার বন্ধুবর একবার থামলেন। থেমে নীরবে সভার সকলের মুখে একবার চাইলেন।

শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, ইউরেকা।

—কি পেয়েছিস?

—নায়িকা।

—Billy। শুনে যা।

—হরমোহনের বিয়েটা কতদূর রে?

চরিতকার বন্ধু আবার সুরু করার আগেই একজন বলল, হরমোহনকে না হয় তুই কারখানায় নিত্যি দেখছিস। কিন্তু বাপু চিত্রা রায় সম্পর্কে এতকথা তুমি জানলে কোথা থেকে?

চরিতকার বন্ধুবর হাতের দেশলাইটা বিশেষ কায়দায় নেড়ে বললেন, বঙ্কিমচন্দ্র কি বলেছেন জানিস? সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র? লেখকরা গল্পের পাত্র পাত্রীদের সব কিছু ঈশ্বরের মত অদৃশ্য থেকেও দেখতে পায়। যাক্, সে বিখ্যাত উক্তি আমি আর স্মরণ করবো না। কেবল তোদের অবগতির জন্যে জানাই যে এবার কারখানার বিয়েটারে আমিও ছিলাম। সুতরাং চিত্রা রায়কেও বহুবার কাছ থেকেই দেখেছি। কিন্তু চুলোয় যাক চিত্রা রায়। আমরা এবার হরমোহনের কথায় ফিরে আসব।

আড্ডার সমালোচক বন্ধু ছাড়ল না। সে চেপে ধরল চরিতকারকে। বলল, চিত্রা রায়কে নিয়ে এই যে দীর্ঘ ভূমিকাটা ফাঁদলে এর নিশ্চয়ই কোন তাৎপর্য আছে?

—যদি তাৎপর্য আছে ভাবলে তোমাদের সুবিধে হয়, তাহলে তাৎপর্য আছে। যদি নেই ভাবলে ভালো লাগে, তাহলে তাৎপর্য নেই। যেমন তোমাদের ইচ্ছে। শুধু আর একবার বলি, হরমোহন যখন শিল্পনের ঠ্যালায় হুমড়ি খেয়ে মহড়া কক্ষে গিয়ে পড়ল তখন মহড়া চির খেয়ে গেল এক-দেড় মিনিটের জন্য। কে যেন বলল, বোস, বোস, একপাশে যা।

এই 'একপাশে যা' কথাটা বলতে ও একপাশে যেতে যেতে যে সময়টুকু গেল তারই মধ্যে মেঘলোকের ওপরে কোন অদৃশ্যলোকে হরমোহনের ভাগ্যবিধাতা একবার মুচকি হেসে নিলেন।

॥ সাত ॥

একটা বছর আটেকের ছেলের মেলার মধ্যে খেলনার দোকানের সামনে সবেমাত্র দাঁড়িয়ে যে অবস্থা হয় হরমোহনের অবস্থাটা হল যেন সেইরকম। চিত্রা রায়ের চুলে টাসল ছিল কিনা তা বোঝা তার সাধ্য নয়। ঘোড়া বেণী, অভিনয়রত মক্ষীরাণীর সকালনের সঙ্গে সকালিত হচ্ছিল। এ একটা খেলনা। তার চড়া প্রসাধনের প্রলেপে ভরা মুখ কোন একটা অভিব্যক্তিতে জল্ জল্ করছিল। সেই মুখ আর এক খেলনা। তার সিল্কের শাড়ি, তার বাঁ হাতের কব্জে আঙুলে লম্বা নখ, নখে রং—সবই খেলনা। অদ্ভুত। মনোহারী। আস্ত একটা খেলনা ভরা মনোহারী দোকানের সামনে যেন 'থ' হয়ে গেল সে।

—হাঁ করে কি দেখছিস্?

তাকে ঠেলা দিল একজন।

—হে, হরমোহন হাসল। সেই হাসি। হাসিটা মুহূর্তেই ছড়িয়ে গেল চোখ থেকে দাঁতে।

—হাসছিস ?

—নাগর রে আমার।

কে একজন চুপি চুপি বলার চেষ্টা করে ফিস ফিসে গলায় বলল, একে বিয়ে করবি হরমোহন ? পছন্দ হয় ?

—হেঃ

সে আবার হাসল।

এই চাপা কথায় স্পষ্টই বিরক্ত হল অভিনেতা একজন। স্মারক বাঁকা চোখে তাকাল যেদিক থেকে গুঞ্জন উঠেছে সেই কোনে। অমনোযোগের জন্য পাণ্ডুলিপির পাতা পিছলে একটা ফর ফর শব্দ হল। পার্ট ছেড়ে কাঁপিয়ে উঠল নট, কথা বললে পার্ট করা যায় না।

—সত্যি। এত কথা কিসের ?

আর একজন বলল।

—কথা বলতে হয়, বাইরে গিয়ে বলো না বাপু।

ফোড়ন দিল আর একজন। সবাই যেন গলা ছেড়ে কথা বলার জন্য মুখিয়ে ছিল এতক্ষণ। সোর গোল উঠলো অচিরে।

হরমোহনের কানে কানে ফিস ফিস করে যে সব চেয়ে বেশি অসুবিধা ঘটিয়েছিল সে নির্বিকার বসে বসল, এই ধারা সিংটার জন্যে।

চিত্রা রায় অভিনয় থামিয়ে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। 'ধারা সিং' নামটা শুনে সে বোধ হয় হাসাসই চেহারার কোন বুনো ব্যক্তিত্ব অনুমান করে থাকবে। নামেরও তো একটা ওজন আছে। চিত্রা দেখল মানুষটার ওজন নামের ওজনের চেয়েও কম। মাথায় কত ছোট ? ও হরি, এ যে একটা লিলিপুট। বড় জোর চিত্রার কাঁধ পর্যন্ত হবে।

সেই প্রথম চিত্রা রায় হরমোহনের দিকে সোজা তাকাল। চোখে চোখে।

কে একজন ফুট কাটল, যেখানে যাবি, সেখানেই একটা কাণ্ড করবি বাবা ? ও বাবা ধারাসিং! আয়, তুই এদিকে এসে বোস।

ধারাসিং ওরফে হরমোহনকে নিয়ে টানাটানি করে কে কতটা লক্ষীরাণীর চোখে পড়তে পারে সবাই সেই চালাকি দেখাতে গিয়ে কে যেন হরমোহনের হাত ধরে টেনে দিল।

চিত্রা তাকে দেখছে বলে সে হেসেছিল। তাকে নিয়ে পাঁচজনে টানাটানি করছে বলে আবার হাসল। দাঁত বার করে বলল, কই, আমিতো কিছু বলি নি। শুধু শুনছিলুম—

—তা হাসবার কি আছে ?

একটা চাপা বিরক্তি যেন কেটে পড়ল নাট্য সম্পাদকের গলায়। মহড়া ঘরে তামাশা যেন তার সহ্যের সীমার শেষ পর্যায়ে পৌঁচেছে।

—ইনিও কি আপনাদের একজন অভিনেতা নাকি ?

লক্ষীরাণী জিজ্ঞাসা করল ভ্রু বেঁকিয়ে।

—না না। ও—

মুখে এসেছিল 'ও ছুইপার' কিন্তু ও ভাবে বললে উপস্থিত অন্যান্য শ্রমিকদের আত্মসম্মানে লাগতে পারে। তেমন কিছু হলে আবার অনেক গোলমাল। চাইকি থিয়েটার না হতেও পারে। আর স্ত্রী-লোকের সামনে যে কোন পুরুষের আত্মসম্মানবোধ বড় তীব্র হয়েই থাকে। যত তীব্র, তত ঠুনকো। যেন কাচের পেয়ালা। সামান্য নাড়া খেলেই ভেঙে যায়। সামলে নিয়ে ভদ্রলোক বলল, নূনা। ও কারখানায় কাজ করে। রিহার্সাল শুনতে এসেছে আর কি।

—অর্ডার, অর্ডার, বলল একজন।

নাট্য সম্পাদক এবার মিনতি মাখা গলায়, দু'চোখে ক্রোধ মেলে বলল, আপনারা হয় থামুন, আর না হলে বন্ধ করে দি।

সায়ক আবার ঝুঁকে পড়ল পাণ্ডুলিপির ওপর। সেই থেই ধরে দেবার জন্য বলল—

'অনুপম : কিন্তু সান্ত্বনা এই রক্তপলাশের কোন দোষ নেই—'

কিন্তু সায়কের অনুসরণ করে অনুপমের ভূমিকায়ও নট তার পাট বললো না। চিত্রা আবার দাঁড়িয়েছে পোজ নিয়ে।

— কি হল ? জানতে চাইল নাট্য সম্পাদক।

খুব গম্ভীর কণ্ঠে অনুপমের ভূমিকায়ও ছেলেটি বলল, আগে সকলের গপ্‌পো শেষ হোক। তার পর তো রিহার্সাল।

অনুপমের পার্ট করেছে যে সে ওরই মধ্যে সুদর্শন। সেহেতু নায়ক। টিপু সুলতানে টিপুর ভূমিকা করে ও কোথায় যেন আসর শুদ্ধ লোকের রক্তে নাড়া দিয়ে জাগিয়েছে ও কাঁদিয়েছে। মেডেল পাওয়া ছেলে। কারখানায় বই করার আগেও চিত্রার সঙ্গে সে দু'একবার মেশেছে। অতএব কাহা খুব।

সে যাই হোক, এককোণে চাপা কণ্ঠে যে কথা চলছিল এতক্ষণে সেটা থেমে গেল একেবারে। ঘড়ঘড়া শুরু হল আবার। জমেও উঠল।

নট : কেন পারোনা ? কে মনে রেখেছে তোমার অতীত ? কবে তোমার বিয়ে হয়েছিল সে খোঁজে আমার কাজ নেই। তুমি বিধবা, এই খবরটা বার বার আমার কানের কাছে দিয়ে একটা মরা মানুষের ওপর তুমি আমার মনে ঈর্ষা জাগিয়ে তুলতে চাও ?

চিত্রা : (সুদর্শন নটের খুব কাছে এগিয়ে এসে, তার হাত দুটি ধরে, ওপর দিকে মুখ তুলে মিনতি মাখা গলায়) থামো, লক্ষীটি—

নট : আমি জানি, তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে, ছিনিয়ে নিতে পারি না বলেই আমি কিছু পাইনে। ভালবাসা মাত্রই মানুষকে খানিকটা পশু করে তোলে। আমার মধ্যের সেই পশুটা কেশর ফুলিয়ে তোমার দিকে থাবা বাড়ায়নি বলেই তুমি আমার সামান্য উপহার ফিরিয়ে দিতে পারো।

(চিত্রার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইল নট। কিন্তু সান্ত্বনা বেশী চিত্রা সে হাত ছাড়ল না। আবার যেন আঁকড়ে ধরল। বলল—)

চিত্রা : ছিঃ ! ছেলেমানুষি করো না। তুমিতো সবাইকার মতো নও। তুমি যে অনেকের চেয়ে বড়ো। অনেক বড়ো তুমি। (ডায়লগ বলার সময় চিত্রা রায় অনুপমবেশী সুদর্শন নটের দু'হাত ধরে আদুরে মেয়ের মত দোলাচ্ছিল।)

আর অবাক হয়ে দেখেছে হরমোহন। শুধু দেখছে বললে ভুল বলা হয়। তার সমস্ত বোধ যেন তার দৃষ্টিতে এসে সংহত হয়েছে। কোন কিছু নিয়ে যে এত মনোযোগী হওয়া যায়, তা সে কোনদিন জানতো না। আজও সে তার নিজের মনোযোগ টের পাচ্ছিল না। অনেকক্ষণ বিড়ি খায় নি সে। এই ঘরে আসার পর বিড়ির জন্য পকেট পর্যন্ত হাতড়ায় নি।

তার সামনে একি প্রকাণ্ড কাণ্ড। একি বিস্ময়কর ব্যাপার?

চিত্রা রায়কে তার প্রথম দর্শনেই তিলোত্তমা মনে হয়েছিল। এত রূপ! এত!

সেই তিলোত্তমা এক বয়স্ক লোকের চোখের সামনে হাঁটছে, হাসছে, কথা বলছে, হাত ধরছে, পুরুষের বুকের কাছে সরে আসছে। তার বিস্ময়ের আর অন্ত নেই। সে হাঁ করে বেবাক বোকা মেরে গেছে।

(আদুরে মেয়ের মত হাত দোলাতে দোলাতে চোখের পলকে পিছন ফিরে চিত্রা রায় অনুপমের বুকের বাঁকে মিশে দাঁড়াল।) চিত্রা: অনুপম—

নট: সান্ত্বনা—

চিত্রা: যাও, ভুল যাও অনুপম—

(আবেশ লাগল চিত্রার গলায়। একটা কল্পিত ভুল যেন আলতো ভাবে অনুপম বসিয়ে দিচ্ছে সান্ত্বনার কালো কেশে।) হরমোহনের চোখ মুখ চিক্ চিক্ করছে। (মাথায় ফুল বসিয়ে দিয়ে হাতের কায়দায় আবার সান্ত্বনাকে আনল তার মুখোমুখি। হয়তো সে সান্ত্বনাকে আদর করতো। কিন্তু তার আগেই অনুপমের বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সান্ত্বনা। অনুপম তার পিঠে মোলায়েম ভাবে হাত বুলোতে বুলোতে মৃদু কণ্ঠে ডাকল—)

নট: সান্ত্বনা—

(চিত্রা যেন চুকরে কেঁদে উঠল এবার)

নট: (গভীর ভারি কণ্ঠে) সান্ত্বনা—

চিত্রা: আজ আমার নতুন জন্ম হলো অনুপম। (চোখ মুছলো চিত্রা। তারপর ধাপসা গলায় বলল—) এই মুহূর্তে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না আমার বৈধব্য। আমি, আমি যে বিধবা, এই কথাটা প্রাণভরে মনে করার জন্যে আজ তুমি আমায় ছুটি দাও অনুপম। আমার বৈধব্যের মৃত্যু, তার অন্তিমকাল আমায় দেখতে দাও। —(এই বলে ছুটে বার হতে যায় সান্ত্বনা। অনুপমের আকুল, দৃঢ় মুষ্টি তার আগেই তাকে ধরে ফেলে। আবেগে অনুপম বলে—)

নট: সান্ত্বনা, যাবে যাও। আমি তোমায় কিছু ভাবব না। কিন্তু আমি যদি অপরাধ করে থাকি, যদি ব্যথা দিয়ে থাকি তোমায়, তুমি—তুমি আমায় ক্ষমা করো।

(ছুটে আসে সান্ত্বনা। স্টেজ স্ত্রী মক্ষীরাণী এই কথায় দুই হাতে আলিঙ্গনে বাঁধে সুদর্শন নটকে। আবেগে, উত্তাপে যেন প্রথমটায় হকচকিয়ে যায় অনুপম। তারপর সেও বাহু বিস্তার করে।)

বহুত হাসল জমে উঠেছে। নায়কের কাছে নিবেদিতা নায়িকা। কিন্তু বৈধব্য মিলনের অন্তরায়। যেমন যেখানে বাঁশীর মত বেজে উঠেছে, ওই বাধা সেখানে টানছে পিছন থেকে। সেই পুরোনো কায়দা আর কি! সেই খোঁড় বড়ি খাড়া। খাড়া বড়ি খোঁড়। তবু জমেছে। লভ্ সিন। প্রাণঢালা অভিনয়ে জমিয়েছে। হরমোহনের নাকের ডগায় একটা মশা বসেছে: হুল ফুটিয়েছে। সে তা টের পায় নি। দেখছে। শুনছে।

নাটক আরো জমবে অনতিপরেই। ঘরের মধ্যে আলিঙ্গনাবদ্ধ নায়ক নায়িকা। ঠিক তখনই চৌকাঠে অকস্মাৎ এসে দাঁড়াবে সান্ধনার দেবর। তীব্র কণ্ঠে ধিক্কার দেবে, ডাকবে : বৌদি!

(দেবরের ভূমিকায় অভিনয় রত লোকটি এসে দাঁড়িয়েছে। সে ডাকবে এবার।)

কিন্তু তার আগেই মহড়া ঘরে চেঁচিয়ে উঠল হরমোহন, এই?

এমন ভাবে চেঁচাল যেন ব্যাপার দেখে তারই ভালো লাগে নি। হয় নায়ক নায়িকাকে কিম্বা দেবরকে সে ধমকে উঠেছে। তার এই ধমকে কারা যেন একসঙ্গে হি-হি করে হেসে উঠল।

মহড়ায় বাধা পড়ল আবার। বাধা পড়ল তার জন্যই।

নাট্য সম্পাদক তেড়ে এসে বললো, কি? এটা কি ইয়ার্কি মারার আড্ডা নাকি

—আমায় চিমটি কেটেছে পিছন থেকে।

নিজস্ব ভঙ্গীতে ধীরে ছেড়ে ছেড়ে কথাগুলি বলে হরমোহন হাসল। হাসিটা স্বাভাবিক চোখ থেকে ছড়িয়ে গেল দাঁতে।

সত্যি তাকে চিমটি কাটা হয়েছিল। আলিঙ্গনাবদ্ধ নায়ক নায়িকা রিহার্সাল রুমে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, ওই চিমটি বোধহয় তার অনিবার্য ফল। হরমোহনের ওপর দিয়ে গেল। কিন্তু কেউ তার কথা গ্রাহ্য করল না। বিশ্বাস করল কিনা কে জানে।

এবার চিত্রা রায় বলল, মাপ করুন। এখন আমার আর মুড্ নেই।

ধৈর্যেরও মুড় নেই যখন তখন আর জোর করা যায় না। মহড়ায় সাময়িক বিরতি হল। বিরতি ঘোষণা হবার আগেই গুন্ গুন্ শুরু হয়েছিল। এবার যেন একরাশ মাছি ভন্ ভন্ করতে লাগল। চিত্রা রায়ের চারপাশে অনেকগুলো সিগারেট একসঙ্গে জ্বলে উঠল। যেন একটা ধোঁয়ার বেড়া তৈরি করে ফেলতে চাইছে।

হরমোহন যেখানটায় ছিল, দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই। সে তার পাশের লোককে কিছু জিজ্ঞাসা করল। যাকে বলল, সে উত্তর দেওয়ার বদলে প্রথমে একচোট হেসে নিল। তারপর সবাইকে শুনিয়ে বলল, আরে হরমোহন কি বলছে শোন।

—কি বলে?

—ওকেই জিগ্যেস করো না।

—কি?

জানতে চাইল নাট্য সম্পাদক।

হরমোহন কিছু বলার আগে সেইভাবে হাসল। তারপর বিড় বিড় করে কিছু বলল। শোনা গেল না। আর পারল না নাট্য সম্পাদক। বলল, এদিকে আয়! কি বলছিস, গলা খুলে বল্।

'তুই' ডাকলো হরমোহনকে। আর কেউ নয়। সচেতন নাট্য সম্পাদক স্বয়ং।

তাতে কি হয়েছে? নির্বিকার সে। নির্লিপ্ত। চিত্রা রায়কে ঘিরে ঘটনার কাছাকাছি এসে সে বলল, বলছিলাম—উনি কি বিধবা?

কথার শেষে টক্ খাওয়ার মত জিবে একটা শব্দ করে সে যেন লজ্জা পেয়েছে এই ভাবে মাথা নামিয়ে নিল।

—কি?

চিত্রা রায়ের চোখ মুখ ফুলে উঠল। কিন্তু মুখে কোন কথা জোগাল না।

অম্লান বদনে হরমোহন বলল, উনি নিজে বললেন কিনা 'আমি বিধবা'। তাই—

যেন আরো লজ্জা পেয়েছে এই ভাবে মাথা নামিয়ে নিল।

—তোর মুণ্ডু

—ইডিয়ট্ কোথাকার।

—তোঁদারাম।

—এটা থিয়েটার। বুঝলি?

—যত সব আপদ।

—আশ্চর্য মাইরি।

চিত্রা রায়কে ঘিরে কথাগুলো গুঞ্জরিত হতে থাকল। আর তারই মাঝখানে আলস্যের ভঙ্গিতে এক হাত ডানার মত ওপর দিকে আধখানা মেলে মক্কীরাণী বলল, এক গ্লাস জল দেবেন?

কেউ হুকুম করল, জল আন্ হরমোহন।

নিজের মত ধীরে পা ফেলে হরমোহন জল নিয়ে এলো। তার হাত থেকে গ্লাস নেওয়ার সময় সামান্য যেন লেগে গেল চিত্রা রায়ের হাত। গ্লাসটা তাই হাত থেকে নামিয়ে একবার সে আঙুলটা দেখল চিত্রা। যেন যন্ত্রণা লেগেছে। তারপর জল খেয়ে গ্লাস ফিরিয়ে মক্কীরাণী বলল, ধন্যবাদ।

হরমোহনের হাসি তখন দাঁতে ছড়িয়ে গেছে। সেই অবস্থায় হাত বাড়িয়ে গ্লাস নিয়ে বলল, আজ্ঞে?

—চেষ্টা পেয়েছিল। জল দিলেন আপনি। তাই ধন্যবাদ।

উত্তরে সেলাম করল হরমোহন। সেই সেলাম। ডান হাতের আঙুল একত্র করে, হাতের পাতা সামান্য ভাঁজ করে কপালের ওপর রাখল সে। যেন ওর চোখের সামনে কিছু এসেছে, যা দেখে ওর চোখ বলসে যাওয়ার মত হচ্ছে। আবার তাকাতেও হচ্ছে।

গ্লাস রেখে দিয়ে সেদিন আর মহড়া ঘরে দাঁড়াল না হরমোহন। বাইরে হাওয়ায় এসে এতক্ষণে সে বিড়ি ধরাল।

শত রজনী অভিনয় করেছে চিত্রা রায়। শত রজনীর প্রস্তুতিতে বিভিন্ন ভাবে মহড়া ঘরে মাত্র একুশ বছরের মেয়েটা সহস্র সন্ধ্যা কাটিয়েছে। সেই হাজার সন্ধ্যার একটিতে হরমোহনের সঙ্গে এই তার প্রথম দেখা হল।

হরমোহন ফিরে চলেছে দাদার কোয়ার্টারের দিকে। একা। কাল আবার এসে হয়। এই কথাটাই চলতে চলতে নিজের মনে মনে ভাবছে সে। আর অদৃশ্যলোকে তার ভাগ্যবিধাতা একবার হো হো করে অট্টহাস্য করে নিয়েছে।

॥ আট ॥

—আমায় একটা পার্ট দেবেন বাবু?

—কি-সে-রে?

—যেটারে।

—হাসালি। দেখি। সব তো দেওয়া হয়ে গেছে।

—চাকরের পার্ট একটা দিন না।

—বটে ?

—হ্যাঁ, ভল টল আমা।

নিঃসংকোচে সবার সামনে দাঁড়িয়ে নাট্য-সম্পাদকের কাছে মনোবাসনা নিবেদন করেছিল সে।

মক্ষীরাণী সেদিনও মহড়ার উপস্থিত। সে বলল, আহা, দিন না ওকে একটা রোল। বেশ গালপাট্টা আর চওড়া গোঁফ দিয়ে দারোগার সাজাবেন। চমৎকার মানাবে।

কথা বলার শেষে চিত্রার ঠোঁটের উপর দিয়ে যেন একটা পিঁপড়ে হেঁটে গেল। হাসি চাপা দিচ্ছে সে। অবশেষে মুখ ফিরিয়ে নিল।

কেবল কৌতুক তাকে নিয়ে। কৌতুক আর কৌতুক। হাজারো।

কিন্তু হরমোহন তা বুঝল না। বোঝে না। ও সব কিছু সরল মনে বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে। ওর ছোট শরীর আর মাথার তুলনায় বেমানান বড় কান দুটো, যে দুটোর দিকে খানিক চেয়ে থাকলে হঠাৎ পাখা করার মত দুলে উঠবে বলে ভ্রম হয়। সেই দুই কানে সে উৎকর্ণ হয়ে শুনল মক্ষীরাণীর সুপারিশ। তারপর বলল, যা বলেছেন।

লুকাস সাহেবের বউ তাকে নিয়ে কৌতুক করেছিল গতবার কারখানা স্পোর্টস মাঠে।

দৌড়, ঝাঁপ, সাইকেল রেস খেলা হচ্ছে। সে গিয়েছিল সেই খেলা দেখতে। বাবুরা সব ফিটফাট হয়ে সেজে এসেছে। যারা দৌড় ঝাঁপ দেবে, তারা অনেকেই খাটো কালো প্যান্ট পরে আছে। তাদের বন্ধু বান্ধবরা সমাদর করে একটি ঝাঁঝালো তেল মাখিয়ে তাদের পা ডলে দিচ্ছে। 'ওটি কি হে' জানতে চেয়ে এক জায়গায় তাড়া খেল সে।

সে মাঠের বাইরে ঘুর ঘুর করে সব কিছু দেখছিল।

কিন্তু দৌড় ঝাঁপের খেলা, প্রতিযোগী, সাহেব, মেম, চিনে বাদাম, রং বেরংএর বেলুন, এ সব ছাড়িয়েও যা তার মনকে সবচেয়ে বেশি টানছিল তা বাবুসাহেবদের কাঁধে ঝোলান ক্যামেরা।

একটা লোহার চাকতি ক'জনে পর পর পালা করে ছুঁড়ছে। আর ক্যামেরা বাবুরা কেউ উবু হয়ে বসে, কেউ কোমরের উপরের দিকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে, কেউ বা ঠাকুর আসনে প্রণাম করার আগের মত হাঁটু মুড়ে বসে 'ক্লিক' 'ক্লিক' করে ছবি তুলছে।

আজ থিয়েটারে পার্ট চাইবার সময় যেমন, সেদিনও তেমনি মাঠে সে একজন ক্যামেরা বাবুকে বলেছিল, আমার একটা ফটোক তুলবেন ?

—ফটোক ? ও ছবি ? তোমার ?

হেসেছিল সে। হেসে বলেছিল, হ্যাঁ, একটা ফটোক।

বাবু বলেছিল, তুলতাম হরমোহন। তবে কি জানো, আমার তো বেশি ফিল্ম নেই। এই সব মেলার ছবি তুলতে হবে।

—তা বটে।

বলে আবার হেসেছিল।

কাছেই ছিল লুকাস সাহেবের বউ। মাঠের ভেতরে বাইরে যেন প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াচ্ছিল।

ক'জনে সত্যিকারের মেমসাহেব। তারা কেউ সিগারেট খাচ্ছিল। কেউ পাশের সাহেবের হাতে হাত জড়িয়ে কথা বলার সময় গায়ের ওপর পড়ে যাচ্ছিল।

লুকাস সাহেবের বউএর পরনে ছিল শর্টস আর একটা জামার মতো। পায়ে জুতো। গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ধব ধব করছে দু'খানা পা। অমনি দুধের মত খোলা দু'খানা হাত। লাল টকটকে মুখ। মাথায় চিনে বাদামের খোলার মতো রঙের ঝকঝকে চুল। ক্যামেরা ছিল লুকাস সাহেবের বউএর কাছেও। এগিয়ে এসে কি যেন বলল সেই ক্যামেরা সহ বাঙালী সাহেবকে। তাদের দু'জনের মধ্যে কি সব কথাবার্তা হলো। তারপর তার দিকে ফিরে বলেছিল সেই বাঙালী সাহেব, দাঁড়াও হরমোহন। মেমসাহেব তোমার ছবি তুলবে।

হকচকিয়ে যাওয়া ঘুরে থাক। সেখানেই গোল আর পজিশন নিয়ে দাঁড়াল সে। ক্যামেরাটা চোখে নিয়ে খানিক কি দেখে হাতের ইসারা করল মেমসাহেব। সে বুঝল না। তখন মেমসাহেব নিজেই তর তর করে এগিয়ে এসে তার হাত দুটো ধরে টেনে আরো বশ হাত তফাতে দাঁড় করিয়ে দিল।

মেমসাহেব যখন তার খুব কাছে এলো তখন তীব্র অথচ খুব মিষ্টি একটা গন্ধ নাকে এসে লাগল তার। খুব কাছ থেকে সে দেখল যে দূর থেকে যে হাত দুটো ধব ধবে দুধের মত শাদা মনে হয়েছিল সেই দুই হাত ভর্তি গোলচে তিলের মত রয়েছে। একবার ভেবেছিল সাহেবদের চুলি বোধহয় এই রকম হয়। একবার মনে হয়েছিল জামার বিয়ের পর তার বৌদি নতুন নতুন যেমন কোন কোনদিন বিকেলে গা ধুয়ে চুলের কাঁটার আগায় ফুস-ফুস দিয়ে কপালে দিত ওরা বোধহয় তেমনি হাতে অনেক ছোট ছোট কৌটা কাটে। অবশ্য সব সংশয়ের মীমাংসা করে দিয়েছিল যজ্ঞেশ্বর কাহার।

যজ্ঞেশ্বরকে সে বলেছিল, দাদ হোনেসে এমনি হোতা হ্যায়। নাকি খুড়া?

—বুড়বক্। গোরু খানেসে এইসা হোতা হ্যায়। গোরু। জয় সীতারাম। থুঃ—

লুকাস সাহেবের বউ তাকে ধরে টেনে জায়গা মত দাঁড় করানোর পর হরমোহনকে ঘিরে থাকা ভিড়টাও সরে এসে তাকে ঘিরে খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে রইল। লুকাস সাহেবের বউ ছবি তোলার যন্ত্রটা এবার নাভির কাছে ধরে মুখ নামিয়ে মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

ভিড়ের একজন বলল, সেলাম কর হরমোহন।

নিজস্ব সেলাম রচনা করল সে কপালে হাত রেখে।

—গুড মো, মো।

—সেট হিম্

বলল সেই বাঙালী সাহেব। তারপর তাকে বলল, এইভাবে থাকো। আবার নড়ো না যেন।

মেমসাহেব একটু ঝুঁকে ছবি নেবার জন্য তৈরি হয়েছে। সোজা তাকিয়ে আছে হরমোহন। দেখছে। মেমসাহেবের লালচে চুলের একটা গোছা সামনে ঝুলে দুলছে। আর—

পাঞ্জাবীর দোকানে মাখন কটি পাওয়া যায়। নতুন মাখনের টিন কাটার পর নির্ভাজ মাখন সে সেখানে দেখেছে। ছবি তোলার সময় ঝুঁকে নামা মেমসাহেবের দুই কাঁধের নীচে যেন তেমনি কিছু সে এখন দেখছে।

—ক্লিক।

—থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ স্পোর্টস।

সেই শ্বেতাঙ্গিনী সেদিন মাঠময় ঘুরে খেলার ছবি ছাড়াও নিজের তিনটে ছবি তুলেছিল। বাচ্চাদের মধ্যে একটা মস্ত ফড়িং হঠাৎ চোখে পড়েছিল তার। 'কি সুন্দর' 'কি অপূর্ব' 'কি আশ্চর্য' ইত্যাদি হাই মাই করে বলে সে সেটার ছবি নিয়েছিল। খেলার মাঠের আশেপাশের কোন গরীব সাধারণ মানুষের বছর চারেকের উলঙ্গ ছেলে চলে এসেছিল মাঠে। সেও হয়েছিল ছবির মারফতে। যেমন হরমোহনও।

হরমোহন বহুদিন মনে মনে ছুঁক ছুঁক করছে ছবিটা দেখবে বলে। কিন্তু কাকে নিয়ে যে লুকাস সাহেবের বাংলোয় যাওয়া যায়, ছবি দেখা যায় তা সে বুঝে উঠতে পারে নি। ছবির কপি পাওয়া তো দূরের কথা। তাঁর এ্যালবামে ফড়িং আর উলঙ্গ নির্বোধ ছেলের মাঝখানে তার ছবিটাও আছে। চার বছর পর এখানকার চার্য শেষ হলে সাহেব-মেমসাহেব যখন দেশে ফিরে যাবে, তখন প্রতিবেশী, বন্ধু, আত্মীয় সকলে ইণ্ডিয়ার গল্প করার সময় ছবির এ্যালবাম খুলবে। আর তখন হয়তো রক্তরঞ্জিত নখর সেলাম করা হরমোহনের পেখারা খাঁচের দাঁত বেরকরা লম্বাটে মুখের ওপর রেখে বলবে, Look there is Mr. Sports.

সেদিন মাঠে ছবি তোলার পর একজন বলিষ্ঠ হয়ে বলেছিল, এ একরকম ভালোই হলো তোর। বিয়ের কথাবার্তা হলে ছবি পাঠালেই চলবে। নে, নে, একটা বিড়ি ছাড় দেখি—

ছবি তোলা হয়েছে বলে মহা খুশী হয়ে সে বিড়ি তো দিয়েই ছিল উপরন্তু সেই লোকটাকে একটা মনের কথা বলেছিল। অবশ্য এমনি করে এহেন কথা বলতে পৃথিবীতে একমাত্র সে-ই পারে। বলেছিল, এমন জানলে—

—এমন জানলে, কি? সেজে আসতিস?

—দাড়িটা তো কামিয়ে আসতাম।

দাড়ি নেই তো আবার দাড়ি কামানো। কিন্তু সে কথা বলে কে। উপরন্তু লোকটা রসান দিয়েছিল, চুলটাও কেটে আসতাম। দিব্যি হতো তা হলে।

মোট কথা, ছবি তোলা হলেও সে ছবি সে দেখে নি। থিয়েটারে পার্ট চেয়ে মক্কীরাণীর সুপারিশ মত দারোয়ানের ভূমিকা পেয়েও মঞ্চে নামা তার ঘটে ওঠেনি। সে ভেবেছিল সে সত্যি পার্ট করবে। মেক-আপও নিয়েছিল। মক্কীরাণী জানত, নাট্য সম্পাদক জানত, পরিচালক, উদ্যোক্তাদের এ, ও, সে, সবাই জানত যে স্টেজে সে আদৌ নামবে না। একে মেক-আপ দেওয়া হবে মস্করা করার জন্যে। সবাই জানত তা। শুধু সে জানত না।

কিন্তু পৃথিবীর নাটমঞ্চে তার জন্য সেদিন সন্ধ্যায় ভূমিকা নির্দিষ্ট ছিল। মাপা রোল। বড় চড় হবার জো নেই। সে-ও দারোয়ানের পার্ট। এবার সে কথাটাই বলি।

॥ সপ্ত ॥

কারখানার কার্পণ্য নেই। স্পোর্টস বলো, নাটক বলো সব কিছুরই আয়োজন এলাহি বলা যায়। ব্যবস্থা খুব। থিয়েটারের দিন সকাল থেকে একটা গাড়ি যাচ্ছে আর আসছে। সামিয়ানা রে, ত্রিপল রে, সবই আসছে এই গাড়িতে। অঢেল পেট্রোল পুড়ছে।

থিয়েটারে পার্ট আছে বলে নাট্য-সম্পাদক ডিপার্টমেন্টাল ম্যানেজারকে বলে হরমোহনের ছুটি করিয়ে দিয়েছেন। সকাল থেকে তার ডিউটি পড়েছে অডিটোরিয়ামে। প্যাণ্ডেল, মঞ্চ তৈরি করেছে যারা, তাদের ফাইফরমাস খাটা। সিগারেট আনছে। চা আনছে। মাঝে মাঝে নিজেও ভাগ পাচ্ছে। ডিপার্টমেন্টে থাকলে যে পরিমাণ কাজ তাকে করতে হয় তার দ্বিগুণেরও বেশী কাজ সে করে যাচ্ছে পরমানন্দে। হাসিটি তার মুখে বড় ঘন ঘন দেখা যাচ্ছে। সামান্য নেশা করলে যেমন ভাব হয়, সকাল থেকে তার চাল চলন হয়ে উঠেছে যেন তেমনি।

বিকাল তিনটে আন্দাজ যখন মোটরে করে ড্রেস সেইট এসে পৌছল, তখন প্যাণ্ডেল ছেড়ে সে জমিয়ে বসল সেখানেই। থিয়েটারে সাজতে হলে মাথায় সাবান দিয়ে চুল কষু করতে হয়, এ কথাটা তাকে কেউ বলে দিয়ে থাকবে। ইতিমধ্যে তাই সে স্নান করার সময় কাপড় কাচা সাবান দিয়ে মাথাটা খুব করে ঘসেছে। মাথার চামড়া টনটন করছে। তার ওপর রোদ লাগায় মাথাটা ধরেছে। একজন ড্রেসারকে ডেকে ও বলল, কখনো প্লে করিনি তো। তাই আজ শরীরটা কেমন কেমন লাগছে।

এই বলে সে ড্রেসারকে একটা বিড়ি দিল। নাটক বলে সন্ধ্যার দিকে সে এক বাণ্ডিল বেশি কিনেছিল। বিড়িটা হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে ড্রেসারটি চোখ কুঁচকে তাকে একবার দেখল। তারপর বলল, আপনিও পার্ট করছেন নাকি ?

—হাঁ, গর্ব ভরে জানালো সে।

তারপর একটু থেমে এদিক ওদিক চেয়ে অন্তরঙ্গ গলায় বলার চেষ্টা করল, এখনো তো সব আসে নি। আপনি হাতের কাজটা একটু এগিয়ে রাখুন না ভাই।

চিত্রা রায় কথা বলার সময় হঠাৎ এই 'ভাই' শব্দটা বলে। যেন সুর দিয়ে বলে। শব্দটা কতদিন ব্যবহার করবে বলে হরমোহন ছট ফট করেছে। আজ বলল।

—কি কাজ ? জানতে চাইল ড্রেসার।

—কি আর ? আমায় সাজিয়ে দিন, তারপর নিজেই যোগ করল : হারোহান।

—এই যে আপনারা সব এসে গেছেন। যাক একটা চিন্তা গেল, এই কথা বলতে বলতে নাট্য-সম্পাদক যেন মাটি ফুঁড়ে সেখানে হাজির হলেন। ভদ্রলোক যে সারাদিন কোথায় আছেন আর কোথায় নেই তা তাঁর নিজের পক্ষেই বুঝি বলা অসম্ভব। নাট্য-সম্পাদকের উপস্থিতিতে ড্রেসার সেইটার একটু অপ্রস্তুত হবার ভঙ্গি করল।

—আপনারা চা খেয়েছেন ?

—বিড়ি দিয়েছে বাবু।

হরমোহন যাকে বিড়ি দিয়েছিল সে ছাড়া আর দু'জন মুখোমুখি চাইল।

—চা খাওয়াবি তো। যা, যা, চা নিয়ে আয়।

যেন হরমোহন থিয়েটার পার্টির কিম্বা সম্পাদকের মাইনে করা বাঁধা লোক এমনি ভাবে নির্দেশ দেওয়া হল তাকে। পা বাড়াবার আগে সে শুধু বলল, বাবু একটা কথা ছিল।

—বল্ বল্ তাড়াতাড়ি বল্।

—আমার মাইনে ?

—হবে। তা তুই বাড়ি কামিয়েছিস কোথায় রে ?

—কৌরী হতে হবে ?

—দাড়ি গোঁফ সব কামিয়ে আয়। তাই বলে মাথা কামাস নি যেন। তবে শোন, তার আগে এঁদের চা খাইয়ে দে। বুঝলি ?

চিত্রা রায় যখন গাড়ি থেকে এসে নামল তখন বেলা পাঁচটা বাজে বাজে।

গাড়ি থেকে নামল চিত্রা। যেখানে নামল সেখানে হরমোহন দাঁড়িয়ে। সে এক দৃশ্য। মেক আপ তার হয়ে গেছে। চুলগুলোকে ঘেড় দিয়ে একটা চওড়া ছোট কাপড় পাগড়ির মত করে বাঁধা। দু'দিকের ঝুলপি পর্যন্ত চওড়া গোঁফ। গোঁফের শেষ ভাগ যথাসাধ্য সূচাগ্র করে দারোয়ানী ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। দু'কানে দুই মাকড়ি। গলায় কার। কোন প্যান্টই তার মাপ মতো হয় নি। পরনে তাই নিজস্ব ধুতি। একটা খাকির কোটকে ভেতরে ভেতরে সেফটিপিন এঁটে লং কোট করে পরানো হয়েছে। পায়ে তার নিজস্ব লাল কেডস্। হাতে একটা লাঠি নিয়েছে। সেটি তার মাথা ছাড়িয়ে হাত দেড়েক উঠে গেছে।

হাওয়ায় সিল্ক ভাসিয়ে গাড়ি থেকে নেমে হাসিতে মক্কীরাণী ভেঙে পড়ে আর কি। তার আগেই হরমোহন এগিয়ে এসে চিত্রার হাত থেকে এটাচিটা নিয়ে নিল। কাজটা কেউ তাকে দেয় নি। বলেওনি করতে। সত্যি কথা বলতে কি মক্কীরাণীর এটাচি বইবার জন্য উপস্থিত অনেকগুলি হাত ভিতরে ভিতরে তৈরি ছিল। কিন্তু চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে এগিয়ে যেতে পারে নি কেউ। সে গেল সবার আগে।

কোনদিকে না চেয়ে আগে আগে চলেছে চিত্রা রায়। সোজা গ্রীন রুমে।

চারপাশে চেয়ে দারোয়ান চলছে পিছনে পিছনে। গ্রীন রুমে।

কে একজন বলল, বা—রে দারা সিং—

হরমোহন হাসল।

গ্রীনরুম গম্ গম্ করছে। কে যে কুশীলব, কে কর্মী আর কে বা কি তা বোঝার উপায় নেই। উপায় আছে ঠিকই, তবে উপায় থাকলেও কিছু করার নেই। কেন না কারখানার বিয়েটার। কোম্পানীর পয়সায় এইসব হচ্ছে। অতএব সাজ ঘরে যার খুশি, যতবার খুশি সে আসতে পারে বৈকি। আসছে। আসবে। আসবৎ।

মেজাজ রী রী করছে সম্পাদকের। কত আর বাবা, বাছা, ভাই, বন্ধু বলে ভালো কথায় ভিড় সামলানো যায়। ওর মধ্যে আবার ক'জন বিশেষ কেউ যেন সাজঘরে একটা উৎপাত না বাধিয়ে ছাড়বে না। রাগটা তার ঠোঁটের আগায় ছট্ ফট্ করছে।

—এই ! কেন ঘুর ঘুর করছিস এখানে ওখানে ? বস এক জায়গায়।

অন্য কাউকে নয়। নাট্য সম্পাদকের ধমক এসে পড়ল হরমোহনের ওপর।

আর এক ঘর লোকের সামনে ধমক খেয়ে সে সেইভাবে হাসল।

—হাসবি না। হাসি হাসি আমার ভালো লাগছে না। বোস এক জায়গায়।

যেন সে চুপ করে বসলেই সব গোলমাল শেষ হয়। আসলে মহড়া ঘরে চিত্রা রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে হরমোহনকে নিয়ে সবাই যে চালাকির প্রতিযোগিতা চালাত, এখানেও সেটা চলেছে পুরো মাত্রায়। কেউ পাগড়ি নাড়ছে, কেউ হাত দেবার চেষ্টা করছে গোঁফে, কেউবা কোটের ঝুলটা ঠিক ক' আঙুল নেমেছে তাই মাপছে।

—বেশ সং সেজেছে মাইরি। যেড়ে।

একজন বলে বসল।

চিত্রা রায়ের পেইণ্ট শেষ হয়েছে। এককোণে বসে সামনে আয়না নিয়ে কিছুটা নিজে ও কিছুটা পেইণ্টারের সাহায্যে শেষ করছে সে। পরিচালক এসে নায়িকার পেইণ্টের শেড ঠিক হয়েছে কি না আলোর বিপরীতে তাকে দাঁড় করিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। লক্ষ্মী মেয়ের মত দাঁড়িয়ে আছে চিত্রা। কোন ভেজ দেখাচ্ছে না। একবার চিবুকে, একবার নাকের আগায় আলতো করে আঙুল ছুঁইয়ে পরিচালক বলল, ঠিক আছে।

অদূরে বসে বসে দেখছিল হরমোহন। আর তার মনে হচ্ছিল চিত্রা রায়কে এখন যেন লুকাস সাহেবের বউর মত টুকটুকে লাগছে। না, তার চেয়েও সুন্দর। পরিচালক যতক্ষণ পেইণ্ট পরীক্ষা করল, হরমোহন একদৃষ্টে সেই দিকে যতক্ষণ দেখল, ততক্ষণ তার পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরে একজন দর্শক প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে শিস দিল।

নায়িকা নিরীক্ষণ হয়ে গেলে পরিচালকের কাছে এগিয়ে গিয়ে হরমোহন বলল, বাবু আমার সাজটা ঠিক হয়েছে কিনা আপনি তো দেখলেন না।

—দেখেছি তো। খুব ভালো হয়েছে।

তারপর ষ্টেনারদের একজনের দিকে ফিরে বলল, এর নাকের বাঁ পাশে একটা বড় আঁচিল বসিয়ে দিনতো।

আঁচিলটা তক্ষুনি বসিয়ে দেওয়ার জন্ত সে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করল। কিন্তু থিয়েটার কোম্পানীর লোকেদের তখন সেদিকে মন দেওয়ার একটুও অবসর ছিল না। কেন না মক্ষীরাণী স্বয়ং তখন তাদের বলল, কিগো বিধবা বলে কি এই পোশাক নাকি।

—তা ছাড়া আবার কি? শাদা থান।

—শাদা থান! মুক্তি তো, যেন ভেংচি কাটার মত বললো সে।

—তুমি কি শাদা সিল্ক পরে বিধবা সাজবে নাকি?

হরমোহন স্পষ্ট শুনল চিত্রা রায়কে 'তুমি' বলল ওই লোকটা। প্রায় প্রতি মকেই তো ওদের দেখা। তবু ষ্টেনারটাও ওকে 'তুমি' বলে? আশ্চর্য।

—তা সাজবো না কেন? বিধবারা কি সিল্ক পরে না?

অনেকটা তার বৌদির মত গলায় আর ভঙ্গিতে চিত্রা রায় বলল, আ মর!

শাদা থান হাতে নিয়ে নাট্য-সম্পাদকের উদ্দেশ্যে চিত্রা রায় বলল, ও মুখার্জি বাবু, আমায় কি একদম লোকের সামনে কাপড় ছাড়তে হবে নাকি? কোন ব্যবস্থাই তো দেখছি না তাই আপনাদের—

—আছে, আছে। ব্যবস্থা আছে।

—কই দেখছি না তো! ঝিপল ঘেরা গ্রীনরুমে পুরুষ মানুষের চলতে পারে, আমি চালাই কি করে? তাই তো আপনাদের বলেছিলাম সিনেমা হল ভাড়া নিয়ে করুন, কোন ঝামেলা নেই।

—ঝামেলা এখানেও নেই। আসুন এদিকে।

গ্রীনরুমের ঘেরা যেখানে শেষ, সেখানে এক দরজা। সেই দরজার কাছে মক্ষীরাণীকে নিয়ে গিয়ে

সম্পাদক বলল, দরজা ঠেলে ভেতরে চলে যান। একটা ঘর পাবেন। ঘরটার সব ক'টা খিল লাগিয়ে আপনি ব্যবহার করুন। আশা করি আপনার কোন অসুবিধাই হবে না।

তাদের পিছু পিছু হরমোহনও সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল। তার দিকে চেয়ে সম্পাদক খেঁকিয়ে উঠল, কি করছিস এখানে? যা!

মক্কীরাণী দরজার ওপারে চলে গেল।

মেয়েদের পার্ট করার ব্যাপার আছে বলেই ওই ঘর খেঁষে হিসেব মত মঞ্চ আর সাজঘর করা হয়েছিল। কিন্তু উদ্যোক্তারা জানত না যে মক্কীরাণীকে নিয়ে যে সব ধর্মনার্থী মহড়ায় খুবই উৎসাহিত হয়েছিল তারা দরজার ছিটকিনিতে এমন এক কারসাজি করে রেখেছিল যে সেটা ঠিকমত লাগে না। তা ছাড়াও যাতে বাইরে থেকে চোখ রেখে ভিতর দেখা যায় এমনি ভাবে দরজার কাটলে সামান্য ছেঁদা করা হয়েছিল একটা।

বিভিন্ন সৌখিন দলের সঙ্গে অভিনয় করে করে এ সব ছ্যাঁচড়া বদমাইসির ব্যাপারে তার অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করার সময় সে ছেঁদাটা দেখতে পেল। হাতের রুমালটা জায়গামত গুঁজে দিল সে। সেটা একটু পরে মেঝেয় পড়ল।

স্কুল কলেজের দেওয়ালে যারা লুকিয়ে লুকিয়ে অশ্রাব্য কথা লেখে পরিশ্রম করে, রেলের লাভাটরী, সিনেমার পাঁচিল যাদের মন্তব্যে কোন কোন জায়গায় নরক হয়ে থাকে, তারা তো পৃথিবীর বাইরের লোক নয়। তারাই এখান ওখানে ছিটিয়ে আছে। তারা দু'একজন নিঃসন্দেহে কারখানাতেও ছিল।

সাজ ঘরে ভিড়টা যেন একটু পাতলা হয়েছে। মক্কীরাণী ঢুকে গেছে দরজার আড়ালে। মাঝে মাঝে দুই একজন ওই দরজার কাছে যাচ্ছে আবার সরে আসছে। দু'একজন ওখানে আছেই। এমন সময় সবাই যেন দরজাটার কাছ থেকে উঠে গেল। আর পরক্ষণেই খুলে গেল দরজাটা। পাল্লার ফাঁক দিয়ে গলা বাড়াল চিত্রা রায়। 'আপনাদের কি মা বোন নেই' এই ধরনের কিছু একটা সে বোধ হয় বলতে চেয়ে থাকবে। কিন্তু গলা বাড়িয়ে কাছাকাছি সে কাউকে দেখতে পেল না। প্লেসার, পেইন্টার আর দু'চারজন নিরীহ, যথার্থ ভদ্র কুশীলব দরজার সঙ্গে লাগান ত্রিপল ঘেরা গ্রীনরুমে বসে আছে। এক কোনে বসে আছে হরমোহন।

—এই?

একজন খোঁচা দিয়ে যেন জাগিয়ে দিল তাকে।

—এই?

হাতের ইসারায় হরমোহনকেই ডাকছে চিত্রা। সে দরজার কাছে গেল।

—আমি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি এসো।

ভেতরে গেল সে।

দরজা বন্ধ করল মক্কীরাণী। সকাল থেকে সামান্য নেশার ভাব লেগেছিল তার। এখন যেন আবার নেশায় মাথা টলে আসছে তার। সোজা হয়ে দাঁড়াতে যেন টাল খেয়ে যাচ্ছে।

চিত্রা তখন বললে, শোন লিলিপুট, তোমার একটা কাজ করতে হবে।

তার মুখ দিয়ে কথা সরলো না।

—ছিটকিনিটা হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকো চেপে। খুরোগুলো ঠাণ্ডা দিলে খুলে যাচ্ছে। আর এই এখানটায় মাথা দিয়ে দাঁড়াও। না হলে কুকুরগুলো এখান দিয়ে জিব বার করছে।

এই বলে মক্ষীরাণী বোতামে হাত দিল।

লোকে কি গাছপালা, পশুপাখির সামনে কোন সংকোচ করে? বোতামে হাত দিয়ে চিত্রা রায় বলল, খবরদার লিলিপুট, তুমি কিন্তু চোখ বন্ধ করে থাকবে। তুমি খুব ভালো। চোখ খুলতে নেই, বুঝলে?

যেন কোন অবোধ শিশুকে নীতিবোধের প্রথম পাঠ বলে দেওয়া হচ্ছে। আর নেশায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল মক্ষীরাণীর লিলিপুট। ডান হাতে দরজার শিকল চেপে রইল সে। মাঝে মাঝে দরজার ওপর থেকে তার মাথার কাপড়ের ফেটির ওপর খোঁচা পড়তে লাগল। চোখ খুললে সে দেখতে পেত তার তিলোত্তমার কণ্ঠার হাড় কত উঁচু, কনুইগুলো কত কোনা। কিন্তু সে একবারও চোখ খুলল না। হয়তো খুলতে পারল না। দারোগানের বেক-আপ নিয়ে লোকটা সত্যিই চোখ বুজে বসে আছে দেখে মক্ষীরাণী অবাক হল।

বেশ কিছুক্ষণ পর দরজার ওপরে মৃদু টোকা পড়ল। অচেনা কণ্ঠ শোনা গেল, চিত্রা, তোমার কি দেরী হবে?

—কে?

—আমি। শৌরীন।

—দাঁড়াও।

চোখ খুলে হরমোহন দেখল মক্ষীরাণীর সাজা হয়ে গেছে। শাদা ব্লাউজ, শাদা থান, তাকে একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

দরজা খুলল মক্ষীরাণী। তার আড়ালে লিলিপুট দাঁড়িয়ে।

—যাঃ। বেশ লাগছে তো, চোখ মুখ যেন উপচে উঠল শৌরীনের। সুর পাল্টে বলল, তোমার ডিসটার্ব করলাম না তো?

—তা একটু করলে বৈকি!

—দুঃখিত, এইদিকে কাজে এসেছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ল আজ এখানে তোমার রে আছে। তাই দেখা করে গেলাম।

—হঠাৎ মনে পড়ল তোমার? হঠাৎ? ডায়েরিতে লেখা ছিল না? কত মিথ্যে বলবে?

—বিশ্বাস হলো না কথাটা?

—দরজায় টোকা দিয়ে ডাকাডাকি না করলেই পারতে। ধিয়েটারের মেয়েরও সম্মান আছে একটা। সেটা দেখতে না হয়।

—খুব চটেছো মনে হচ্ছে। কিংছো ক'টায়?

—রে শেষ হলেই।

ও বাঁকিয়ে কথা বলতে বলতে দরজা ছেড়ে এগিয়ে এল চিত্রা রায়। পিছনে হরমোহন।

—আরে এটি কে? ভিতরে ঢুকিয়েছিলে নাকি?

—হ্যাঁ। কুকুর তাড়াচ্ছিল।

—তা কাজটা মন্দ নয়। ভাগ্যবান বলতে হবে।

—তোমার চেয়েও ?

ঠোঁট দিয়ে অথচ খুব আস্তে বলল চিত্রা। যদিও হরমোহন তা শুনতে পেল।

—নাম কি ভাগ্যবানটির ?

—ওর, নাম ?

মুখের চেহারা যেন চকিতে বদলে গেল চিত্রা রায়ের। একগাল হেসে বলল, ওর নাম খুব ভালো। লিলিপুট। আমি দিয়েছি।

হরমোহনের আসল নামটা মক্কীরাণী জানত না। শুনলেও খেয়াল করে নি। সৌরীন কিছু বলার আগে, চিত্রাই আবার বলল, ওকে আমি খুব ভালোবাসি।

ঠিক এই কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৌরীনের দিকে চেয়ে হরমোহন হাসল। চওড়া গোঁফের আড়ালেও হাসিটা যথারীতি ছড়িয়ে গেল চোখ থেকে হাতে।

—বাঃ। হাসিটিতো বেশ।

বলে হো হো করে হেসে উঠল সৌরীন।

—তা তুমি অমন করে চাইছো কেন ? হাসিটা তো ওর সত্যি ভালো। কত সরল দেখেছো ?

এই বলে চিত্রা রায় তার দিকে তাকাতেই হরমোহনের হাসি দীর্ঘতর হয়ে গেল।

সৌরীন বেশীক্ষণ দাঁড়াল না। ছট্‌ফট করার মত সাজঘরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াল। প্রেসার, পেইন্টারদের সঙ্গে তার বেশ আলাপ আছে, তা বেশ বোঝা গেল। চিত্রার সঙ্গে তার পরিচয় যে বিশেষ তা বুঝতে কোন বুদ্ধির দরকার ছিল না। প্রেসার, নাট্যসম্পাদককে সে বার বার জিজ্ঞাসা করল, শো ক'টায় শেষ হবে ? আন্দাজ ?

হরমোহনকে একান্তে ডেকে সৌরীন বলল, তোমার নাম কি ?

—নাম ?

অবাক হয়ে গেছে হরমোহন। এমন করে তার নাম জানতে চায় নি কেউ।

—হ্যাঁ নাম।

নির্বিকার উত্তর এলো, হরমোহন ঘোষ।

একটু পরেই 'আচ্ছা চলি' বলে বিদায় নিয়ে চলে গেল সৌরীন।

সেই রাত্রেই সৌরীনের সঙ্গে লিলিপুটের দেখা হল মক্কীরাণীর বাড়িতে।

॥ দশ ॥

থিয়েটার শুরু হয়ে গেছে। সময় সরে যাচ্ছে। গ্রীনরুমের এক জায়গায় কুঁদ হয়ে বসে আছে হরমোহন। মাঝে একবার কাকে যেন জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার কখন ?

উত্তরে করুণা করেছিল সেই ভদ্রলোক। চা কিম্বা অন্য কিছু এনে দেওয়ার জন্য। এনে দিয়েছিল। যেন একটা ঘোরের মধ্যে বসে আছে সে। নাটক শুরুর যার নাম শোনে এগারোটায়। একবারও তার ডাক পড়ল না। পরিচালক বলল, ডেকেছিলাম। কই, তুই তো গেলি না।

—তা'হলে আমি শুনতে পাই নি। শরীরটা বেতাব ছিল কিনা।

—কেন রে? তোর আবার শরীরের কি হল?

—কই কিছু না তো।

নাটক শেষ হওয়ার পর সাজঘরে শৃঙ্খলা রাখার আর কোন দায়িত্ব নেই। উৎসাহও না। সিকটার তার জিনিসপত্র সামলাচ্ছে। লাইটম্যান তার পয়েন্টেড ফোকাস ইত্যাদি ঘর করে বাক্সে রাখছে। ড্রেসার জিনিস গিলিয়ে তুলছে। কুশীলবরা পোশাক ছাড়ছে। মুখে নারকেল তেল ঘষছে কেউ কেউ। 'খুব ভালো' 'বেশ হয়েছে' 'চমৎকার' ইত্যাদি কথা, হাসি ছড়াছড়ি করে একটা আর একটার গায়ে বেসামাল হয়ে ঢলাঢলি করছে। মক্ষীরাণীকে দেখার জন্ত চুক চুক করছে কারো দৃষ্টি। কিন্তু ধরজার কাছে গিয়ে উঁকি মেওয়ার বা যে কোন রকম অনুবিধা করার উৎসাহ নেই কারো। বোধ হয় এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ক'জন আগেই চলে গেছে। এরই মাঝে আবার সিকন উড়িয়ে চিত্রা রায় আবির্ভূত হলো।

চরিত্রকার বন্ধুবর একটু থেমে বললেন, সেদিন থিয়েটারের শেষে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন ছিল। মাংস ভাত। সেখানে মক্ষীরাণীকে খাওয়ানোর জন্ত তার হাত ধরে কেউ টেনেছিল কিনা ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ আমি খসড়ার অপ্রয়োজনীয় বোধে পার করে যাচ্ছি। অবস্থাটা আর পরিবেশটা তোমরা অনুমান করে নাও। তার ক'টা জিনিস তোমাদের মনে রাখা ভালো। যথা—মাংস ভাত সেদিন হরমোহন খেতে পারে নি। এটাচি কেসটা সে সব সময় বয়েছিল। তার সামনে পাঁচ খানা দশ টাকার নোট নাট্য-সম্পাদক দিয়েছিল চিত্রা রায়কে।

—সই করতে হবে না?

—সই? কেন?

—অন্ত জায়গায় পেমেণ্ট করলেই সই করিয়ে নেয়। না হলে আমি মামলা করতে পারি তো।

—মামলা? বেশ তো করবেন। তাতে বরং আবার দেখা হবে।

একটা হাই তুলে মক্ষীরাণী বলল, এবার বাপু আমার বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। সারারাত আমায় আটকে রাখবেন নাকি তাই?

—এখুনি পৌঁছে দিচ্ছি। একজন কাউকে সঙ্গে দিতে হবে তো।

—নুনা। লোক আর খুঁজতে হবে না। আমার সঙ্গে যাওয়ার লোক আছে।

—কে?

—এই তো। ও-ই যাবে।

অনেকক্ষণ পর আবার হাসল হরমোহন। সেই হাসি।

আচ্ছা সমালোচক বন্ধু বাধা দিয়ে বলল, তুমি আবার শুরু করার আগে একটা কথা ওঠে। যে ভাবে তুমি দারাসিংকে গ্রীনরুমে এক পরিস্থিতির মধ্যে ফেললে তারপর বেভাবে লিলিপুট, লিলিপুট করে মক্ষীরাণীর পিছনে ছুটে গিয়ে, তাতে সব জিনিসটা যেন খুব দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। তাই না?

চরিত্রকার বন্ধুবর চটুল উত্তর দিলেন, আরে আমার এ লেখা তো ছাপা হচ্ছে না যে সাইকো এ্যানালিসিসের ছুতোয় কর্মার পর কর্মার পর বাড়িয়ে পাঁজির মত বই লিখতে হবে। তার চেয়ে সোজা কথা শোন, রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চর সেই কবিতাটি মনে আছে? যেখানে কবি বলছেন যে,

আকাশের নক্ষত্রগুলোকে পাশাপাশি বসিয়ে একটা হার বানালে সে হার বিশ্বভুবনের হাটে চড়া দামে বিকোয় বটে তবে যেটা ফাঁকা থাকে সেটা আকাশের উপস্থিতি। আমি হরমোহনের আকাশখানা আদৌ বাদ দিতে চাই না। তার জীবনের আকাশে দুই একটা তারার যাকখানে যদি ফাঁক থাকে তবে তোমরা মনে মনে তা ভরে নাও। তবু তোমাদের তৃপ্তির জন্য শুনে রাখো যে, মহীরাবণ এই লোকটির দয়ালতায় অভিভূত হয়েছিল। কৃতজ্ঞ হয়েছিল বলা চলে। এবার বলতে পারি?

দু'জন এক সঙ্গে সোৎসাহে বলে উঠল, চালাও। ব্রেক চালিয়ে যাও।

চরিত্রকার বললেন, এবার চিত্রা রায়কে একটু বেশী করে চিত্রিত করবো।

—কেন? কেন? কেন?

—এমনি। শোন।

কারখানার গাড়ি ওদের নামিয়ে দিল এক জায়গায়। এরপর আর গাড়ির রাস্তা নেই। সামনের তিনেতলার শিছু শিছু চলেছে সে। ঘাটের এই দিকটা গ্রামের মতো। মাটির ঘর মাঝে মাঝে। ইঁট বের করা খোয়াল। টিমটিমে আলো অনেক, অনেক দূরে দূরে। শিমুল গাছের মাথায় ডানা ঝাপটাল কোন পাখি।

—ফিরতে পারবে রাত্রে?

—আমি? হ্যাঁ। পারব।

—বোকা,

বলে একটু হাসল চিত্রা। তারপর বললো, এই রাত্রে এখান দিয়ে কেউ একলা ফেরে? থাকো কোথায়?

—কারখানার কোয়ার্টারে। দাদার কাছে।

—তবে? সে জায়গা কি এখানে? গাড়িও তো চলে গেছে।

ওরা পাশাপাশি হাঁটছে। এটাচিটা দুলছে হরমোহনের হাতে।

—তোমায় লিলিপুট বলেছি বলে রাগ করেছো নাকি?

—কি যে বলেন।

অন্ধকারে ঠোঁট খেল হরমোহন। তার হাসিটা দেখা গেল না।

আড়াইখানা ঘরের একটি ছোট বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল ওরা। কড়া নাড়ার আগেই দরজা খুলে গেল টুক করে। ভিতরে হ্যারিকেন জ্বলছে। দরজা খুলল শৌরীন।

—তুমি!

—কতবার জানতে চাইলাম কখন যে শেষ হচ্ছে। তা তো আর জানালে না।

—জানা যায় নাকি? জানলে কি করতে?

—সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম।

—তাই নাকি? পুরোনো সাহস আবার ফিরে পাচ্ছ মনে হচ্ছে।

—আরে হরমোহন যে। এসো এসো।

—এটাচিটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিয়ে শৌরীনকে নমস্কার করল হরমোহন।

—নামটাও জেনে ফেলেছ দেখছি।

চিত্রা বলল।

—জানতে হবে না? লোকটা আমার রাইভাল হয় কিনা কে বলতে পারে? রাইভাল বোধ তো হরমোহন?

—আজ্ঞে?

—রাইভাল।

—রাইফেল? আজ্ঞে হ্যাঁ—

হো হো করে হেসে উঠত বোধহয় শৌরীন। তার আগেই চিত্রা বলল, আমাকে এই ভাবে অপমান করতে তোমার লজ্জা করে না একটুও?

—তোমায় অপমান? তা কি পারি? এতো একটু ঠাট্টা হচ্ছে।

—হাসতে চাও, ঠাট্টা করতে চাও বিয়ে করো আগে—

কথাটা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল চিত্রা। তারের যন্ত্র মনোযোগের সঙ্গে বাজাতে বাজাতে মাঝপথে হঠাৎ ছেড়ে দেওয়ার মতো। কথা ঘুরিয়ে হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে আগের গলায় বলল, এই নাও তোমার কমিশন।

—তোমার কাছে টাকা নেব বলে এই রাত দুপুরে এসেছি মনে কর?

—ঠিক তাই-ই। তুমি, তুমি একটা—

—বলো, থামলে কেন? আরে, ও আছে তো কি হয়েছে? ওতো মানুষই নয়। ওর সামনে যখন পোশাক বদল করতে পারো, তখন ওর সামনে আমায় দু'চার কথা বলতে পারবে না? বলেই ফেলো।

—অনেক রাত হয়েছে শৌরীন। হয় টাকা নাও, না হয় তুমি এসো।

আর কোন কথা না বলে পথে নামল শৌরীন। এবার চিত্রা ডাকল পিছন থেকে, শোন।

এই ছোট্ট 'শোন' কথাটা এমন ভাবে ছাওয়ার ভাসল, যেন মনে হল কেউ বন্ধ করে রেসমের পোশাক পরিয়ে বুকের খাঁচা থেকে আলতো ভাবে পাখটা বার করেছে। শৌরীনের পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল চিত্রা। বলল, সাবধানে যেও তুমি। রাত অনেক হয়েছে।

কোন কথা না বলে হরমোহনের চোখের সামনে চিত্রা রায়ের পিঠে একটা ক্ষুদ্র চাপ দিয়ে শৌরীন হন্ হন্ করে অন্ধকারে হারিয়ে গেল। হরমোহন চেয়ে দেখল হ্যারিকেনের আলোয় চিত্র রায়ের ছায়াটা ছাদের মত এক জায়গায় ঘোরা মেরে গেছে।

—দিদিমণি।

এই প্রথম চিত্রাকে নিজের মত সম্বোধন করল সে।

—এঁ্যা?

—আপনি যে আসার সময় আমায় বললেন এই পথ দিয়ে এই রাতে কেউ একলা যেতে পারে না। উনি যে গেলেন।

নিজস্ব ভঙ্গিতে ধীরে ছেড়ে ছেড়ে কথাগুলো বলল সে। যেন সত্যি হাঁপিয়ে উঠেছে।

—ওর অনেক সাহস। ও অমন যায়।

এই কথার পিঠে হরমোহন একেবারে অন্য কথা বলল।

—একটা কথা বলব আপনাকে দিদিমণি ?

এই 'দিদিমণি' উচ্চারণের স্বাদটা যেন তার জিবে জড়িয়ে যাচ্ছে।

—বল।

—ওর সঙ্গে আপনার বিয়ে হলে, বেশ হবে।

চিত্রা রায় একবার তার দিকে তাকাল। তারপর বলল, ধ্যেৎ।

হাত থেকে এ্যাটাচিটা নিয়ে বলল, বুঝলে লিলিপুট আমার বিয়ে হবে না। আমার মত মেয়ের বিয়ে হয় না। আমি একদিন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হব।

যেন আজ কারখানার থিয়েটার পার্টটাই আবার নতুন করে রিহার্সাল করছে চিত্রা। সকলকে শুনিয়ে বলতে হয় বলে সেখানে জোরে বলছিল। আর এখানে বলছে আস্তে আস্তে।

বাইরের ওই আড়াই হাত বারান্দায় তার শোবার জায়গা হল। একটা শতরঞ্চি আর বালিশের বিছানা।

—ভয় করবে না তো ?

—না। ভয় কিসের ?

চিত্রা দরজা বন্ধ করে দিতেই তার সামনে একরাশ অন্ধকার। আকাশের এখানে ওখানে ঝিক-মিকে দু'চারটি তারা তার সামনে এসে দাঁড়াবে। তবু সে দ্বিতীয় বার বললো, ভয় কিসের করবে ?

—আচ্ছা কোন দরকার পড়লে আমায় ডেকো। আমি এ ঘরটায় আছি।

হরমোহনের মুখের ওপর দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই ভিতরে আর একটি নারী কণ্ঠ শোনা গেল। সেই কণ্ঠ বলল, ভেবেছিলাম রাত দুপুরে আর কিছু বলব না। কিন্তু এ সব ব্যাপার কি ?

—ব্যাপার আবার কি ? দেখছ তো এখুনি এলাম।

—তা আবার কোথাকার কে ওই লোকটাকে রাতভোর দুয়ারে শুইয়ে রাখা কেন ?

বেশ করেছি। বেশী যদি বকবে, তো ওকে আমি ঘরে এনে তুলবো ?

—তা তুমি পারো বাবা। তোমার ঘুরে ঘুরে দণ্ডবৎ। তুমি বাড়িতেই বাজার বসাতে পারো।

—কি বললে ?

—ঠিকই তো বলেছি গো। অত রোক কিসের তোমার ? রাত দুপুরে এসে তোমার নাম ধরে ডাকাডাকি করে বাইরের লোক। আমায় দরজা খুলতে হয়। বাড়ি নেই বললে, সে মানুষ বসে থাকে। বলবো না ?

—তার দরকার ছিল।

—ওরে আমার কি দরকার রে। তোমার বাপকে বলবো এখানে তোমায় আর তোমার ভাইকে রেখে যেন আমাদের নিয়ে অন্য কোথাও উঠে যায়।

—তার মুরোদ আছে তোমাদের ? বাজার বসিয়ে আমি যে টাকা আনি সেটা না হলে তোমাদের চলে ?

হয়তো দেখতে দেখতে এই ঝগড়া ভীষণ হয়ে উঠত। কিন্তু তার আগেই একটি পুরুষের গলা খাঁকারি শোনা গেল। তারপর চুপ। হ্যারিকেনের আলো নিভল। মশারা ঐক্যতান বাজিয়ে চলল। একরাশ জোনাকি রাত্রির নিস্তব্ধ উদাস হয়ে জলা নেতা করতে লাগল।

অনেক পর খুব সাবধানে একটা বিড়ি ধরাল হরমোহন। তারপর তার মনে কি হল কে জানে। সে নিজের মনে একবার হাসল।

॥ এগারো ॥

এক একটা মন্দিরে কোন কোন ভক্ত হত্যা দিয়ে পড়ে থাকে না? সারা দিন রাত তারা সেখানেই পড়ে থাকতে চায়, যদি দু'বেলা দুটি প্রসাদ পায়। হরমোহনের অবস্থাটা হলো সেই রকম।

সকাল হলেই সে এদের ঘরের ব্যাপার টের পেয়েছিল কিছু কিছু। বশ দিনে জেনেছিল বিস্তর। চিত্রা বার ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে। সেই সময় তার মা মারা গিয়েছে। তার ভাইটা তখন বছর আটেকের। সংসার সামলাবে বলে পড়া ছেড়েছিল। তাদের বাবা কাজ করত একটা দোকানে। এখনো করে। স'রা বছরের তাত কাপড় তাতে স্বচ্ছন্দে হয় না। না হলে হবে কি? বউ মারা যাবার দু'বছরের মধ্যেই সে তার ছেলে মেয়েকে লুকিয়ে আবার বিয়ে করে বসল। বাবা যখন বিয়ে করে নতুন মাকে নিয়ে এলো তখন কি ভাবে সে 'দূর' 'দূর' করে তেড়ে গিয়েছিল তা পাড়ার লোকে দেখেছে। দেখতে দেখতে তাদের নতুন মা, চারটি ছেলে মেয়ের আপন মা হয়েছে।

আর এদিকে চিত্রার দেহে যৌবনের কৌলুল লেগেছে। অযত্নে বাড়া লাউডগার মত চিকণ হয়েছে সে-ও। শৌরীনের মধ্যস্থতায় সৌখীন দলে পার্ট নিয়েছে সে। পুরু পাউডার মাখতে শিখেছে। বাইরে যার হতে হলে কয়েকটা সিল্ক ইত্যাদি শাড়ি দরকার তা বুঝেছে। কিনিয়েও ফেলেছে। দেখতে দেখতে এই শহরে আরো তিনটি মেয়ে সৌখিন দলে অভিনয় আরম্ভ করেছে। লীনা, পলি, ছবি। ধীরে ধীরে তাদেরও পসার জমছে। শৌরীন আছে বলেই বেশীর ভাগ রোল সে আজও পায়। তার জন্য সামান্য কমিশন নেয় শৌরীন।

সকাল হওয়ার আগেই বারান্দায় উঠে বসেছিল হরমোহন। রোদ কোটার একটু পরেই সে টের পেল যে ঘরের ভেতরটাও ফুটছে। চিত্রার জন্যে পাড়ায় নাকি আর কান পাতা যাচ্ছে না। ওই শৌরীন ছেলেটা দিনরাত যখন তখন আসছে আর যাচ্ছে। সোমত্ত মেয়ে থিয়েটারে পার্ট করে দু'পয়সা আনে বলে এ কি রকম ব্যবহার?—ইত্যাদি।

—বেশ করবে আসবে। শৌরীন আসবে। পৃথিবীর সবাই আসবে। দেখি পাড়ার লোক আমার কি করে, আর তুমি কি কর। খেতে দেবার নাম নেই কিল মারবার গোঁসাই।

এই বলতে বলতে চিত্রা দরজা খুলল।

হরমোহন হাসতে চেয়েছিল রাত্রি শেষের প্রথম সম্ভাষণ হিসেবে। কিন্তু হাসিটা সম্পূর্ণ ফুটে ওঠার আগেই ফুঁসে ওঠা চোখ মুখ নিয়ে চিত্রা তাকাল, ভিতরে আয়।

এক রাত্রির ব্যবধানে 'তুমি' নেমে এসে তুইতে। সে কি সত্যিই অনেক আপনার হয়ে গেল?

ভেতরে গেল হরমোহন।

সেই দিন চিত্রা আর তার মা'র হাঁড়ি আলাদা হয়ে গেল।

—পাড়ার লোকদের বলে দিও, আমি তোমার কেউ নই। আমি আলাদা করে রান্না করে খাই। যদি তোমাদের মন চায়, অন্য বাড়িতে উঠে যেও, আমি একলা থাকব।

হ্যাঁ, সবাই থাকুক, চিত্রা স্বাধীনা। তার চলা ফেরার জন্য সে-ই দায়ী। সংসার আলাদা হল। চিত্রা আর তার ভাই একভাগে। অন্যেরা অন্য ভাগে। চিত্রা বলল, তুই আমার কাছে থাকবি?

তার অবস্থাটা ভেতরে ভেতরে ছিল মন্দিরে পড়ে থাকতে চাওয়া ভক্তের মতন। সে রাজী হয়ে গেল।

পর পর দু'দিন কারখানা কামাই করল সে। একটা চাকরের যত রকম কাজ হতে পারে সবই

পড়ল তার আগে। ঝাঁট দেওয়া, উনুন ধরানো, যা হোক কিছু বাজার করা, দূরের কুয়ো থেকে স্নান ও পানের জল তুলে আনা। সব।

দু'দিন পরে সে কারখানায় কাজে গেল। কিন্তু সারাদিন কারখানায় যেন তার মন দাঁড়াতে পারল না। তার দাদা মণীন্দ্র ঘোষ তাকে ঘরে বলল, হ্যাঁরে হরা, তুই নাকি সেই থিয়েটারের মেয়েমানুষটার কাছে গিয়ে পড়ে আছিস?

—কই, না।

— মিথ্যে কথা বলছিস শালা। এক থাপ্পড়ে বাপের নাম ভুলিয়ে দোব তোর। কি গিয়েছিস?

—হ্যাঁ

—অ। এর বেলায় টাকা পাস কোথায় রে?

—টাকা তো লাগছে না। দু'বেলার খাওয়া এমনি দিচ্ছে, তাই—

—একেবারে শ্বশুর বাড়িতে আছিস তুই। ওখানের লাথি খেয়ে একবার আয় তুই, তারপর দেখাবো তোকে মজা।

একজন বাবু খাটো গলায় বললেন, কি হে হরমোহন? কি সব শুনছি?

—ও'সব বাজে কথা বাবু, এই বলে সে হাতের বুরুশ উঠিয়ে নিল।

—সব বলছে যে —

—বলতে দিন, এই বলে সে হাসল।

ব্রজেশ্বর জানতে চাইল হিন্দীতে, কি হয়েছে রে?

—কি আবার হোগা?

—খারাপ ব্যারামে কেঁসে গেছিস তুই?

হরমোহনের ইচ্ছে হল সে একবার কানে আঙুল দেয়। কিন্তু দিল না। বরং সবাই যা ভাবছে বলছে, তাই যেন ঠিক এমনি ভাব করে ব্রজেশ্বর কাহারের মুখের ওপর বলল, বয়স কালে এমন দু'চার কেস, তোমার কি তো হয়া হ্যায়। নাকি বুড়া?

—নয় সীয়ারাম। কভি নেহি।

হেঁকে উঠল ব্রজেশ্বর। হেসেও ফেলল। দু'জনেই হাসল।

কারখানা থেকে এতটা পথ পায়ে হেঁটে ফিরে সে প্রায়ই দেখতো দিদিমণি রিহার্সালে বার হয়ে গেছে। আর তার ভাই গেছে খেলতে। ভাই খেলা থেকে ফিরলেই তাকে দুধ বিস্কুট দিতে হবে। দিদিমণির কড়া হুকুম। আর তার সৎ ভাই বোনেরা যদি এদিকে চলে আসে তা হলে তাদের তাড়াতে হবে। যদি দরকার হয় চড় চাপড়ও লাগান চলতে পারে। এ হুকুমও দিদিমণির দেওয়া আছে।

তা দিদিমণি, ভাইকে ভালবাসে বাপু। রাতে নিজের কাছে নিয়ে শোয়। সকালে পড়তে বসার জন্যে তাড়াতাড়ি উঠিয়ে দেয়। পড়া করেছে কিনা বারবার জানতে চায়। দুধের জোগাড় ব্যবস্থা করেছে, বিস্কুটের টিন।

দিদিমণির সৎ ভাই-বোনদের হরমোহন দূর দূর করে না। পারলে পরে লুকিয়ে একটি বিস্কুট চার টুকরো করে ওদের চার হাতে দেয়। ওরা যেন অনেকটা ওর বাবার ছেলেগুলোর মত।

হরমোহন ঘর ঝাঁট দেয়। বই ক'টা রোজ সাজায়। 'পথিক' 'ছেঁড়াতার' 'সিরাজের বেগম'

'কবরের কান্না' এই সব নাটকের বই। অনেক। বানান করে করে সে নামগুলো পড়ে। দেখতে দেখতে রাত হয়। চিত্রার ভাই বেবু ঘুমিয়ে পড়ে। অবশেষে রিহার্সাল থেকে ফেরে চিত্রা। দিদিমণিকে হরলা খুলে দেয়। কত জায়গায় যে পার্ট আছে তার। সন্ধ্যায় বাড়ি থাকে না বললেই চলে। রোজই কেউ না কেউ পৌঁছে দিয়ে যায়।

একদিন সে বলল, দিদিমণি একটা কথা বলবো ?

—বল্।

—বলছিলাম কি, আমি আপনার সঙ্গে গেলে হয় না ?

—কোথায় ?

—এই 'শনিবে' বেলায়

—কোন দরকার নেই। ভাগ্—

সন্ধ্যায় যেদিন থাকে সেদিনও চিত্রা কারো সঙ্গে বড় একটা কথা বলে না। তার সঙ্গে তো নয়-ই। বসে বসে পার্ট মুখস্থ করে। কখনো শুয়ে থাকে। অগোছালে তাকিয়ে। চেয়ে থাকে হরমোহন।

এই ভাবে দশদিন কেটে গেল। যেন একটা দিন। স্নান করার পর মঞ্জীরাকে চুল আঁচড়াতে দেখল সে। দু'চোখ ভরে চেয়ে চেয়ে দেখল। রাত্রে ঘুম আসার আগে মুখের সামনে হাই তুলতে দেখল। কত, কতবার। যে সন্ধ্যায় রিহার্সাল নেই, পাতলা পোশাকে তার তিলোত্তমাকে চোখের সামনে বসে থাকতে দেখল। আর শেষের দিকে পর পর দু'রাত্রি হরমোহন মাঝরাতে উঠে জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়েছে। অন্ধকারে তার দুটি অন্ধ হয়েছে। কেউ তা জানে না।

এদিকে, যে বিষের ফলে, যে কার্যকারণের মধ্যে চিত্রা আলাদা হয়েছিল সে বিদ্বেষের উত্তাপ যেন আর নেই। নতুন মায়ের দাঁতের ডাল, ঘন্ট, প্রায়ই আসছে এবের খাওয়ার থালায়। অবশ্য হরমোহন বাদে। যদিও বিস্কুট দিয়ে হরমোহনই এত কাণ্ডটা বাধিয়েছে।

অথচ সেই রাত্রি—যেদিন হরমোহন এখানে এল—তা'র পর থেকে শৌরীন আর কোনদিন এ-বাড়ি আসে নি। চিত্রা ভাই তার ভাইকে পাঠিয়েছিল শৌরীনের খবর নিতে। সন্ধ্যার সময় খবর নিয়ে ফিরল বেবু। বলল, জানিস দিদি। শৌরীনদা, পরশুদিন বিকেলে আমাদের বাড়ি আসছিল।

—তা কি হল ? জানতে চাইল দিদি।

—পাড়ার ছেলেরা ওকে মেরেছে।

—কে বললে ?

পাড়ার ছেলেরা আমায় বলল, তোর দিদিকে বলে দিস—

ঠিক এই সময় চৌকাঠে এসে দাঁড়াল শৌরীন। বলল, দিদিকে কি বলতে বলেছে বেবু ?

ঘরটার মধ্যে মুহূর্তে যেন খুশির হাওয়া ছড়িয়ে গেল। চিত্রা রায়ের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল নিমিষে। কেউ কোন কথা বলছে না। হঠাৎ হরমোহন বলল, দিদিমণি এইতো জামাইদা এসে গেছে—

ঘরের খুশিকে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে হিংস্র কণ্ঠে শৌরীন বলল, কি ? কি বললি ? রাস্কেল, ইডিয়ট কোথাকার—

—আজ্ঞে ?

এই বলে তার হলদেটে দাঁত বার করে হরমোহন হাসার চেষ্টা করল।

শৌরীন এগিয়ে এসে তাকে খাপ্পড় মারল একটা। হয়তো আবার মারতো। কিন্তু তার আগেই চিত্রা তার হাতখানা ধরে ফেলল। বলল, কি করছো ? থামো।

—তুমি জানো, এই সমস্ত লোকগুলোর জন্যেই হাওয়াল ছড়ায়।

চিত্রা কোনমতে নিরস্ত করল শৌরীনকে।

শৌরীন বলল, ঠিক আছে। কিন্তু এই আপদটাকে তুমি এখুনি এখান থেকে তাড়াও। যাও, যেন আর কোনদিন ভুলেও না এদিকে আসে।

নতুন মার সঙ্গে ঝগড়া করে যেমন রুপ করে এক সকালবেলা 'তুই' বলে তাকে ভেতরে ডেকে নিয়েছিল চিত্রা, আজ তেমনি এক সন্ধ্যায় শৌরীনের মন রাখতে রুপ করে ঠিক তার মুখের ওপর 'আর এসো না' বলে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঠিক রুপ করে বন্ধ করল না। একটা পুরোনো এক টাকার নোট তার সামনে ধরে বলল, যা এটা রাখো, আর কোনদিন এসো না।

টাকাটা হাত বাড়িয়ে নিল হরমোহন। এবং তারপর সত্যিই হাসলো। হলদেটে দাঁতগুলো বার হয়ে পড়ল। তারপর টক্ খাওয়ার মত জিবে একটা শব্দ করে বলল, 'আচ্ছা'।

আচ্ছা বলে, সূর্যের তেজ থেকে চোখ আড়াল করার জন্যে হাতের পাতা একত্র করে কপালের ওপর রাখার মত রেখে সেলাম করল সে। তারপর ঠুক ঠুক করে পথে নেমে পড়ল।

॥ ব্যাঙ্গো ॥

ঘিঘিঘণির ওখান থেকে ফেরার পর—অর্থাৎ এই ঘিয়েটারের সূত্র ধরেই—সে এক জায়গায় গিয়েছিল। পাঁচজনের কাছে বলতে নেই, জায়গাটা খারাপ।

পাঁচজনের কাছে বলতে নেই বটে, কিন্তু আমার কাছে সে বলেছিল।

এই বলে চরিত্রকার একটু দম নেওয়ার জন্য থামলেন।

তোমরা হয়তো ভাবছ যে এই ঘটনাটা সে স্বেচ্ছায় আমায় জানিয়েছে। তা নয়। তোমাদের বলতে যাচ্ছি, তা জানবার জন্য আমায় রীতি মতো কৌশল করতে হয়েছে।

আড্ডায় একজন বলল, কৌশল কিরি কিরি কি বাবা ?

—বলছি। আমি একবার হরমোহনের হাত দেখেছিলাম।

—হাত ? তুমি ? হঠাৎ ?

—সেটাই তো কৌশল।

তোমাদের একেবারে গোড়াতেই বলেছি যে, হরমোহন ঘোষ এমন একটা লোক যাকে দেখে দেখার কিছু আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু চোখে যার পড়ে তার আর দেখে দেখে ফুরোয় না। আমার দশা হয়েছে তাই। লোকটাকে দেখতে দেখতে, জানতে জানতে আরো দেখার আগ্রহ, আরো জানার কৌতূহলে আমার কেবলই বেড়েছে। অথচ সব কথাতো সরাসরি জানতে চাওয়া যায় না। এমন অনেক প্রসঙ্গ আছে যা কথার কায়দায় তোলা যায় না ওর বন্ধুদের কাছেও। তবু তার সেই সব গোপন ব্যক্তিগত কথাও কিছু কিছু জানা দরকার। তাই হাত দেখার অছিলা। কেবল সেই সব কথা কোনরকম আড়াল না রেখে জেনে নেব বলে।

—জানতে চেয়েছিলে ?

—হাঁ।

—উত্তর দিয়েছিল ?

—অবশ্য।

—নিজের গোপন কথা ?

—ঠিক তাই।

ষোলো আনা ইডিয়ট রে।

সমালোচক এতক্ষণে বলল, কি কি জানতে চেয়েছিলে এবং কি ভাবে ? যথা—

—তার ডানহাতের পাতা নিজের হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ দেখলাম। পৃথিবীর সব গণৎকার যেমন হাতের গঠন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে, সেই ভাবে। মানুষটা মাথায় যেমন খাটো, তার হাতের গঠনও তেমনি ছোট। পাঁচটা আঙুলে কেবল অনেক কড়া পড়ে গেছে। অনেক, অনেকক্ষণ গভীর মনোযোগের ভাণ করে তার হাতখানা নাড়াচাড়া করলাম। আর ততক্ষণ একদৃষ্টে সে আমার দিকে চেয়ে রইল।

'হুম্' আমি বললাম।

এ কথায় হাসির কিছু ছিল না। সে হাসল।

—তোমার ছোটবেলার কথা কিছু কিছু বলে দোব ?

—বলুন বাবু।

—তোমার বয়স যখন আট, তখন তোমার বাবা মারা যান।

এ সবই আমি তার দাদার কাছে জেনে নিয়েছি।

—তোমার বয়স যখন সাড়ে পাঁচ-ছয়, তখন তুমি জ্যৈষ্ঠ মাসে গাঁয়ের কুয়ায় পড়ে গিয়েছিলে। জল খুব কম ছিল, না হলে তোমায় বাঁচানো যেতো না।

সে অবাক।

—তোমার এখন বয়স কতো বলে দোব ?

—বলুন বাবু।

—কোম্পানীর খাতায় তুমি পাঁচ বছর কম লিখিয়েছ। তোমার এখন ছত্রিশ চলছে। তাই না ?

এ সবই আমি জেনে নিয়েছি কথায় কথায় তার দাদার কাছ থেকে। কিন্তু কেবল মাত্র হাতের রেখা খুঁটিয়ে নির্ভুল অতীত বলায় আমার ক্ষমতা দেখে সে হাঁ হয়ে গেছে। তার মুখভরা সাক্ষী স্বরূপ হাসিটি চোখ থেকে ছড়িয়ে গেছে মাঠে।

—হরমোহন।

—হাত দেখাতে এসে কিছু লুকোবেনা।

—না বাবু।

—যা জানতে চাইব ঠিক ঠিক উত্তর দেবে।

—দোব বাবু।

—একটিও মিথ্যে বলবে না।

—না বাবু।

—সব ধর্মত সত্যি বলবে।

—হ্যাঁ বাবু।

তার অবস্থাটা তখন প্রথম কাঠগড়ায় ওঠা সরল সাঁওতাল আসামীর মত হয়েছে। ঠোঁট দুটি সামান্য কাঁপছে। সওয়াল করার আগে বুঝি সব কবুল করে বলে।

এমনকি কোন পাখি আছে ঝড়ের হাপটে যে পাখির পাখার কোন একটা পালক খসে গেলেও ডানায় মোচড় লাগলেও ঝড়ের পূর্বাভাসে ডানা গুটিয়ে যে বাসায় ফেরে না? বরং ঝড়কে ডেকে আনবে বলে ঊর্ধে উঠে যায়? পালক খসার অভিজ্ঞতা আবার আস্বাদ করবে বলে ঝড়ের মুখে নিজেকে খানিকটা ছেড়ে দেয়? তেমন কোন পাখী আছে কিনা আমার জানা নেই। যদি থাকতো তা হলে হরমোহনের মনটা বোঝাবার জন্য সে পাখির নাম আমি উপমা হিসেবে ব্যবহার করতাম।

হাত দেখার ছলে আমি এইবার নির্বিবাদে সোজা বললাম, তোমার তা ছিল। কপালে পাথর চাপা আছে কেন জান?

—কেন বাবু?

বলে সে হাসল।

—তুমি খারাপ জায়গায়, খারাপ মেয়ে মানুষের কাছে গিয়েছিলে। তাই না?

—হ্যাঁ বাবু।

—কবে?

সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দিতে পারল না। উত্তর দিতে বোধ হয় তার কথা বেধে যাচ্ছিল। সংকোচ, জড়তায়, হাসিটাই সে বিলম্বিত করে রাখল।

—হাসছো যে?

তাকে নিয়ে গল্পের উপকরণ সংগ্রহে আগ্রাহী আমি বুঝি খানিকটা অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম।

এবার আমার আশ্চর্য হওয়ার পালা। আমার ধারণা ছিল যে, খারাপ জায়গার কথা আমি বলতে চেয়েছি সেইখানে যাওয়ার অভিজ্ঞতা তার নতুন নিশ্চয় নয়। চারপাশে কিছু কিছু ভদ্রসন্তানদের তো দেখেছি। আর মাথায় খাটো এই ছত্রিশ বছরের অশিক্ষিত মানুষটা তো সামান্য মুইপার ঘরো সিং। তা হলেই বা। আমি অভিভূত হলাম এই কথা জেনে যে এইমাত্র সেদিন সে প্রথম গেছে। জীবনে প্রথম। থিয়েটারের দিন মক্কীরাণী যখন তাকে নিজস্ব সাজঘরে ডেকে নিল সেই তখন থেকে একটানা দশ দিন যে দারুণ তুফানে সকলের অলক্ষ্যে তার পাখার পালক খসেছে, ডানায় মোচড় লেগেছে, সেই তুফানটাই পুরো মাত্রায় বাজার থেকে সওদা করার লোভে গিয়েছিল সে।

চরিত্রকার বললেন, আমাদের গল্পের নায়ক যদি লেখক হতো কিংবা সাহিত্যের নৌখিন পাঠক হতো তাহলে যে বাজারে সে গেল সেখানের পরিবেশ ইত্যাদির একটা মোটামুটি বর্ণনা আমরা পেতাম। সে সব তোমরা কল্পনা করে নাও। আর ধরে নাও, যে মেয়েটির কাছে সে গিয়েছিল, তার নাম গোলাপ।

হরমোহন তখন বলছে, আমি চলে এলাম।

—কেন?

—আমার কাছে জানতে চাইল আমি বিয়ে করেছি কি না।

আড্ডায় একজন গল্পে বাধা দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, সবাই দেখছি ওকে এক প্রশ্নই করে।

চরিতকার বললেন, হরমোহন আর গোলাপের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল তা আমি মোটামুটি নাটকের মত সাজিয়ে দিচ্ছি। হয়তো হুবহু 'ডায়লগ' বলতে পারবো না। তবে কথা দিচ্ছি, কোন রং চড়াবো না।

গোলাপ—বিয়ে করবে না তুমি?

হর—হ্যাঁ [কথাটা বলে সে নিশ্চয়ই হেসেছে]

গোলাপ—আমার কিন্তু অসুখ আছে।

হর—তা আমি কি করবো?

গোলাপ—রোগ তোমারও হবে।

হর—কেন?

গোলাপ—যাঃ, আমার কাছে এসেছো যে। তোমার থেকে তোমার বউর হবে। বউর হলে তোমার ছেলেরও জন্ম থেকে অসুখ হবে।

হর—কি অসুখ?

গোলাপ— কানা বা অন্ধ হবে। [হরমোহন প্রস্থানোদ্যত] ওকি, চললে যে। এখানে সব্বাইকার রোগ আছে। আমি মুখ ফুটে বললাম কিনা। সবাই লুকিয়ে রাখবে।

হর—আমি বাড়ি চলে যাবো।

গোলাপ—এতক্ষণ যে বসে বসে গল্প করলে। টাকা দেবে না? যাগো, খাবো কি?

হর—টাকা লাগবে বুঝি? আচ্ছা—[সে কাপড়ের খুঁটে হাত দিল]

সমালোচক বন্ধু প্রশ্ন করল, ঘটনার তাৎপর্য কি? মেয়েটাও ব্লাফ দিল ওকে? কেন?

চরিতকার বললেন, তোমার দেখছি তাৎপর্য বাতিক আছে হে। সুতরাং তুমি ওসব খোঁজো। আমি শুধু ভাবছি মাথায় খাটো মানুষটা এক জায়গায় কত সীরিয়স। এই সব জায়গায় এসে যদি তার রোগ হয়, আর তাই যদি তার ভবিষ্যত বংশধরেরা জন্মকানা বা জন্মান্ধ হয়, এই কথা মনে হওয়া মাত্র যে পাঁকের মধ্যে নেমেছিল, নিমেষে নিজেকে উঠিয়ে নিল সেখান থেকে। কেবলমাত্র অজানা ভবিষ্যতের কথা ভেবে ও তাকে সুন্দর করার জন্য যে লোক নিজেকে শাসন করে, নিয়মে বাঁধে তাকেই তো চরিত্রবান বলে।

সমালোচক বলল, যদিও হরমোহন, তাহলেও এই ব্যাপারটায় তার মধ্যে একটা ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভংগি দেখা যাচ্ছে।

চরিতকার বললেন, হাত দেখাতে বসে এই ভাবে সে কিছুই গোপন করল না। গিয়েছিল কেবল টাকা দিয়ে চলে এসেছে। ধর্মতঃ সত্যি বলল সে। আমি শুধু অতীত বলে দিয়েছি। অনাগত ভবিষ্যতের সব বলে দিতে পারি, এই বিশ্বাস, এই ভরসায় আমার হাতের মধ্যে নিজের হাত রেখে চোখ তুলে বলল, 'আর তো কোনদিন যাই নি বাবু। এতেই কি পাপ হলো'?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, তুমি একটা শাঁখের আংটি পরো হে। তোমার ভালো হবে।

শাঁখের আংটি সে পরদিন ধারণ করেছিল। গত ক'মাস কাজ করার সময় পর পর চারটে আংটি ভাঙার পর, আর সে কেনে নি।

সেদিন হাত দেখার শেষ পর্যায়ে সে আমায় যে প্রশ্ন করেছিল একমাত্র সে-ই তা পারে। বলেছিল, আমার বিয়েটা কবে দেখলেন না?

—হবে। এই সামান্য মেরী।

চরিতকার বললেন, হাসিটা যদি তোমরা দেখতে।

* * *

এ সব অনেকদিন আগের কথা। এই বিশেষ ঘটনার কথা কেউ জানে না। আমি ছাড়া।

সবাই অবশ্য এ কথা জানে যে সে থিয়েটারের ঘিঘিমণির বাড়িতে সপরিবার ছিল। এই তার দোষ। তাইতো যতকাল তার বউদি, খোঁটা দিয়ে বলেছে, 'যাও না গো, তোমার সেই থিয়েটারের ঘিঘিমণির কাছে গিয়ে থাকো না।'

॥ তেরো ॥

ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে এতটা পথ হেঁটে তার জামা কাপড় ভিজেছে। গা-ও। স্নান করার পর ভেজা গামছা নিংড়ে নিলে যেমন হয় তার কাপড় জামার অবস্থা হয়েছে অনেকটা সেই রকম। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। এতটা পথ হেঁটে পেটের ক্ষিদে কুই কুই করা বন্ধ করে যেন হঠাৎ মেরে গেছে। বিড়ি আর ভালো লাগছে না। জিবে খস্ খস্ করছে। এদিকে বিড়ি না ধরালে যেন পা আর চলতে চাইছে না। বিড়ি খাচ্ছে। খালি পেটে ধোঁয়া গিয়ে যেন মাঝে মাঝে পাক দিয়ে উঠছে।

প্রায় সওয়া ঘণ্টার মত পথ হেঁটে যজ্ঞেশ্বরের বাড়ির কাছে এলো সে। যাবো কি যাবো না ভেবে, ডাকবো কি ডাকবো না চিন্তা করতে করতে অবশেষে ডেকেই বসল, খুড়া, খুড়া ছার?

যজ্ঞেশ্বর ছিল।

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই হরমোহনের যেন শীত করার মত হলো। রান্না ঘরে চুলোর ধারে গিয়ে ভাবীজির সামনে দাঁত বার করে বসল সে। তারপর হাত সেঁকতে লাগল। আঙুলগুলো জলে ধোয়া হয়ে কুঁকড়ে কুঁকড়ে গেছে। আগুন না পেলে সোজা হবে না।

—চা উ পিবো?

—হলে তো ভালোই হয় খুড়া।

বৌদির ছুঁড়ে দেওয়া পুঁটলিটা সঙ্গে আনে নি বলে এতক্ষণে একবার আফশোষ হল হরমোহনের। পুঁটলিটার মধ্যে আর একটা জামা কাপড় নিশ্চয়ই আছে। ও এক জামা কাপড়ে এক সপ্তাহ চালায়। শনিবার দিন ময়লা কেচে রোববার সকালে আগের সপ্তাহের কাচাগুলো গায়ে চড়িয়ে এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করে। সপ্তাহের ডিউটি করে সেই পোষাকেই।

লাল কেডস্‌টায় কাদা লেগেছিল। সেটা সে জল দিয়ে আচ্ছা করে ধুয়ে ফেলল। তার পর একটু ইতস্ততঃ করে সরাসরি বলেই ফেলল যজ্ঞেশ্বরকে।

বলল, তোমার একটা কাপড় আর কোর্তা হবে?

—কাহে?

—হবছো না, আজ লাগছে।

—তো বৈঠ। চা পিলে। আজ ছুট্ট আয়গা।

—আর নাহে খুড়া, আমি এখন কুটুম বাড়ি জায়েগা।

—কঁহা ?

—আরে ছায়। সে একঠো ছায়।

সহজে যজ্ঞেশ্বর রাজী হয় নি। কোথায় কুটুম, কেমন কুটুম, সে কথা ধরো সিং তার কাছে ভেঙে বলে নি বলে সে তো রীতিমতো গোসা করল। তারপর হরমোহন যখন কবুল করল যে আজ রাতেই কুটুম বাড়ি থেকে ফেরার পথে সে যজ্ঞেশ্বরের জামা কাপড় এখানে রেখে দিয়ে যাবে, তখন শেষ।

আহা, কি বাহারে জামা রে। খাকির হাফ সার্ট এখানে ওখানে সাদা সুতোর তিপু করা। সেদিন যজ্ঞেশ্বর তা ভাঁজ করে রেখে দিয়েছিল কোন একটা কিছুর তলায়। সেই জামা হরমোহনের হাঁটু ছাড়িয়ে নামল। গায়ে হল হল করছে। কলক। ধুতিটাও বদলে নিল। তারপর একটা ভাঙা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নতুন করে চুল আঁচড়ালো।

তার সাজ পোশাক দেখে আদর করার ভংগিতে যজ্ঞেশ্বর বলল, বারে, চিড়িয়া।

চা এল এর পর।

—ঘুড়ি, ভাজি উজি নেই যে ?

অন্দরের উদ্দেশে জানতে চাইল যজ্ঞেশ্বর।

হঠাৎ যেন তাড়া লেগে গেল হরমোহনের। বলল, না, না। আর কিছু নেই লাগে না। এই অনেক হ্যায়।

খালি পেটে চা গিয়ে পড়ল যেন ছ্যাক করে। পেতলের গেলাসে চা দিয়েছে যজ্ঞেশ্বরের বউ। গ্লাসটাও গরম লাগছে। আঁচার প্রান্ত দিয়ে গ্লাস ধরেছে সে। ফুঁ দিয়ে দিয়ে চুমুক দিচ্ছে। আর মাঝে মাঝে হলদেটে দাঁত বার করে কিক্ কিক্ করে হাসছে। সবটা চা পেটে গেল তার। মনে হলো যেন কোন কালে তার খিদে পায় নি। পেট যেন তার ভরা।

চিন্তা রায় বাড়িতেই ছিল।

সেই পায়ে চলা পথ দিয়ে ঠুক ঠুক করে এগিয়ে, খড়ছাওয়া মাটির ঘর, ইট বেরকরা বাড়ি, শিমু গাছ, বোপ ইত্যাদি দু'পাশে রেখে সে বাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছে গেল। কোম্পানির লেবার কোয়ার্টারে যাবার মতই দিদিমণির বাড়ি যাবার রাস্তাটাতেও কাদা হয়েছে। সামলে চলতে হচ্ছে তাকে।

সেই আড়াইকুড়ির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হরমোহন ইতস্তত: করতে লাগল। ওইতো সামনে সেই বারান্দা। ওই বারান্দায় শুতরেকের বিছানায় কত নির্জন রাতে ও একা বসে জেগেছে। নিশাচর পাখি, ভাঙা চাঁদ, ছিটোনো নক্ষত্র, গাছপালার রোমশ অন্ধকার মাথায় ছোট মানুষটাকে ভয় দেখায় নি। মুহ্যমান করে নি। হরমোহনের বৌদি যেমন ভাবে শিল নোড়া দিয়ে পিষে পিষে মশলা বাটে, এই বারান্দায় সেই সব রাতে তার মনে হতো তার বুকের মধ্যে কে যেন অমনি ভাবে কি যেন পিষে পিষে বাটছে। এমনি দুঃসহ দু'রাতে অন্ধের মত সে এই অন্ধকারের এক জানালায় উঁকি দিয়েছে।

দরজার একটা পাল্লা সামান্য খোলা। ভিতরে মানুষ আছে বোঝা যায়। কিন্তু দেখা যায় না। একটু এগিয়ে দরজায় সামান্য কড়া নাড়লে বা কারুর নাম ধরে ডাকলে তবেই না ভেতরের মানুষ এগিয়ে এসে দরজা খুলে দেবে ? সে ওসব কিছুই করল না। দরজা থেকে ধীরে ধীরে জানালার দিকে এগিয়ে গেল। ঠিক জানালার পাশে গিয়েও দাঁড়াল না। বলা চলে সে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার বড় বড় কান দুটো খাড়া হয়ে উঠল আপনি। ঘরের মধ্যে খিল্ খিল্ করে হাসছে দিদিমণি। হাসাচ্ছে 'জামাইবা'। জামাইবা ? গলা চিনতে তার একটুও ভুল হলো না।

এতক্ষণে, এই প্রথম তার মনে হল, কেন এলাম ?

—কে ? কে এখানে ?

দরজা খুলে বাইরে এলো শৌরীন।

—আমি, এই বলে সে হাসল। চুল আঁচড়ানোর জন্ত তার মুখখানা লম্বাটে লাগছে আরো।

আরে, এসো এসো। ভিতরে এসো, স্বাগত জানাল শৌরীন। তার পর ভিতরের দিকে মুখ করে বলল, দেখে যেখো, কে এসেছে।

চিত্রা শৌরীনের পাশে এসে দাঁড়াল।

—এসো হরমোহন। কি খবর। ভেতরে এসো।

আবার হেসে দু'জনকে একই সঙ্গে সেলাম করল সে। যেভাবে শৌরীন দরজায় এসে তাকে গ্রহণ করল, ও যেভাবে চিত্রাকে ডাকল তাতে চিত্রার মাথায় সিঁদুর, হাতে নোয়া দেখলে হরমোহনও বোধহয় আশ্চর্য হতো না। কিন্তু কোথায় কি ? বিদিমণি যে কে সেই। রঙ, চঙ, মাথা নেই বলে মুখটা মাটা মাটা লাগছে, এই যা তফাৎ। আর বিদিমণির চেহারাটা যেন আরো একটু রোগা হয়ে গিয়েছে দেখছে। খালি খালি লাগছে আগের চেয়ে।

—এতদিন আসোনি যে, চিত্রা বলল।

যেন তাকে বারবার অনুরোধ করা হয়েছিল এখানে আসার জন্ত। তাই এই অনুযোগ। যদি সে দিনের সেই কথা সে আর একবার মনে করিয়ে দেয় তাহলে ওদের এই হাসি হাসি মুখে আপ্যায়নের ঘটা থাকে কোথায় ? কিন্তু ওরা বোধহয় জানতো যে হরমোহন সে কথা ভুলবে না। ভুললও না। আর আপ্যায়নের ঘটা দিয়ে ওরা বুঝি পরোক্ষভাবে সেই ঘটনার সবকিছু ভুলে যেতে অনুরোধ করল।

শুধু বলল, আসা হয় নি। আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছিল ?

চিত্রা বলল, দেখেও কেন ? যাও, তুমি ওই মোড়াটায় বসো।

—আপনারা ?

—এই তো বসলাম।

তক্তাপোষের একটা কোনায় বসল চিত্রা।

—আমাদের ওপর রাগ করেছিলে বুঝি ?

চোখ তুলে তাকাল চিত্রা। ওর চোখ দুটি বড় বড়। চোখের পল্লব বেশ ঘন। সেদিকে একবার চেয়ে সে চোখ নামিয়ে নিল। প্রথম দিন রিহার্সাল রুমে লক্ষ্মীরাণীকে দেখে তার মুখ যেমন কর্সা, অনিন্দ্য মনে হয়েছিল, এই মুহূর্তে চিত্রার প্রসাধনহীন মুখখানা তার মনের চোখে তেমনি জল জল করতে লাগল। তাকে যে কি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তা যেন পুরো তার কানে গেল না। সে দেখল শৌরীনবাবু ঘরটার মধ্যে পায়চারী করছে। বিয়েটারের দিন সাজঘরেও শৌরীনবাবু এমনি ছটফট করার মত হাঁটছিল।

পুরোনো কথার জের ধরে তার নিজস্ব ভঙ্গিতে ধীরে, ছেড়ে ছেড়ে, হাঁফ ধরার মত গলায় সে বলল, কই বললেন না তো। আপনার কি, অসুখ বিসুখ করেছিল ?

হঠাৎ শৌরীন বলল, না হে আনন্দে।

—আজ্ঞে ?

—তোমার বিদিমণির শরীর খারাপ হয়েছে আনন্দে।

—আনন্দে ?

—তোমার দিদিমণির যে বিয়ে গো।

এই কথা বলতে বলতে শৌরীন চিত্রার পাশ ঘেঁষে তক্তাপোষের ওপর বসে পড়ল। শৌরীন এমন কিছু বলবে বলে চিত্রা বোধহয় প্রস্তুত ছিল না। সে দাঁতে করে ঠোঁট কামড়ে শৌরীনের দিকে ভ্রূকুটির ভঙ্গী করল। মেঘের আড়ালে সূর্য হঠাৎ চলে গেলে যেমন হয় হরমোহনের মনে হল, তার সামনে যেন তেমনি পাতলা আঁধার হল। চিত্রা বলল, তোমার জামাইবাবুও তো বিয়ে হরমোহন।

'জামাইবাবু' কথাটা বলার সময় গলাটা যেন খেলিয়ে দিল চিত্রা।

বিয়েটাতের দিন হরমোহনের যে নেশার ঘোর লেগেছিল এখন যেন সেই নেশার অবসাদ তার মাথায় চেপে বসেছে। ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে সে বলল, তাই বুঝি ? কোথায় ?

—বলতো, কোথায় ? বলে হাসি মুখে এগিয়ে এলো শৌরীন।

—আজ্ঞে, আমি কেমন করে জানবো বলুন।

—পারলে না তো ?

—না।

—বেশ। এঁকে দিদিমণি বলবে না বৌদি বলবে সেটাই তুমি আগে ঠিক করে নাও।

চিত্রা তার হাতের মুঠি দিয়ে একটা কিল বসাল শৌরীনের পিঠে।

—বুঝলে ?

এতক্ষণে তার সব কটি দাঁত বার করে হাসল হরমোহন।

হো হো করে হাসতে লাগল শৌরীন।

তার হাসির রেশ শেষ হওয়ার আগেই উঠে দাঁড়িয়ে মক্কীরানীর লিলিপুট বলল, আমি তা হলে চলি আজ।

—সেকি, কেন এসেছিলে বললে না তো, চিত্রা আগ্রহ দেখাল।

—বলবো ?

—নিশ্চয়ই বলবে।

—আপনারা যদি হাসেন।

—না। না। হাসবো না। বলো।

—বলছিলাম কি,—অর্ধপথে থেমে গেল সে।

—বারে, তুমি নিজেই তো হাসছো।

—বলছিলাম কি, আপনাদের বিয়ের দিন আমায় বলবেন।

এবার আর চিত্রা উত্তর দিল না। শৌরীন বলল, ও, এই কথা ? তোমার নেমন্তন্ন আজই রইল। আমি নিজে আবার তোমায় বলে আসবো।

—আচ্ছা, তাহলে আজ যাই বাবু।

এই বলে সে যাবার উদ্যোগ করতেই শৌরীন বলল, শোন, শোন—

—বলুন।

—বিয়ের কথা তো তুমি এখানে এসে শুনলে। সেই কথাটাই বলতে এসেছিলে যাদে ?

শৌরীনই সহজ করে দিল। বলল, তোমার জন্ত কোন কথা ছিল। চেপে যাচ্ছ কেন বাপু?

—কথা একটা ছিল, কোনমতে বলল সে।

—তা বলো তোমার কথা।

—কথাটা দিদিমণির কাছে।

—ওহ্, গো, তোমারও দেখি প্রাইভেট কথা। আচ্ছা চিত্রা, এই শহরের সবাই কি তোমার সঙ্গে কানে কানে কথা বলে?

—শৌরীন।

—কি হলো, আমি কি মিথ্যে বলেছি? বেশতো, একেই জিগ্যেস করো না। কি হে এঁর সঙ্গে প্রাইভেট কথা আছে না?

—পাইরেট?

—দেখেছো, এ ঠিক কেরার রায়ে তোমার সোনার রোল দেখেছে। 'কারতালো' আর পাইরেট গুলিয়ে ফেলেছে বোধ হয়। সত্যি চিত্রা, সোনার পার্টে তোমায় একেবারে সোনার প্রতিমার মত দেখায়। তাই না হরমোহন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—দেখেছো তো, লোকটা একগাল হাসছে।

চাপা গলায় আবার ফুঁসে উঠল চিত্রা, ছিঃ। ছোট। তুমি খুব ছোট শৌরীন।

হাসতে হাসতে শৌরীন বলল, কোনটা? আমি খুব ছোট লোক? না আমি খুব ছুটি?

কোনমতে একটু থামি হাসল চিত্রা।

—দেখলে তো। কত সহজে তোমায় রাগানো যায়। আমি তো ভাবছিলুম এই বুঝি আমায় সন্দেহ বাতিক নিয়ে ধমক কিম্বা বক্তৃতা দাও।

বলতে বলতে শৌরীন আবার হাসল।

এই ভাবে তার সামনেই চিত্রা আর শৌরীন তাদের জীবনের ভিতরের তুফানের বেটা চাপা পড়ে আছে তার ডালাটা একটু খুলেই আবার বন্ধ করে দিল। দু'জনেই হাসছে।

চিত্রা বললো, কই, বলো হরমোহন।

বললো হরমোহন। বলার আগে পর্যন্ত জানত না যে এই কথাটাই সে বলবে। এই কথাটাই মাঝার মধ্যে ঘুরিয়ে যাবে। এবার আর কোন ভূমিকা না করে অবলীলায় বলল, আমার চাকরিটা পাকা করে দিতে পারেন কুম্পানীতে?

তোমার চাকরি আমি পাকা করবো কি করে?

জানেন দিদিমণি,

অর্ধপথে থেমে একবার সেই নিঃশব্দ হাসি হেসে বলল, আমি বেডিকেলে আনফিট হয়ে যাই। ওজনে খুব কম ছিলা। আপনার সঙ্গে তো অনেকের চেনা জানা আছে। যদি ডাক্তার বাবুকে আমার জন্তে একবার বলে যেন।

বার চারেক খেমে কথাটা বলল সে। বলা যাহুল্য কথা শেষ করে সে হাসল।

চরিতকার বন্ধুর বললেন, মক্ষীরাণী সেদিন তাকে চা খাওয়ার জন্ত বলেছিল। কিন্তু তা সে গ্রহণ করে নি। একটু ঘুরে যথাসাধ্য দেরি করে রাত সাড়ে নটা আন্দাজ সে গিয়েছিল যজ্ঞেশ্বর কাহারের বাড়িতে। কুটুম বাড়ী থেকে আসছে বলে সেখানেও তার কোন খাওয়া হয়নি। সারা রাত সে খালি পেটে পড়ে থাকল, কাহারের বাড়িতে। বলল, রাত তো অনেক হয়া, আজ আবার কোথায় যাবেগা, খুড়া ?

যজ্ঞেশ্বর বলল, হাঁ হাঁ, এহি সো যা। 'আরাম কর্'।

দাদার ঘরে থেকে বিতাড়িত, অভুক্ত হরমোহন সেদিন সারারাত এক পেট খিদে নিয়ে যজ্ঞেশ্বরের দাওয়ায় কাটিয়ে পরদিন আবার টুকটুক করে হেঁটে কারখানায় কাজ করতে গেল।

মক্ষীরাণী কোম্পানীর ডাক্তারকে চিনত কিনা, চিনলেও তার জন্ত সুপারিশ করেছিল কিনা তা আমরা জানি না। হয়তো করেছিল। হয়তো করে নি। কিন্তু এই ঘটনার সাতদিন পরেই চাকরি পাকা হলো হরমোহনের। কোরম্যানরা সকলেই তো পছন্দ করে এই মজার লোকটাকে। পাকা হওয়ায় মোনাস, কদি এই সব মিলিয়ে সপ্তাহে দশ টাকার মত বাড়ল তার। দাদাও তাকে আবার ডেকে নিয়ে গেল। হরমোহন বলল, ডাকবে না ? আমার যে ঘর এখন বাড়লো গো।

আড্ডাস্থ একজন বলল, ঠিকই বলেছে। বাংলা দেশের ছেলেরা পাত্র। হলেই বা সুইপার, আজকাল কারখানার লোকেদের বিয়ের বাজারের দাম বেশি, জানো ? চট করে দাও ওর বিয়ে।

চরিতকার বললেন, আহা, একটা বিয়ে তো বারো আনা লেগেই ছিলাম হে। হরমোহনের বিয়েটাও যথা সময়ে দিচ্ছি।

দু'জন এক সঙ্গে বলল, বিয়ে চাই। বিয়ে। হরমোহনের বিয়ে।

সমালোচক বাধা দিয়ে বলল, সৌরীন আর চিত্রার ব্যাপারটা তুমি বারো আনা সেরে রাখলে বটে তবে আকাশে মনে হচ্ছে ওদের বিয়ের আকাশে অনেক মেঘ জমে আছে। বিয়ের বাঁশী না বেজে হঠাৎ বাজও পড়তে পারে। ঠিক আছে, তুমি চালিয়ে যাও।

॥ চৌদ্দ ॥

চরিতকার বললেন, এখান থেকে এই উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের শুরু। ধরে নাও, প্রথম পাঠের নাম যদি হয় 'চাকরী স্থায়ী হওয়ার আগে', তাহলে এই পর্বের নাম 'চাকরী স্থায়ী হওয়ার পর।' আজ তোমাদের মুখে মুখে যা শোনাচ্ছি তাতো একটা খসড়া মাত্র। দিনের পর দিন কারখানার খুব কাছথেকে তাকে দেখে নানা গল্প করে, আর চারপাশের পরিচিত পাঁচজনের কাছে তার জীবনের নানা ঘটনার কথা শুনে তবে এই খসড়াটা খাড়া করছি। এমন কি এর জন্ত মক্ষীরাণীর বাড়ীতে সম্প্রতি বার দুই তিন গেছি।

—চিত্রার বাড়ীতে তুমিও গেছ ?

—সম্প্রতি।

—হলেই বা সম্প্রতি। গেছে তো। ব্যাপার কি ?

—এবার যে গল্পটায় অন্যরকম গন্ধ ছাড়ছে হে। এই নাও সিগারেট। ঝাঁ করে খুলে বলতো।

—বৎস, ধীরে। বল, বললেই তো আমি গল্পের শেষটা ছুঁয় করে বলে দিতে পারি না।

গল্পকর্তার চঙে খুশ হয়ে চরিতকার বললেন, বৈরব বরং চিতে মিলব মুরারী।

মাস দুয়েক পর একদিন সকাল দশটার সময় ডিপার্টমেন্টে তীষণ হৈ হৈ। হাসি, কথা, যেন কাজের মধ্যে ঢিলেমি এসে গিয়েছে। কি যেন এক মজা নিয়ে মেতে উঠেছে সবাই। কি ব্যাপার? হলো কি?

হরমোহনের সিক্ রিপোর্টটা লেখা হয়েছে বাংলায়। আবেদনকারীর বক্তব্য শুদ্ধ ইংরেজীতে লেখা বোধ হয় কারো ক্ষমতায় কুলোয়নি। তাই, আগাগোড়া লেখা বাংলায়। হরমোহন মুখে বলেছে। সেই কথা গুলোই কেউ লিখে দিয়ে থাকবে। দরখাস্তটা এই—

মাননীয় মহাশয়,

অধীনের বিনীত নিবেদন এই যে, আমি এইমাত্র জানিতে পারিলাম যে আজই আমার বিবাহ। সে কারণ আমি নিতান্তই অসুস্থ বোধ করিতেছি। শরীর এত অসুস্থ হইয়াছে যে আমার ভয় হয়, আমি হয়তো দ্বিতীয়ার্ধে, অর্থাৎ বেলা একটার পর আজ আর কাজে আসিতে পারিব না। অসুস্থতার জন্য এই অনুপস্থিতি আপনি নিজগুণে মার্জনা করিবেন ও আজকের এই অর্ধদিবস আমার 'সিক্‌লিভ' দিবেন। আরও একটি প্রার্থনা আছে। আগামী কাল ও পরশু এই দুই দিন অনুগ্রহ করিয়া আমায় ছুটি মঞ্জুর করিবেন। কেন না বিবাহের কারণে দুই দিন ছুটি না পাইলে মারা যাইব।

ইতি। আপনার বিশ্বস্ত হরমোহন ঘোষ।

বাঁকা বাঁকা কাঁচা অক্ষরে নাম সই করেছে। বলা বাহুল্য বাংলায়। ডিপার্টমেন্টাল ম্যানেজারের টেবিলে দরখাস্তখানা পড়ে আছে স্বচক্ষে দেখলাম। ভাবলাম, ওর দাদাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি ব্যাপারটা কি।

যতীন্দ্র ঘোষকে বললাম, চারদিকে হৈ হৈ। হরমোহনের কি সত্যি বিয়ে নাকি?

—আর বলবেন না। ওর বিয়ে দিচ্ছি।

সুপুরি খাওয়ার জন্য হোক বা অন্য যে কোন কারণে যতীন্দ্র ঘোষের ঠোঁটের দুইপ্রান্ত ক্ষয়ে, হাসা হওয়ার মত শাদা হয়ে গেছে।

আমি বললাম, এটা কি ভালো হচ্ছে? এই তো সবে পার্মানেন্ট হলো। তা ছাড়া হঠাৎ ক' ঘন্টার মধ্যে বিয়েই বা ঠিক হয় কি করে?

ব্যাপারটা শোনা গেল। আজ নাকি বিয়ের লগ্ন আছে। আর এই লগ্নে কাছাকাছি রিফুজী কলোনীর এক বাপ তার এক মেয়ের বিয়ের আয়োজন করেছে। এক মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করলে হবে কি, তার পরের মেয়েটি গলার কাঁটা হয়ে ঝুলছে। এই ভদ্রলোক পাড়া প্রতিবেশীদের দু'পাঁচ জনকে বলেছে, যদি এই লগ্নে এই মেয়েটাকেও দিতে পারতুম, তা হলে মন শান্ত হতো। এই উদ্বাস্তু কলোনী থেকে কয়েকজন কারখানায় কাজ করতে আসে। তারা কথা দিয়েছে যে, দ্বিতীয়টির জন্য আজ সন্ধ্যার লগ্নে পাত্র আনার তারা খুব চেষ্টা করবে। উদ্যোগ করে তারা কোমর বেঁধে লেগেছে। চাকরি করে, দু'বেলা দু'মুঠো ভাত মেয়েটাকে দিতে পারবে এমন পাত্র পেলেই হলো। হরমোহনের আগে ওরা তিন জনকে ধরেছে। তারা তো আর হরমোহন নয়। সবাই 'না' করেছে স্পষ্ট। কেবল হরমোহন বলেছে, তোমরা বাবাকে বলো।

—আর আপনি রাজী হয়ে গেলেন -

আমি মণীন্দ্র ঘোষকে জিজ্ঞাসা করলাম।

—পাঁচ জনে ধরেছে, কি করি বলুন। এতগুলো লোকের কথা তো আর ঠেলতে পারি না।

ভালো। হবেও বা। মনে মনে ভাবলাম।

মণীন্দ্র ঘোষ আরও বলল, তা ছাড়া কি জানেন, ভাইএর বিয়ে না দিলে আমার কর্তব্য থাকে না। মেয়ের বাপ যদি একশো টাকা দেয়, তা হলে আর আমি 'না' করবো না। দেখি। বিয়ে হলে তো আজই হবে। আর পাকা দেখা, দেনা পাওনা সব আজ হবে। তা ছাড়া দশ পনেরো জন লোকও তো যাবে বিয়ে দিতে।

আমার দিকে চেয়ে মণীন্দ্র ঘোষ বলল, আপনিও চলুন না।

—মাপ করুন ভাই। আমার অনেক কাজ আছে।

হরমোহনের বিয়ে - তা হলে সত্যিই হচ্ছে। আজই। মনে মনে শিউরে উঠলাম। এখনো লোকটা কোয়ার্টার পায় নি। নিজে রান্নাঘরে রাত কাটায়। ওর বউকে নিয়ে হয়তো ওখানেই শোবে। ওই তো দাদা। ওই তো বউদি। কবে দেব তাড়িয়ে ঘর থেকে। পাঁচভূতে মেয়েটাকে ছিঁড়বে আর কি!

হরমোহন ছুটি নিলে। তার দাদাও। নেমন্তন্ন হয় নি তখনো কারোই। পাকা কথা হওয়ার পর, বিকেলে এসে মণীন্দ্র বিশেষ দশ পনেরো জনকে বলে যাবে। কিন্তু নিমন্ত্রণ না হলেও আরো জন দশ সিক রিপোর্ট করে ডুব মেরে দিল। তারা হবু বর ও বরকর্তার পিছু পিছু গিয়ে ঘটনার আগাগোড়া বিস্তারিত ভাবে দেখতে চায়। বিশেষ, বিয়েটা যখন 'দায়ে পড়ে' এর। কেবলমাত্র একজনকে হবু বর নিজে চুপি চুপি বলেছিল, তুমিও আমার সঙ্গে চলো ঘুড়ো। সিক্ লাগাও।

—'ঘরে বিবাহে চলিলা ত্রিলোচন
তার কত শত ছিল আয়োজন……'

চুল ছাঁটা হলো। ঘাড় চেঁছে উঠে গেল মাথার অর্ধেক পর্যন্ত। গোটা মুখে ক্ষুর বুলোনো হল। ওরই মধ্যে পরিষ্কার একটা জামা চড়িয়ে পায়ে জুতো দিয়ে চলল হরমোহন। বরের চেয়ে বরকর্তার সাজটাই চোখে লাগছে বেশী। মণীন্দ্র ঘোষ তার বহুদিনের পুরোনো সিল্কের পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়েছে। দশ বারো জন যারা জুটেছে, তারা চলেছে ওদের পিছে।

কনের বাড়ি পৌঁছে ওরা কাছাকাছি একটা বাড়িতে বসলো। ব্যবস্থা কনের বাবাই করেছিল। একটু পরেই বরের দাদাকে কনের বাপ পরম সমাদর করে ডেকে নিয়ে গেল পাকা দেখা আর পাকা কথা সারতে। সেই অবসরে বরকে ঘিরে ধরা অনাহূত কিন্তু আগত বয়স্ত্রীর দল বলল, একটা গান শোনা হরমোহন।

—গান?

—হ্যাঁরে, বিয়ের আগে গাইতে হয়।

আর বলতে হলো না। কোন্ আদিকালে গ্রামের যাত্রা দলের কাছে ছেলেবেলার স্বাভাবিক কৌতূহলে ঘুর ঘুর করে ও তুলে নিয়েছিল একখানা গান। সেই যাত্রাদলের সখিদের চেয়েও মর্মান্তিক গলায় ও সুরে ও ধরল, 'যমুনা পুলিনে, বিজনে বিপিনে, কাঁদে রাধা বিরহিনী।'

—জোরে গা। কনে শুনছে।

সে আরো জোরে চেঁচাতে লাগল।

ইহার সকলীদের কেউ একজন বাইরে থেকে এলো টুকটুকে লাল এক ছোট্ট গোলাপ নিয়ে। বয়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এটা রাখ রে।

—কি হবে?

—রাখ না, রাখ। রাখতে হয়।

একজন উৎসাহভরে সেই ফুলটা নিয়ে ওর কানে গুঁজে দিল। হাসল হরমোহন।

চরিতকার বললেন, বারবার আমি গল্পের মাঝখানে নিজের কথা জুড়ে বাধা দিচ্ছি বলে, আমার নিজেরই খারাপ লাগছে। এই গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি নিজেই নানা দিক থেকে এসে গেছি বলেই এমনটা হচ্ছে। একবার হরমোহন আমায় এক গল্প শুনিয়েছিল।

অসুস্থ একজন অধৈর্য হয়ে বলল, কত আর ওকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে বাবা? বিয়ে কিংবা—ওর নাম কি—ভালোবাসা, কোনটা যে হয়েও হয় না। যে কোনটা শেষ করো আগে।

—আমি কি আর ইচ্ছে করে ওকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছি? ওর জীবনের কথা যথাসাধ্য যথাযথ করে তোমাদের শোনাচ্ছি বলেই তোমাদের ধৈর্য থাকছে না। দেখো, সত্যকে অবিশ্বাস করাই সবচেয়ে সহজ। কেননা তার মত আশ্চর্য আর কিছুই নেই। শোনই না, হরমোহনের শোনানো গল্পটা। হয়তো তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। নাকি হে, সমালোচক?

—শুরুন বাবু, কলুর ছেলের গল্প।

—কলুর ছেলের গল্প?

—হ্যাঁ বাবু।

এক দেশে এক রাজা ছিল। সেই রাজার অনেক জমি, অনেক টাকা, অনেক সব কিছু। সেই রাজারই এক গাঁয়ে এক কলু ছিল। সেই কলুর ঘরে ঘানি ছিল, আর বলদে ঘানি টানত। কলুর বড় ছেলের বয়স ছিল সতেরো। সে ঘানির কাঠের ওপর 'চিৎপটাং' হয়ে শুয়ে শুয়ে গান গাইত। একদিন রাজার হাতি চলেছে, রাজা চলেছেন, সেই গ্রামের কলুর বাড়ির কাছ দিয়ে। রাজা বললেন, 'কে গান গায়'?

সবাই বললে, কলুর ছেলে।

রাজা বললেন, বেশ বেশ।

পরদিন হুকুম এলো ছেলেকে নিয়ে কলুকে রাজসভায় যেতে হবে। রাজামশায় গান শুনবেন। সবাই বললে, কলুর ভাগ্য ফিরলো।

রাজসভার সাজানো আসনে বাপ আর বেটা বসল। রাজা বললেন, গান করো।

গাইতে গিয়ে মুখ দিয়ে আর আওয়াজ বার হয় না। মুখে যেন কুলুপ পড়েছে।

—কই, গা, বাপ বললো।

—কি হল রে, জানতে চাইল সভার লোকেরা।

—গান করো। ভয় কি? রাজা বললেন।

ভ্যাঁ করে আওয়াজ বার হলো। গান নয়। কাঁদছে। তাই দেখে তার বাপ তাকে এই মারে তো সেই মারে। রাজা মশায় তাকে কাছে ডেকে আদর করে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে রে?

কলুর ছেলে বলল, হুজুর আমি ঘানির ওপর না হলে গাইতে পারি না।

হরমোহন বলল, তাই বলছিলুম কি বাবু, আপনি হলেন সেই রাজার মত অনেকটা।

আমি বললাম, রাম কহো। কোথায় রাজা আর কোথায় আমি? কি কথার কি উত্তর। তোমার কাছে জানতে চাইলাম সবাই তোমায় বিয়ে নিয়ে খেপায় কেন? তোমার কি বিয়ে করার খুব ইচ্ছে?

—বোঝলেন না?

—না বাপু। বুঝিনি।

—দেখুন বাবু, চাকরি যতক্ষণ করি বিয়ের কথা আমার মনে থাকে না। কিন্তু বাড়ি ফিরে গেলেই মন ছুঁক ছুঁক করে। বাঁচতে হলে চাকরি করতে হবে। চাকরি করলে বাড়ি যেতে হবে। বাড়ি গেলে এই সব মনে পড়বে। ওই জন্যই ভাবি, শালা বিয়ে একটি করেই ফেলি। মাপ করবেন ফস্ করে 'শালা' বার হয়ে গেল।

কথা শেষ হওয়ার আগেই হাসিতে তার দাঁত বার হয়ে পড়েছে।

চরিতকার বললেন, আবার আমরা পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই। সিকুরিগোট করে হরমোহন যাবার পিছু পিছু গেল কনের বাড়ি। সেখানে গান ধরল। বিয়ে কিন্তু হলো না। তার দাদা যতীন্দ্র ঘোষ বলে, ভাইএর বিয়েতে দাবি বলতে সে একশো টাকাই তো চেয়েছিল। মেয়ের বাপের মুখের কথা যদি মিষ্টি হত, তাহলে এক পয়সা না নিয়েও ভাইএর বিয়ে সে এখানেই দিত। কিন্তু মুখের কথা আর ব্যাভার যার ভালো নয়, তেমন লোককে সে কুটুম করবে না।

কিন্তু যেচ্ছায় যারা বর আর বরকর্তার পিছু পিছু গিয়েছিল তারা অন্য কথা বলে। তারা বলে—

সেই পুরোনো কথা আর কি। পাত্রের খুঁত নিয়ে ব্যাপার।

পরদিন নিজের সেই হাসিটি নিয়ে যথাসময়ে কারখানায় হাজিরা দিল হরমোহন। সে বিয়ে করতে যাওয়ায় যত হল্লা হয়েছিল, পরদিন আবার ডিউটি আসায় হল্লা হল তার চেয়েও বেশি। বিয়ে করতে যাওয়ার সময় সে হেসেছিল। বিয়ে বাতিল হবার পরও কারখানাতে এসেও হাসছে। একই হাসি। হাসিটা যথারীতি ছড়িয়ে গেছে চোখ থেকে দাঁতে।

॥ পনেরো ॥

চরিতকার আবার শুরু করার আগে আমাদের আড্ডা ঘরে একটি ছেলে এলো। ছেলেটির বয়স বছর চৌদ্দ। সে ঘরে ঢোকা মাত্র চরিতকার বললেন, আরে বেবু যে। এখানে? কি ব্যাপার?

—দিদি আমায় আপনার কাছে পাঠালেন। একবার চলুন।

—এ জায়গাটা তুমি জানলে কি করে? বসো।

বেবু বসল। বসে বলল, আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। আপনার ভাই বলল, আপনি এখানে আছেন। রাস্তা জেনে নিলাম।

—আর তুমি এখানেই চলে এলে?

—দিদি বলেছে, আপনাকে খুঁজে আনতে। চলুন।

এই বলে বেবু দাঁড়াল।

যাবার আগে বেবু আবার বলল, ঠিক যাবেন।

আচ্ছার সকলে চোখ কুঁচকে বসেছিল। চলে যেতেই চেপে ধরল চরিতকারকে। বলল, বেবু কে হে? চিত্রার ভাই নাকি?

—হ্যাঁ।

আরো নানা প্রশ্ন ঠেলে এলো।

চরিতকার বললেন, ওসব পরে হবে। সব কথার উত্তর একটু পরেই দিচ্ছি। তার আগে হরমোহন ঘোষের এ'জন্মের ইতিহাসের খসড়াটা আমায় পেশ করতে দাও।

তার বিয়ে নিয়ে এই তামাশা আর হৈ হৈ এর মাস দেড়েক পরেই মণীন্দ্র ঘোষের বউ মারা গেল। হরমোহনের বৌদি। মৃত্যু সম্বন্ধে তোমাদের কার কি রকম অভিজ্ঞতা আছে জানি না। বলা বাহুল্য সেই স্ত্রীলোকটি অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সেদিন ওভারটাইম সেরে রাত দশটায় বাড়ি এসেছিল মণীন্দ্র। এসে দেখল বউ তার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মেঝেয় ঘুমোচ্ছে। এক বস্ত্রে শুয়ে আছে সে। বারান্দায় ঘুমন্ত হরমোহন। কাঠের জোড়াতালি দেওয়া বারান্দার দরজাটা ভেজান।

মণীন্দ্র সামান্য খেয়ে এসেছিল। ঠেলে তুলল বউকে। বলল, ঘুমোচ্ছিস?

—হ্যাঁ।

—ওরে আবার মোহাগী রে। আমি ব্যাটা খেটে মরছি আর উনি দরজা খুলে রেখে ঘুমোচ্ছেন। দরজা বন্ধ করে শুতে পারিস না?

বউ কোন উত্তর দিল না। তাতে তার রাগ আরো চড়ে গেল। বলল, কি, কথা বলছিস না যে।

কথা বলল তার বউ। বলল, দরজা বন্ধ করলে তো বলতে দরজা বন্ধ করে শুয়েছি কেন? ঘরে দেওর আছে যে।

—তাই বলে রাত্তির শুদ্ধু লোকের জন্যে দরজা খুলে শুবি?

এ'কথার কোন উত্তর না দিয়ে তার বউ হাতের শাখাটা কপালে ঠুকে ঘট্ করে ভেঙে ফেলল।

—অ। আবার ভেঙ্গ দেখানো হচ্ছে।

তার বউ বলল, আর যদি বলবে তবে গায়ের কাপড় মেঝেয় নামিয়ে রেখে আমি সবার সামনে গিয়ে দাঁড়াব।

মণীন্দ্র আচমকা ঠাস্ করে চড় মারল তার গালে।

আর শোনায় মত হাল্কা পায়ে দাঁড়ান রক্তহীন স্ত্রীলোকটা টাল সামলাতে না পেরে ধপ্ করে মেঝেয় পড়ে গেল।

বাচ্চারা জেগে গেল। বারান্দায় হরমোহন। কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না। কোন শব্দই হলো না। হরমোহন দেখল তার বৌদি বাচ্চাকে খেতে দিল। নিজেও চারটি ভাত আর কি একটা তরকারি নিয়ে এক কোনে বসে হাতে করে খাওয়াতে লাগল।

তারপর বাবার ঘর যথারীতি অন্ধকার।

আধঘণ্টার মধ্যেই হয় তো আবার চোখের পাতা বুজে এসেছিল হরমোহনের। ঘুম আসার আগে পাতলা তন্দ্রার মধ্যে তার কানে গেল দাদা বলছে, এ-গুলো কি বার হচ্ছে কি? এ্যাঁ? চট চট করছে—

—কি হয়েছে কি? আবার বলল তার দাদা। তারপর ঘরের একমাত্র আলোটা জ্বালিয়ে দিল।

রক্ত!

প্রতি বেড় বছরে ছেলে বিয়োনী মণীন্দ্র ঘোষের রক্তহীন, থলথলে শরীরের বউর নাক থেকে রক্ত বার হচ্ছে। তেল চিটচিটে বালিশ বেয়ে মেঝের পাতা শতরঞ্জের ওপর পড়েছে। আর কিছু পরে হয় তো বা কুণ্ডলি পাকিয়ে মেঝের দিকে ঠেলে যাবে।

—হরা, হরা, শোন, শুনে যা—চীৎকার করে ডাকল দাদা।

বারান্দায় উঠে বসেছিল হরমোহন। দ্রুত ভেতরে গেল। বৌদি বার দুই তার বাঁ হাতের ছেলো দিয়ে মুখ মুছেচে। হাতের রক্ত মুছেচে বুকের আঁচলে। ওর চারটে বাচ্চা যে বুকের দুধ খেয়েছে কাপড়ে রক্ত লেগে, সরে, তারই খানিকটা অনাবৃত করে দিয়েছে। দেখে ভয়ংকর ঘাবড়ে গেল হরমোহন। 'বৌদি গো' বলে ডেকে সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

—এই হরা, কাঁদছিস কেন? মারব বেপে এক থাপ্পড়।

বাচ্চুর মত কান্না বন্ধ হয়ে গেল তার। কান্না থামিয়ে দাদাকে সন্তুষ্ট করে সে গম্ভীর হওয়ার ভাণ করল। কিন্তু সেটা যেখানে হাসির মত।

সে চুপ করার পরই তার দাদা মণীন্দ্র খানিকক্ষণ বোকার মত তার স্ত্রীর মুখের দিকে বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, আমার দিকে অমন করে দেখছো কেন বউ?

এই বলে সে ভাইএর দিকে চোখ তুলল। তার সমস্ত শরীর শীত লাগার মত কেঁপে উঠল। টপ্ টপ্ করে জল পড়ল তার চোখ বেয়ে। চারটি সন্তানের মধ্যে এখনো কোলেরটি মার পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আর তিন জন জেগে গেছে। কাকাকে কাঁদতে দেখে বাবা যখন বকল তখন তারাও ভয়ে সিটিয়ে গিয়েছিল। এখন বাবার চোখে জল দেখে তাদের কান্না আর বাধা মানল না। তারা পাড়া জাগিয়ে দিল।

কাউকে কিছু না বলে হরমোহন গেল বাইরে। তারপর মাঠে এখানে ওখানে ঘুরে সে খানিক ঘুমল। কোয়ার্টারে কারো জোর নেই যে টাটকা গোবর নিয়ে আসবে। 'এখন কি আর টাটকা থাকে'—বিড় বিড় করল সে। তবু ওরই মধ্যে বেছে সে খানিকটা তুলে নিল।

ইতিমধ্যে মণীন্দ্র ঘোষের ঘরে দু'চারজন জমা হয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে হাতের গোবরটা বৌদির নাকের কাছে ধরতেই বৌদি নাকমুখ কুঁচকে হেঁচকি তোলার মত করে মাথাটা সামান্য বাঁকাল।

—ও-সব দিও না, পরামর্শ দিল কেউ।

অগত্যা হরমোহন হাতটা সরিয়ে নিল।

কারখানা শহর থেকে অনেক দূরে। এক প্রান্তে। মূল শহর সেখান থেকে অন্তত বারো মাইল। কাছাকাছি দু'একটা কোলিয়ারীতে দু'একজন ডাক্তার আছে। পায়ে হেঁটে গিয়ে তাদের ডেকে আনতে কিছু না হোক দু'ঘণ্টা। রাত্রিবেলায় গাড়ি ঘোড়া নেই। কারখানায় গিয়ে বলতেই টাইম বাবু টেলিফোনের বই দেখে শহরের কিছু না হোক এক ডজন ডাক্তারকে ডাকাডাকি করল। কিন্তু কেউ আসতে রাজী হল না। কোন ঝামেলাই না অনেকে।

এত দুঃখের মধ্যেও হরমোহনের হঠাৎ একবার মনে হল যে মিত্তিরদের বাড়িতে যদি টেলিফোন থাকত আর তাকে যদি খবর দেওয়া হতো তাহলে সে একজন ডাক্তারকে পাঠাত নিশ্চয়ই।

সময় নেই। একেবারেই নেই সময়। বাচ্চাগুলোর কান্না থামানোর জন্য সে বৌদির উঁড়োর খুঁজে দু'জনের হাতে খানিকটা করে গুড় দিয়েছে। বড়টাকেও দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সে নেয় নি। এগিয়ে এসে মার গা লেপ্‌টে ছেলেটা বসেছে। মা তার পিঠে হাত বুলোচ্ছে। চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়ছে মা'র। আর ছেলেটা মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে উঠছে।

কান্না যেন উদ্যোগ করে গিয়ে কোলিয়ারির একজন ডাক্তারকে ডেকে এনেছিল বটে। কিন্তু তখন রোগের সলতের শেষটুকু পুড়ে গলানো রোগের ওপর শিখাটুকু খাবি খাচ্ছে।

ভোর হওয়ার আগেই ওরা ফুওনা হয়ে গেল। খাট খরচ বলতে মণীন্দ্রর বউর বিশেষ কিছু লাগল না। কোম্পানির ট্রাক পাওয়া গেল। কাঠও। কিনতে হলো কেরোসিন তেল খানিকটা। কলসী। আর টুকি টাকি সামান্য কিছু। কোয়ার্টার পাড়ায় যারা থাকে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ল যাত্রা করার আগে। বিশেষত বউরা। মাথায় সেপা সিঁদুর আর মশ্‌মশে আলতা থেকে তারা সতীর ছোয়া সংগ্রহ করে নিল। পায়ের একটা ছাপ লাগিয়ে দিল ঘরের দেওয়ালে। মণীন্দ্রর সঙ্গে তার নিজের বলতে গেল তার বড় ছেলে। মা'র মুখে আগুন দেবে। হরমোহন রইল আর তিন জনকে নিয়ে।

দিন চলতে লাগল। ছেলেগুলো মাথা কামাল। মাঝে মাঝে ওরা ঘরের দেওয়ালে পায়ের ছাপটাকে ঘিরে কলরব করে। বলে 'আমাদের মায়ের পা'। মণীন্দ্র দু'চারদিন উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াল। তাই বলে কাজ কামাই করল না বেশিদিন। তিনদিনের দিন কারখানায় গিয়ে বিশেষত বাবুদের সামনা সামনি হলেই বলল, খবর শুনেছেন?

—কি খবর?

—শোনেন নি?

—ওঃ। হ্যাঁ, সত্যি খুব দুঃখের ব্যাপার। কি আর করবে ভাই, জীবনে শোক, দুঃখ আছে। .....ইত্যাদি।

দিন ডেকে আনে আর এক দিনকে। হরমোহন হয়ে উঠল ওদের মা। বড়টাই যা একটু ডাগর হয়েছে। অন্য তিনটে তো নেহাতই বাচ্চা। কোলেরটা এখনো দুধ ছাড়ে নি। এই চারজনকে সামলানো কি কম কথা? তাদের খাওয়া দাওয়া থেকে ময়লা পরিষ্কার করা পর্যন্ত রাজ্যের হাজারো কাজ সেই তাকে করতে হয়। তাই বলে কারখানা কামাই করতে পারে না সে-ও। কখন যে রান্না করে আর কখন যা খায়, তা সে কেবল সে-ই জানে। তবু কারখানায় আসে। কোলের বাচ্চাটার জন্যে মন আঁকু পাঁকু করে। কিন্তু উপায় কি?

পনেরো দিনের মাথায় একজন ঠিকে কি খুঁজে আনা হলো। ঠিক কি নয়। কিন্তু কি ছাড়া চলে কি! বছর তিরিশ বয়স। বাঙালী ঘরের বিধবা। সে সকালে এসে ঘর ঝোর পাক, রান্না এই সব কাজ জন্যে বেলা দুটো পর্যন্ত থাকবে ঠিক হলো। বিকালের দিকে সব কাজের ভার হরমোহনের।

কারখানার দু'একজন বলল, বিয়েটা যদি করে ফেলতিস হরমোহন, তাহলে এমন আর কি ঝামেলা হতো না। সেই চালাত।

—সে তো ঠিকই। কিন্তু কি করবো? অদৃষ্ট!

এই বলে সে আকাশের দিকে আঙুল তোলে। হাসিটা অনিবার্য ভাবে আপনি আসে।

হরমোহন দেখল যে বৌদি মারা গেছে বটে, তবু মেয়েমানুষের ওপর দাদার টান কমেনি। ঠিকানা বেলা ছুটোয় চলে যাওয়ার কথা সে তো একটা গোটা রাত থেকেই গেল।

হরমোহন বলল, ওকে তুমি বিয়ে করো দাদা।

—ওকে?

—হ্যাঁ। করো না?

—ওই বিধবাটাকে?

—তাতে কি হয়েছে? ওর পুরুষ ছিল। নেই। তোমারও তো তাই।

—পাঁচজনে কি বলবে?

—পাঁচজন তো আর তোমায় ঘর সামলাবে না।

—বিয়ে করলে অনেক খরচ।

—খরচ কেন করবো আমরা? এতো আর 'মচ্ছোব' নয়।

—তবে?

—পাঁচজনকে ডাকবো আমরা। তাদের সামনে তোমরা মালা বদল করবে। না হয় কাগজে লিখে নেবে। হবে বিয়ে।

—নারে সেটা ঠিক নয়।

চরিতকার বললেন, জীবনের অনেক জটিল ব্যাপারে হরমোহনের সিদ্ধান্ত এত সহজ। কিন্তু তার পরামর্শ মনে ধরল না মণীন্দ্রর। আবার ঘুটি ঘুটি টুক টুক করে দিন গেল ক'টা। তারপর আর একদিন হরমোহন সেই কথাটা তুলল। বলল, বলছিলাম কি—

—কি বল্।

—সেই যে আমার 'সম্বোন্ধো'টা এসেছিল, সেটা আর একবার দেখলে হয় না?

—কোন্‌টা?

কট-মটে চোখে তাকাল মণীন্দ্র। তার সেই চোখের দিকে চেয়ে একটু যেন চুপ্‌সে গেল তার ভাই। তবু কোনমতে বলল, সবাই বলছিল কিনা, তাই।

—কি বলছিলো সবাই?

—সেইখানেই আমার বিয়েটা—,

—বড্ড বিয়ের ভাবনা হয়েছে, না? চারটে ছেলে নিয়ে আমি শালা মাথার ঘামে কুকুর পাগল হয়েছি, খেঁকিয়ে উঠল মণীন্দ্র। তারপর কি মনে হলো গলা নামিয়ে বললো, কোন্‌খানে?

এইবার খিঁচিয়ে হেসে ফেলল হরমোহন।

বলল, সেই যে আমি সিক্ রিপোর্ট করে গেলাম। তুমিও গেলে। কারখানার বাবুরা তোমায় ডেকে বোঝাল। তারপর আমরা চলে এলাম। টাকায় কনের বাপ রাজী হলো না। তা বলছিলাম কি—

—কি?

—টাকাটা না হয় তুমি ছেড়ে দাও।

মণীন্দ্র বলল, মেয়ের বাপ তোকে পছন্দ করে নি। টাকা নয়। বুঝলি? ক্যাচ ক্যাচ করিস নি। যা।

রিহুজী কলোনীতে যে মেয়েটিকে বিয়ে করবে বলে সিকৃরিপোর্ট দিয়ে গিয়েছিল হরমোহন, বাপের গলায় কাঁটা যে মেয়েটি, বাপের গলা থেকে নেমে মণীন্দ্র ঘোষের দ্বিতীয় পক্ষ হয়ে এক কুঠরির কোয়ার্টারে এলো আড়াই মাসের মাথায়।

চারটিছেলেকে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নতুন বউর মেওর বললে, বৌদি এদের তুমি দেখো। এদের তো মা ছিল না।

এই বলে সে হাসল। হাসিটা মধুরীতি ছড়িয়ে গেল চোখ থেকে দাঁতে।

মণীন্দ্র ঘোষের মনটা ভালো ছিল। সে বলল, আর আমার এই ভাইটাকেও ঘর কোরো।

হরমোহন তখনো হাসছে।

কে একজন বলল, হ্যাঁরে, তোর বৌদিকে প্রণাম করলি না?

নতুন বউ সব জানত। মাথার ঘাটো এই লোকটা তার পায়ে হাত রাখতেই সে তোলমতে বলল, থাক্ থাক্।

মেয় মেয়েটা তাদের নতুন মার হাত ধরে টানতে টানতে বলল, এই ভাখো। আমাদের মায়ের পায়ের ছাপ।

॥ ষোলো ॥

আড্ডার সমালোচক বন্ধু উৎসুক হয়ে বলল, তার পর?

—তারপর বলছি।

এই কথা বলে চরিতকার নতুন এক সিগারেট ধরিয়ে তাতে লম্বা টান দিলেন। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে শেষের দিকে কতকগুলো ধোঁয়ার আংটি করলেন। ঘরটায় খানিক গুমোট হওয়ার মত হয়েছে। নীরবতা। শ্রোতাদের সকলের মুখের দিকে চরিতকার আলাদা আলাদা করে চাইলেন।

—এই সব ঘটনার পর গয়ায় গিয়ে পিতৃপুরুষকে পিণ্ড দেওয়ার জন্যে হরমোহনের একটা ঝোঁক চাপল। এই কথাটাই সে অহরহ মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল। কারখানার কাজ করা আর মাথার বাসায় রাত কাটানোর মধ্যে এই পর্যায়ে এ ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

এই সময় একদিন টাইম অফিস থেকে ডিপার্টমেন্টে ফোন এলো যে হরমোহন ঘোষ যেন কারখানার গেটে একবার যায়, তাকে একজন ভদ্রলোক ডাকছেন।

তাকেও বাইরের লোক ডাকে?

হাতের যুকল এককোণে দাঁড় করিয়ে সে গেল গেটে।

খুব অবাক হল। হাসল। হাসিটা ছড়িয়ে গেল। সৌরীন। বলা বাহুল্য, হরমোহন সেলাম করতে গেল তাকে।

সেলাম সে প্রায় করেই ফেলেছে তবু শৌরীন তার হাতটা ধরে বলল, আরে, এসব আবার কি। এর পর তোমাকেই আমায় সেলাম করতে হবে।

হরমোহন মানে বুঝল না।

শৌরীন বলল, তোমায় একবার যেতে হবে।

—কোথায় ?

—আমার সঙ্গে।

—এখন ?

—এখুনি। চলো।

—আজি যে ডিউটি করছি।

—ছুটি নাও।

—ছুটি ?

—নাও না।

—যদি বিকেল যাই ?

—সে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

শৌরীন একবার হাসল। দেখল। তারপর বলল চাপা গলায়, চিত্রা তোমার ডেকে পাঠিয়েছে।

—কে ?

—চিত্রা।

—দিদিমণি ?

শৌরীনও একটু হাসল। বলল, হাঁ। চিত্রা।

—কেন ?

—সে তুমি ওখানে গিয়ে শুনবে।

—আচ্ছা দাঁড়ান। ছুটি নিয়ে আসি।

পা বাড়াল সে। পিছন থেকে শৌরীন ডাকল, শোন—

—বলুন।

—আমাদের সঙ্গে তোমায় এক জায়গায় যেতে হবে।

—কোথায় ?

—কলকাতা।

—কেন ?

—খুব কাজ আছে। আরে, ভালো কথা হরমোহন, তোমার তো 'ইয়ে' হয়নি, না ?

—কি ?

—বিয়ে ?

এই বাবাবাবুও তার বিয়ের কথা বলে। সে হেসে বলল, না।

শৌরীন বলল, যাও ছুটি নিয়ে এসো। তোমায় কলকাতায় দু'চারদিন থাকতে হবে। বাড়ির লোকেদের বলে যাও।

—কাউকে বলতে হবে না।

—এমনি চলে যাবে?

—হুঁ।

যেখানে ইচ্ছে, যখন ইচ্ছে চলে যেতে পারে এমনি একটা ভাব করে সে ছুটি আনতে গেল। সিক্ রিপোর্ট করলো সে। দরখাস্ত সেখাতে ছুটি মঞ্জুর করাতে তার লাগল আধ ঘণ্টার মতো। আর এই আধ ঘণ্টা শৌরীন অপেক্ষা করে রইল কারখানার গেটের বাইরে।

চরিত্রকার বললেন, শৌরীনকে আমি বার তিন দেখেছি। কিছু কিছু শুনেছি তার সম্পর্কে। ভেঙে পড়া মধ্যবিত্ত ঘরের পোড় খাওয়া ছেলে। কথার মধ্যে খুব চেক্‌নাই আছে। লোকের সঙ্গে চোখে মুখে কথা বলে। বর্তমান বয়স উনত্রিশের মতো। ছেলেবেলায় গানের গলা ছিল তার। ক্লাস এইট নাইন পড়ার সময় সিনেমার গানগুলো সে তুলতো। পাড়ার জলসায় সুযোগও পেয়েছিল দু'একবার। ভবিষ্যতে একজন আধুনিক সঙ্গীত শিল্পী হবার স্বপ্ন দেখতো সে কোনকালে। অনেকেই তো আছে। শিল্পীদের বিভিন্ন দলের সঙ্গে তার যোগাযোগটা সেই থেকেই পাকা। স্কুলের সিঁড়ি পার হতে পারেনি। ক্লাস নাইনে ইতি।

চরিত্রকার বললেন, যে ঘরটা তোমাদের আজ শোনাচ্ছি, যা নিয়ে বৃহৎ এক উপন্যাস লেখার কল্পনা আমার আছে, এই পরিকল্পনা যদি তখন থাকতো তাহলে সেদিন কারখানা গেটের বাইরে শৌরীন যখন হরমোহনের জন্য আধঘণ্টা অপেক্ষা করিয়ে তখন তাকে একবার দেখে আসতাম। সেই আধঘণ্টা তার মুখ চোখ যেমন দেখাচ্ছিল তার বর্ণনাটা তোমাদের তাহলে দিতে পারতাম।

—ছুটি নিয়ে বাইরে এলো হরমোহন। সে বলেছিল বটে কাউকে কিছু বলার নেই কিন্তু শৌরীনের সঙ্গে যাওয়ার আগে সে বলল, একবার ওদের দেখে আসি।

—কাদের?

—ছেলেমেয়েদের।

—মানে?

পাঁচজনের কাছে হরমোহন সম্পর্কে প্রচুর খোঁজ খবর সংগ্রহ করেছিল শৌরীন। পাঁচজনের কাছে যা জানতে চেয়েছিল, তা জানে। হরমোহনের কাছে আবার তা যেচে নিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। তবু যেন ছেলেমেয়েদের কথায় চমকে উঠলো সে।

হরমোহন বলল, আমার ছেলেগুলো। একবার দেখে আসি। কদিন কলকাতায় থাকবো তো!

দেখা করে আসতে আরো আধ ঘণ্টা গেল।

বাজারের দোকানে প্রচুর খাওয়ালো শৌরীন। নতুন জুতো, ধুতি, জামা, এইসব খাওয়ার ঘুরে তার বাপ মত কিনে দিল। হরমোহন বলল, আমার জন্যে কিনছেন? কেন?

—নাও না। তোমার লাগবে।

বাজারের একটা দোকানে তাকে দু'ঘণ্টার মত বসিয়ে রেখে কোথা থেকে যেন ঘুরে এলো শৌরীন। ঘুরে এসে বলল, চলো।

জুতো, জামা কাপড়ের পোটলাটা বগলে নিয়ে চলল হরমোহন।

ওরা এলো ষ্টেশনে।

হরমোহন বলল, দিদিমণি কোথায় ?

—আগের ট্রেনে গেছে। আমাদের দেরী হলো কিনা।

—দেরী তো আপনি করলেন।

হরমোহন জানতো না সেই ট্রেনেই ছিল চিত্রা। অন্য বগীতে।

চরিত্রকার আবার থামলেন। তারপর কপাল কুঁচকে এক কোণে চেয়ে রইলেন। তারপর প্রতিটি শব্দ ছেড়ে ছেড়ে বলে যেন এই দেওয়ালটার উদ্দেশ্যে জানতে চাইল, কলকাতায় পৌঁছোনোর পরের পর দিন চিত্রার সঙ্গে হরমোহনের রেজিষ্ট্রী বিয়ে হলো, এ'কথা কি তোমরা বিশ্বাস করবে ?

আড্ডা' ঝোপা মেরে গেছে। চরিত্রকার আপন মনে বললেন, রেজিষ্ট্রীর সময় সৌরীন সেখানে ছিল। আর তিনজন যারা ছিল হরমোহন তাদের চেনে না। বিয়ের পর ওরা বর কনেকে একটা চাকা ফিটনে তুলে দিয়ে বলল, আমরা গাড়ীতে যাচ্ছি।

বিয়ে হল সকাল এগারোটায়। গড়পারে যে বস্তীর মত ঘরে ওরা উঠেছিল সেখানে পৌঁছল পৌনে বারোটায়। পৌঁছে দেখল সৌরীন আর তার সঙ্গীরা সব আগেই এসেছে।

পথে ফিটনে হরমোহন তার বৌকে একটি মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। বলেছিল, তোমার ছেলে পুলে হবে। না ?

—উঃ, এই বলে বুকের ওপর দুই হাতের পাতা রেখে কুঁকড়ে গিয়েছিল চিত্রা।

হরমোহন বললো, তার কোন রোগ হবে না তো ?

—কার ?

—ছেলেটার। কানা কিম্বা অন্ধ হবে না তো ?

আড্ডা'র সমালোচকের জিব হিস্ হিস্ করছিল কোন প্রশ্ন করার জন্য। তার আগেই চরিত্রকার বললেন, আমি তোমাদের মোটামুটি গল্পটা বলেছি। কিন্তু কোন সময় ঘটনাটা ঘটলো তা বলিনি। যেদিন হরমোহন বিয়ে হয় সেদিন কলকাতায় বাস আন্দোলন—

বাস আন্দোলনের কথা তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে। সেই আন্দোলন সেদিন চরম পর্যায় পৌঁছেছে। বেলা একটার সময় হরমোহন গড়পার থেকে বার হলো কলকাতায় একটু বেড়াবে বলে। ধর্মতলায় এসে যখন পৌঁছল তখন সেখানে লোক লোকারণ্য। সভা হচ্ছে একটু আগেই। প্রথমে সে এর ওর শরীরের ফাঁক দিয়ে 'ব্যাপার কি' দেখার জন্য উঁকি দিল। যেমন দিয়েছিল প্রথম দিন রিহার্সল দেখতে গিয়ে। তারপর দেখতে দেখতে সে এসে গেল সভার আগের দিকে। তারপর লোকের চাপ, ঠেলা ঠেলিতে পৌঁছে গেল বিক্ষোভ মিছিলের আগায়।

ঠিক এই সময় দেবু আবার এলো। বোঝা যায় যে সে খানিকটা দৌড়ে এসেছে। ঘরে পৌঁছে সে তার হাঁপ গোপন করার খুব চেষ্টা করল।

—কি হলো দেবু ? আবার এলে যে—

সঙ্কুচিত কণ্ঠে দেবু জানাল, দিদি আবার পাঠাল।

—তুমি এগিয়ে যাও। আমি আসছি। মিছিমিছি কষ্ট করে ডাকতে এসো না। আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

দেবু বার হয়ে গেল আবার।

ছেলেটি সত্যই চলে গেল কিনা দেখার জন্য চরিত্রকার উঠে দরজার কাছ পর্যন্ত গেলেন। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, একবার ঘুরেই আসি ওদের বাড়ী থেকে। বুঝলে? কেন যাই জান? সৌরীন আজকাল স্কুলেও চিত্রার কাছে আসে না। তাতে কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এ্যামেচার ক্লাবের বিভিরোল সৌরীন এখন লীনা, পলি, বেবিকে সেবে খবর দিয়ে আসে। কোলে ছেলে নিয়ে উপার্জন বন্ধ হলে খেতোয়ার চলে কি করে? আমি তাই চেষ্টা করি সৌখীন দলে ওকেও দু'চারটে পার্ট জোগাড় করে দিতে। তাছাড়া চিত্রাকে নিয়েও উপন্যাস লেখার আমার খুব ইচ্ছে আছে। হরমোহনকে যেমন খুঁড়ে খুঁড়ে উপকরণ সংগ্রহ করেছি। ওর কাছ থেকেও পরোক্ষ ভাবে তাই করার ভরসা রাখি। কাজটা অবশ্য শক্ত। তবে দারুণ ঘা খেয়েছে তো মেয়েটা! তাই একটু একটু করে চিত্রাকেও চিনতে পারছি। অসহায়ের মত ও খানিকটা আমার ওপর নির্ভর করছে। এবার ভাইফোঁটার দেরুর আগে আমার ফোঁটা দিয়ে প্রণাম করেছিল। এই সব কারণেই যাওয়া। তা ছাড়া—

—তা ছাড়া কি?

সমালোচক জানতে চাইল।

অত্যন্ত নির্বিকার ভাবে—হরমোহন যেমন নির্লিপ্ত ছিল, বিকারহীন ছিল বা যে কোন অবস্থায় যে কোন কথা বলার সময় যেমন উত্তাপহীন ছিল অনেকটা সেই ভঙ্গীতে—চরিত্রকার বললেন, হরমোহনকে সনাক্ত তার স্ত্রীই করেছিল। গুলী খেয়ে রাজপথে লুটিয়ে পড়ার পর তার শেষ হাসিটা যথারীতি চোখ থেকে দাঁতে ছড়িয়ে গিয়েছিল কিনা এ'কথাটা বহুবার জিজ্ঞাসা করবো করবো করেও কোনদিন বলতে পারিনি। একদিন তা-ও জেনে নিতে হবে।

চরিত্রকার চলে গেলেন।

যে মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারেনি, যে মেয়ের লোকবল, অর্থবল, সামাজিক প্রতিষ্ঠা কিছুই নেই একটা বাতিল হওয়া খেলনার মত যাকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, আবার যাকে এ্যামেচার ক্লাবের জোরে ঘোরে ঘুরতে হচ্ছে সেই চিত্রার কাহিনীটা আর শোনা হলো না। বোধহয় চরিত্রকারের উপন্যাসে তা এক সম্পূর্ণ রূপ নেবে।

অত্যন্ত বেখাপ্পা ভাবে আমার কেবল একটি কথা মনে পড়ে গেল। সেই অনেকদিন আগে, কোন এক কারখানায় বিশ্বকর্মা পূজোর থিয়েটারের মহড়া ঘরে চিত্রাকে ঘিরে থাকা উৎসাহী জটলার কাছাকাছি এসে সে বলেছিল, উনি কি বিধবা?

কি আশ্চর্য। সরাসরি না হলেও চিত্রার সঙ্গে এই তার প্রথম কথা। এই তার প্রথম কৌতূহল।

সমাপ্ত

অমৃত কথা ও কাহিনী

শঙ্করাচার্যের কাহিনী

গঙ্গাতীরে যাইবার পথে একদিন শংকর এক চণ্ডালের সম্মুখীন হইলেন। চণ্ডাল চারিটি কুকুর লইয়া মাতাল অবস্থায় পথ জুড়িয়া আসিতেছিল। কুকুর ও চণ্ডালের স্পর্শভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া শংকর পথের একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া চণ্ডালকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু চণ্ডাল পূর্ববৎ চলিতে চলিতে বেদান্তের তত্ত্বতত্ত্ব বলিতে লাগিল। সে বলিল, 'কে কাহাকে স্পর্শ করিবে? এক বই দুই বস্তু কোথায়? তুমি কাহার স্পর্শভয়ে সঙ্কুচিত হইতেছ? আত্মা তো কাহাকেও স্পর্শ করেন না; তাঁকেও কেহ স্পর্শ করিতে পারে না।' চণ্ডালের মুখে এইরূপ জ্ঞানের কথা শুনিয়া, শংকর, অদ্বৈতবোধ ও তাঁহার ব্যবহারের অসংগতি লক্ষ্য করিয়া, লজ্জিত হইলেন। তিনি গুরুজ্ঞানে চণ্ডালের চরণে প্রণত হইলে সে রক্ত-গিরিনিভ শ্বেতকায় সদাশিবের রূপ ধারণ করিল। শংকরের দৃষ্টি শিবের উপর পতিত হইবামাত্র তিনি সমস্ত জগৎ শিবময় দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, জগতের সবই চৈতন্যময়, জড় কিছুই নাই; যেমন কুণ্ডল বলয় প্রভৃতি এক স্বর্ণের দ্বারা নির্মিত, ঠিক তেমনই এক চৈতন্যে সৃষ্টির সকল বস্তু নির্মিত; চারিদিকের মন্দিরসমূহ জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে, কাঠ-পাথর এমন কি ধূলিকণা পর্যন্ত জীবন্ত জাগ্রত হইয়া আছে।

তিনি যে দিকে চাহিলেন, চেতন ব্যতীত অচেতন কিছুই দেখিতে পাইলেন না। নিজের দেহ, মন, বুদ্ধি, সবই চৈতন্যময় বোধ করিলেন। কোথায় যেন একটু 'আমি-আমি' বোধ থাকায় নানা বস্তুর আকার দেখাইতেছে, এইটুকু 'আমি' এক নিমিষে লোপ হইয়া সব অনুভবের বিরাম এখনই হইতে পারে। নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকেই আর একরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া শংকর আনন্দে আত্মহারা হইলেন। অনুভবের প্রথম বেগ প্রশমিত হইলে মহাদেব শংকরকে আশীর্বাদ করিলেন এবং বেদান্ত প্রচারে প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

• • •

একদিন গিরি নামক একজন শাস্ত্রশিষ্ট ব্রাহ্মণ আসিয়া শংকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। আসিয়াই তিনি গুরুসেবার সমুদয় ভার নিরহঙ্কারে লইয়া গুরুভ্রাতাদিগকে সাধন ভজন ও অধ্যয়নের অবসর দিলেন। • • • তাই জ্ঞানাভিমানী গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে একটু অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিতেন। • • • একদিন শিষ্যগণ বেদান্ত পাঠের জন্য প্রস্তুত হইলে শংকর বলিলেন, 'তোমরা একটু অপেক্ষা কর, গিরি নদীতে গিয়াছে, সে আসিলে পাঠ আরম্ভ হইবে।' কেহ কেহ ইহাতে বিরক্ত হইলেন, কেহ বা মুখ ফুটিয়াই গিরির সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। গুরুসেবা, গুরুভক্তি, জ্ঞানলাভের এক প্রধান উপায়; ইহারা বেদ-বেদাংগপারদর্শী তপস্বী হইয়াও অহংকারে এমনই অন্ধ হইয়াছেন যে, গুরুসেবাকে অবজ্ঞা করিতেছেন; ইহা লক্ষ্য করিয়া আচার্য দুঃখিত হইলেন। কিন্তু কোনও কথা না বলিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং মনে মনে গিরিকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিলেন।

গিরি নদী হইতে কাপড় ধুইয়া আসিতেছিলেন। তিনি মহদা অনুভব করিলেন, যেন তাঁহার অনুভব শক্তির উপর হইতে এক আবরণ সরিয়া গেল, আর তিনি সমস্ত জগৎ চৈতন্যময় বোধ করিতে লাগিলেন। গুরু কৃপায় ক্ষণকালের মধ্যে তিনি সর্বশাস্ত্রের সার অবগত হইলেন, সকল সাধনার ফল লাভ করিলেন। তাঁহার বন্ধনসকল ব্রহ্মতেজে বিভাময় হইয়া উঠিল। তিনি আচার্য সমীপে উপস্থিত হইয়া তোটকছন্দে বেদান্তের সারমর্ম প্রকাশক কতকগুলি শ্লোক মুখে মুখে রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতাগণ অবাক হইলেন। তাঁহাদের গর্ব চূর্ণ হইল। তদবধি গুরুসেবাপরায়ণ গিরির নাম হইল তোটকাচার্য।

கவிதைகள்

সাহিত্য সংবাদ

ইংলণ্ডের ক্রুদ্ধ লেখকটি।

'I can't go on laughing at the idiocies of the people who rule our lives. We have been laughing at their gay little madnesses, my dear, at their point-to-points, at their postural slump of the well-off and mentally under-privileged, at their stooping shoulders and strained accents, at their waffling cant, for too long. They are no longer funny, because they are not merely dangerous, they are murderous.' ক্লিমেন্ট এটলির বাগ্মিতা এবং রাজনীতিকদের প্রতি যিনি দুর্বাক্রোধে ফুঁসে উঠে আক্রমণের বাণ ছুঁড়েছেন, তিনি ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত লেখক জন অসবোর্ন। 'অ্যাংরি ইয়ংম্যান' শীর্ষক প্রসিদ্ধ সম্ভাষণে যাঁরা বিশেষিত হয়েছেন, অসবোর্ন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। ইংল্যাণ্ডের সুয়েজ অভিযানে তিনি প্রতিবাদ-পত্র টাইম্‌স্-এ পাঠালে, ওই পত্রিকা তা ছাপেন নি। রাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর তীব্র কটাক্ষ রক্ষণশীলদের বুকে মর্মান্তিক আঘাতের মত গিয়ে বেজেছিল। 'My objection to the royal symbol is that it is dead; it is the gold filling in a mouthful of decay.' এবং তারস্বরে রক্ষণশীলরা প্রমাদ গণলেন। নানাভাবে এই ক্রুদ্ধ লোকটিকে শায়েস্তার পথ নিয়েছিলেন এবং এখনো চলছে। অসবোর্ন ১৯৫৭ সনের সেপ্টেম্বরের উপরিউক্ত মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড়ে আজো থামেন নি। থামার রাস্তা তাঁর নয়। কারণ, তিনি মনে করেন তাঁর ব্রত খুব দায়িত্বপূর্ণ। 'Establishment'-এর বাবুদের মজ্জায় তিনি অবক্ষয়ের চিহ্ন স্পষ্ট দেখতে পান। তাঁর ব্রত সম্পর্কে তিনি বলছেন, 'I want to make people feel, to give them lessons in feeling. They can think afterwards.' এবং যেহেতু অন্যায়ের ঝড়ের শব্দ দূর থেকে লেখক শুনতে পান তাই তিনি বলেন, 'A writer can demonstrate feeling. It takes an extra ordinary human being to demonstrate action as well.' ঠিক সেকারণেই রক্ষণশীল ব্রিটনদেশীয় বুদ্ধিজীবী রাজনীতিকদের ঘুমুল আক্রমণের পরেও ১৯৬১ সনের আগস্ট মাসে তিনি কের Tribune-এ চিঠি লেখেন, 'Damn you, England.' বার্লিন সংকট ঘনিয়ে আসছে দেখে অসবোর্ন বিশ্বদুনিয়ার ধ্বংস দেখতে পেয়েছিলেন সেদিন। সে ধ্বংসলীলায় অসবোর্ন ব্রিটেনের ভূমিকাকে খাটো করে দেখবার সংকীর্ণ চেষ্টা করেন নি। তাঁর ক্রোধ রাক্ষসরকম উদ্দীপ্ত এবং উত্তপ্ত হয়ে কলমের মুখ দিয়ে বেরোল: 'Damn you, England……there's little left in my brain but the thoughts of murder of you…' অসবোর্নের এরকম উক্তি অত্যন্ত উদ্ধত বলে অনেকের কাছে ঠেকেছে। শুধু ঠেকেছে নয়, বরঞ্চ রয়েল আর্টিলারির একজন মেজর তার 'অ্যালসেসিয়ান' কুকুরটি নিয়ে অসবোর্নের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেন। উদ্দেশ্য, অসবোর্নকে মাপ চাওয়াতে বাধ্য করা। অসবোর্ন এ মেজরটির সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করলেন এবং মন্তব্য করলেন, 'Upper class clown.' মেজরের দৌড় ওই পর্যন্তই ছিল। সুতরাং অবশেষে পলায়নে শান্তি খুঁজে পান। 'Telegraph'-পত্রে জনৈক সাংবাদিক পরামর্শ দেন, অসবোর্নকে জেলে পাঠাতে। অসবোর্ন এ নিয়ে মাথা ঘামান না। উপরন্তু তাঁর সর্বশেষ নাটক 'Luther' যথেষ্ট জনপ্রিয় অর্জন করে চলেছে।

পুলিটজার পুরস্কার অধিকারিণী হার্পার লী ।

১৯৬১ সনের সাহিত্যে পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছিলেন শ্রীমতী হার্পার লী। পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাসটি হ'ল, 'To Kill a Mockingbird'। এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাসটি পুরস্কার পাবার আগেই 'বেষ্ট সেলার' খ্যাতি অর্জন করেছিল। শ্রীমতী লীর প্রিয় স্বদেশীয় লেখক হলেন 'মার্ক টোয়েন'।

তাঁর উপন্যাসটিতে শ্রীমতী লী সংস্কার, দারিদ্র্য, ভুল বোঝাবুঝি, গুপ্তশক্তি এবং উদারতা প্রভৃতি সুন্দরভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। মূলতঃ লেখিকা মানুষের সারল্যের এবং অকৃত্রিম গুণগুলোর গুণগান গেয়েছেন। এক জায়গায় সৌম্য অভিজ্ঞ এটিকাসের মুখ দিয়ে লেখিকা বলেছেন, 'You never really understand a person until you consider things from his point of view.··· Until you climb into his skin and walk around it.' কথাগুলো এটিকাস বলছেন তাঁর মেয়েকে। এই এটিকাস চরিত্রটি শ্রীমতী লীর পিতৃচরিত্রের অনুকৃতি।

শ্রীমতী লী লেখা আরম্ভ করেন সাত বছর বয়সে। আলবামা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু ডিগ্রির আগেই তিনি পড়াশুনা ছেড়ে দেন শ্রীমতী লীর মতে আইন পড়া নাকি 'good training for writers.'। তার পর তিনি হ্যাইবর্কে কোন বিমান কোম্পানীর রিজার্ভেশন এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন।

তার পর অনেক সাহস করে তিনি দু'টি প্রবন্ধ ও তিনটি ছোট গল্প কোন সাহিত্য প্রকাশককে দেখান। তিনি একটি গল্প পছন্দ করেন এবং শ্রীমতী লীকে বলেন, এ গল্পটিকে বইএর আকার দিতে। এ বইটিই হল, 'To kill a Mockingbird'।

শ্রীমতীর কল্পনায় আরেকটি উপন্যাসের প্লট ঘুরছে। তিনি শীঘ্রগিরই তা শেষ করবেন। এ বইটির ঘটনাস্থলরূপে বেছে নিয়েছেন দক্ষিণাঞ্চল। কারণ, তিনি বলেন, 'The South is the last refuge of genuine eccentrics. Its people are a little larger than life. They have had time and room to develop their own individuality.'

ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সাহিত্য-পুরস্কার ।

Prix Goncourt ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সাহিত্য-পুরস্কার হিসেবে পরিগণিত। ১৯৬১ সনের জন্য এ পুরস্কার লাভ করেছেন Jean Can. যে বইটির জন্যে এ পুরস্কার তিনি লাভ করেছেন,তা হ'ল La Pitie de Dieu. Jean Can এক সময় জাঁ পল্ সার্ত্র্-এর ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। বর্তমানে তিনি বামপন্থী সাপ্তাহিক L'Express-এর সংগে যুক্ত। সাংবাদিকহিসেবে তিনি যথেষ্ট উচুদরের বলে খ্যাতি লাভ করেছেন।

এ পুরস্কার যাঁরা দেন তাঁদের পক্ষপাতিত্ব নাকি প্রগতিপন্থীদের প্রতি। কয়েক বছর ধরে প্রগতিপন্থী বুদ্ধিজীবীরাই এ পুরস্কার লাভ করে আসছেন। এ জন্যে ফরাসী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটি অংশ খুবই ক্ষুব্ধ। তাঁদের ধারণায়, এ পুরস্কার এবার পাওয়া উচিত ছিল জর্জেস বুইসের। তাঁর প্রথম উপন্যাস La Grotte নাকি একটি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস। Jean Can-এর বইটির চেয়েও তাঁর এ বইটি উৎকৃষ্টতর। Prix Goncourt-এর কর্তাদের নাকি চরম দক্ষিণপন্থীরা ভয় দেখিয়েছিলেন জর্জেসকে পুরস্কারটি দেওয়ার ব্যাপারে। এ রকম গুজব চালু হওয়ার যথেষ্ট কারণও আছে। জর্জেস তাঁর বইয়েতে আলজিরিয়ায় আরবদের সমর্থনে চরিত্রসৃষ্টি করেছেন বলে দক্ষিণবাদী চরমপন্থীরা বইটির বিরুদ্ধে ভয় দেখাবেন এ আর বিচিত্র কি। কিন্তু সাহিত্য পুরস্কার কি রাজনীতিকদের দ্বারা চালিত হবে? গত বছরেও এই পুরস্কারটি দেওয়ার ব্যাপারে গোলমাল হয়েছিল। গত বছরে প্রথমে পুরস্কারটি পান Vintilia Horia. কিন্তু কিছুদিন পরে জানা গেল, তিনি নাৎসীবাদী। ফলে তিনি পুরস্কারটি হারালেন।

রাজনীতি আজকাল সর্বত্র আপন বিকট গ্রাস বিস্তার করে চলেছে। এমন ভাবে পুরস্কার বিতরণ করা হলে, পুরস্কারের আভিজাত্য আর অবশিষ্ট থাকে কি?

বাঙ্গালা ভাষা

স্বামী বিবেকানন্দ

আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতর সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যাঁরা "লোকহিতায়" এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট, কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্প-নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূত-কিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয়, ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে, ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই,—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষায় যেমন জোর, যেমন অন্যের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সে দিকে ফেরে, তেমন তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ্ ইস্পাত, মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার বে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চাল—নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।

যদি বল ওকথা বেশ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করবো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ এক কল্‌কেতার ভাষা। পূর্ব্বপশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কল্‌কেতার হাওয়া খেলেই দেখ্‌ছি, সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব্বপশ্চিমে ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত ঐ কল্‌কেতার ভাষাই চল্‌বে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট, সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা কিচ্ছে সেইটি দেখ। যখন দেখ্‌তে পাচ্ছি যে কল্‌কেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়া ভাষা এক করতে হয়, ত বুদ্ধিমান অবশ্যই কল্‌কেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এখায় গ্রাম্য ঈষাটিকেও বলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে। ভাষা—ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরে মতির সাজ পরানো ঘোড়ার উপর, বাঁদর বসালে কি ভালো দেখায়? সংস্কৃতর দিকে দেখ দিকি। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শঙ্কর স্বামীর মীমাংসাভাষ্য দেখ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ—আচার্য্য শঙ্করের মায়াভাষ্য দেখ, আর অর্ব্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ।—এখুনি বুঝ্‌তে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে, মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তা-

শক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু একটা পচাভাব রাশীকৃত স্থূল চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ্‌রে, সে কি ধুম্—বড় পাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম করে—"রাজা আসীৎ"!!! আহাহা! কি প্যাচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি ক্রিয়া!!—ও সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্নে যেতে আরম্ভ হল তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি; থাম্‌গুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নার লতা-পাতা চিত্র বিচিত্রর কি ধুম্!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা তারত গুরিও বুঝতে পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম্। সে কি ঝাঁকা বাঁকা তানা ডেন্—ছত্রিশ নাড়ীর টান তার রে বাপ্। তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব। এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত—কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন বল আসবে, তেমন ভাষা শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি, গয়নাপরা মেয়েমাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ভগ্‌মগ্ করবে।

[১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রামকৃষ্ণ মঠ পরিচালিত 'উদ্বোধন' পত্রের সম্পাদককে স্বামিজী যে পত্র লিখেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত।]

বিখ্যাত লেখক হেনরিক ভ্যান লুনের কাকা ভ্যান্ গগের একখানি ছোট স্কেচ কিনে এনেছেন। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং পরিচিত ব্যক্তির নীরব ও সরব ভর্ৎসনা তাঁর ওপর বর্ষিত হতে লাগল—আরে করেছ কি! ঐ উন্মাদের আঁকা ছবির কোন মূল্য আছে!

কিছুকাল পরের কথা। নিউইয়র্কের যাদুঘরে ভ্যান্ গগের চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সারা দেশের মানুষ যেন পাগল হয়ে ছুটে এসেছে প্রদর্শনী দেখতে। চতুর্দিকে দারুণ উত্তেজনা। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ডেকে ভীড় সামলাতে হল।

শিল্পের ক্ষেত্রে শেষ বিচার বলে কিছু নেই।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

টি. এস. এলিয়ট

সমকালীন ইংরেজ কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি এলিয়ট, এ ব্যাপারে মতানৈক্য একেবারেই অনুপস্থিত। সবচেয়ে বড় কথা হল, এলিয়ট এমন একজন পুরুষ, যিনি তাঁর নিজের যুগের দ্বিধা, সংশয়, যন্ত্রণা, জিজ্ঞাসা প্রভৃতি মৌলিক মানসসত্তাকে আত্মস্থ করতে পেরেছেন। তাঁর চিন্তা বা কাব্যজিজ্ঞাসা অনেকের ভেতর তর্কের ঢেউ তুলেছে হয়ত, কিন্তু সব তর্ক স্বীকার করেও এটা বলতে দ্বিধা থাকা উচিত নয় তিনি একজন মস্ত বড় প্রভাবশালী কবি। এবং এমন কবি যিনি দেশে-বিদেশের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে অনেক মৌলিক জিজ্ঞাসা তুলে দিয়েছেন। সে জিজ্ঞাসার ঝড়ে কারো কারো রুচির পরিবর্তন ঘটেছে, কারো কারো বা কাব্যদৃষ্টির পরিধি বেড়েছে। সম্ভবতঃ আধুনিক তরুণ কবির দলে অধিকাংশই এলিয়ট-পাঠে দারুণ আসক্ত। এ হেন এমন কখনে যদি স্পর্ধা মেলে তবে অতিকথনের মূর্খতায় তা নিশ্চয়ই পর্যবসিত হবে না,—ভারতীয় কবিকুলের মধ্যে আমরা এলিয়টকে কাব্যগুরু হিসেবে না দেখলে আমাদের ক্ষতি নেই। কিন্তু যেখানে তাঁকে ভীষণভাবে অনুভব করার প্রয়োজন স্পষ্ট, সে হল একজন কবিমানুষের সমগ্র জীবনজিজ্ঞাসার। আংশিক বা খণ্ড খণ্ড অনুভূতির দাস হওয়াতেই আধুনিক ভারতবর্ষীয় শিল্পী জীবনের ধ্যান মেলে, একথা রবীন্দ্রনাথের পরেও বলতে হয় বলে দুঃখের শেষ নেই। তবু এটা সত্য। এলিয়ট একজন তেমন জীবিত বৃদ্ধ ৭২ বছরের কবি, যাঁর তারুণ্য এখনো চকল উত্তপ্ত এ-যুগের সমগ্র চরিত্রের সংশয়িত, দ্বিধাগ্রস্ত, আতংকিত রূপ-জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজার মধ্যে।

॥ ২ ॥

মিসিসিপি উপত্যকার সেন্ট লুইস নামক স্থানে ১৮৮৮ সনে এলিয়টের জন্ম হয়। এলিয়ট-পরিবার আমেরিকার শিক্ষায় দীক্ষায় গত দু'শ বছর ধরে নেতৃত্ব করে এসেছেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানী গুণী হিসেবে এ-পরিবারের অনেকেই নামডাক অর্জন করেছেন। ১৯১৪ সনে তিনি ইংল্যাণ্ডে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। এর আগে ফ্রান্স ও জার্মানী উভয় দেশে পড়াশুনা করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে বিশ্বে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। চিন্তা এবং জীবনাচরণ উভয়বিধ ব্যাপারে সে পরিবর্তনের স্রোত এলিয়টকে ধাক্কা দিল। তিনি এ পরিবর্তনের স্রোতে আন্দোলিত নবজীবনের স্পষ্ট আভাস লেখায় ধরতে পেরেছিলেন। এ নবজীবনের পরিচয় সহজতার বদলে জটিলতার ভেতর, নিশ্চয়তার পরিবর্তে সংশয়ের এবং এ জটিলতা আর সংশয়—প্রথম মহাযুদ্ধে ধ্বস্ত বিভ্রান্তচিত্ত মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। সমালোচক এলিয়ট প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন। তারপর তাঁর Prufrock and Other Observations ১৯১৭ সনে বেরুল। ওই একই বছরে তিনি 'Egoist' কাগজের সহকারী সম্পাদকের পদে বৃতী হলেন। ১৯১৯ সন পর্যন্ত ওই কাগজের সহকারী সম্পাদকের কাজ করার পর নিজে 'Criterion' কাগজ বের করলেন। ১৯২২ সনে 'Criterion' বেরুল এবং চলল ১৯৩৯ সন পর্যন্ত। এলিয়ট Faber & Faber প্রকাশন-সংস্থাতে যোগদান করলেন ১৯২৩ সনে। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'The Waste Land' বেরুল ১৯২২ সনে। এই বইটিই তাঁকে বিশ্বখ্যাতি এনে দিল। "দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড" বেরোয় তাঁর 'Criterion'-এ। "ওয়েস্ট ল্যাণ্ড" বেরুবার পরেই তিনি ইংরেজী সাহিত্যে একজন মাথা ব্যক্তি হয়ে পড়লেন। আজ পর্যন্ত তাঁর সে অধিকার কেড়ে নেবার মত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি দেখা

যেননি। এলিয়ট শুধু একজন কবি বা সাংবাদিকই ছিলেন না। গদ্য লেখক এবং সমালোচক হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা বিশ্বস্বীকৃতি এনে দিয়েছে। ১৯২০ সনে তাঁর সমালোচনা-সংকলন 'The Sacred Wood' বেরোয়। ১৯৪৩ সনে তাঁর-কাব্যগ্রন্থ 'Four Quartets' প্রকাশিত হল।

The use of Poetry and the use of Criticism, The Idea of a Christian Society, এবং Notes towards the Definition of Culture তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গদ্যগ্রন্থ। ১৯৪৮ সনে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর প্রায় প্রতিটি বই-ই বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। পৃথিবীর সবদেশের তরুণ সাহিত্যসেবীদের ওপর এলিয়টের প্রভাব ব্যাপকভাবে অনুভূত।

নাটক লিখেও এলিয়ট খ্যাতিলাভ ও যশস্বীর পরিচয় দিয়েছেন। 'Murder in the Cathedral' নাটকটি তাঁর বহুল অভিনীত হয়েছে, যদিও ক্যাথেড্রালগুলোতে অভিনয়ের জন্য বিশেষ করে রচিত হয়েছে। কাব্যনাটিকায় এলিয়টের রীতি-নীতি আধুনিক তরুণ কবিকুল বহুলাংশে অনুসরণ করেছেন। অডেনের কাব্যনাটিকাতে এলিয়টের ছাপ সুস্পষ্ট।

॥ ৩ ॥

এলিয়ট সম্পর্কে একটি কথা সহজেই বলা যেতে পারে যা সমকালীন কবিরা শ্রদ্ধার সংগে লক্ষ্য করতে পারেন। তা হ'ল বিশ শতকের গর্ভে নানাবিধ বিশেষতঃ জীবনসম্বন্ধীয় যে আন্দোলন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে শুরু করে নিরন্তর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এমনকি এখনো পর্যন্ত, সে বিরাট আন্তর্জাতিক আন্দোলনের তিনি হলেন সচেতন এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন আন্তর্জাতিক নাগরিক। ইংল্যাণ্ড তাঁর বাসভূমি হতে পারে, ইউরোপীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য স্বীকারে তিনি নিষ্ঠাবান হতে পারেন, কিন্তু তাঁর চিন্তার ভেতর একটি সর্বজনীন ভাব লুকিয়ে রয়েছে। প্রত্যেকেরই চিন্তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য এবং যেহেতু চিন্তার স্বাতন্ত্র্যের দরুণ পারস্পরিক মতানৈক্য দুর্ধারারকম প্রকট বলে এলিয়টের সংগে চিন্তার বিরোধ আছে অনেকের সাথে, কিন্তু এ-সর্বজনীন ভাব বিশ শতকের উৎপাদন। এলিয়ট বিশ শতকের উৎপাদন, এ-বিশেষ সর্বজনীন ভাবকে পুরোপুরি আত্মসাৎ করে লেখার ভেতর সে-ছাপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই তাঁর লেখার বহর আন্তর্জাতিক। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় তাই তিনি সমাদরে গৃহীত, পঠিত এবং অনুকৃত-ও হয়েছেন। ভারতবর্ষে তেমন একজন পুরুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর এ সর্বজনীন ভাব সাহিত্যের জিজ্ঞাসায় অন্তত বিশ শতকের সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রীতিমত প্রয়োজন।

নিজস্ব বিশ্বাস গড়ে তুলতে না পারলে ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর ধূসর হয়ে যায়। এলিয়টের এ-বিশ্বাস তীব্র আছে। চার্চের দিকে তিনি মুখ ফিরিয়েছেন নিজ বাড়ির লোকদের বিশ্বাসের বাইরে। ইংল্যাণ্ডে এসে তিনি চার্চে নিয়মিত যেতে শুরু করেছেন। তিনি ধর্মীয়ভাবে সমাজ-নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী।..... the only possibility of control and balance is a religious control and balance; that the only hopeful course for a society which would thrive and continue its creative activity in the arts of civilisation is to become Christian.' উদ্ধৃত অংশটিতে লেখক এলিয়টের ধর্ম-বিশ্বাসের স্বরূপ রীতিমত সুস্পষ্ট। তবে তাঁর The Idea of a Christian Society থেকে এটাও সুস্পষ্ট হয়, ক্রিশ্চিয়ানিটির নিষ্ঠাবান 'ভক্ত' হতে পারেন তিনি, কিন্তু গোঁড়ামি তাঁকে বন্দীভূত করে নি। দু'দুটো মহাযুদ্ধে আত্মিক বিশ্বাসের সংকট দেখা দিয়েছে এবং তার থেকে আস্তে আস্তে সে সংকট সর্বত্র নাক গলিয়ে এখনকার মানুষের জীবন করে তুলেছে আস্থাহীন। এ-ধরণের সমস্যা সম্পর্কে উপরের বইটিতে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। এবং এলিয়টের এ-বইটি সর্বত্র সমাদর পেয়েছে।

কবি এলিয়ট সাংবাদিকতাতেও একটি বিশিষ্ট চরিত্র আরোপ করেছেন বিশেষতঃ স্বপ্রতিষ্ঠিত The Criterion সম্পাদনা করতে গিয়ে। এ কাগজটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে ১৯২২ থেকে ১৯৩৯ সন পর্যন্ত সম্পাদনা করেছিলেন। এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিও যথেষ্ট কুড়িয়েছিলেন। এ কাগজটি সম্পাদনা করতে গিয়ে তিনি দুটি বিষয়ের দিকে বিশেষতঃ নজর দিয়েছিলেন। যেমন, তাঁর নিজের ভাষায়—

'.....first to find out who were the best writers, unknown or little known outside of their own country, whose work deserved to be known more widely. Second I tried to establish relation with those literary periodicals abroad, the aims of which corresponded most nearly to my own.'

সমালোচক এলিয়ট বিশ্বসাহিত্যে অতি শ্রদ্ধার সংগে সমাদৃত। সমালোচনা কী লক্ষ্য নিয়ে চালিত হবে, এ সম্পর্কে এলিয়ট বলছেন, 'Criticism must always profess an end in view, which, roughly speaking, appears to be the elucidation of works of art and the correction of taste.....The critic, one would suppose, if he is to justify his existence, should endeavour to discipline his personal prejudices and cranks—tares to which we are all subject—and compose his differences with as many of his fellows as possible, in the common pursuit of true judgement.' তিনি আরো বলেছেন, Comparison and analysis are the chief tools of the critic.'

উপরের অংশগুলো থেকে সমালোচক এলিয়টের ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট পরিচয় মেলে।

এলিয়ট ঐতিহ্যের অনুকৃতিকে পছন্দ করতেন না, কিন্তু ঐতিহ্যের ধারাকে স্বীকার করতেন। এ ঐতিহ্যের ধারা তাঁর সজাগ ব্যক্তিসত্তাকে পশ্চাদ্ধাবনে তৎপর করে নি, বরং বর্তমানের চেতনাকে করেছে সমৃদ্ধ, পুষ্টপুষ্ট এবং দিয়েছে সম্মুখদৃষ্টি ও গতি। কবির দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি অনুপম ভঙ্গিতে এবং ভাষায় যা বলেন তা চিন্তাযোগ্য। তিনি বলেছেন: The emotion of art is impersonal, And the poet cannot reach this impersonality without surrendering himself wholly to be work done. And he is not likely to know what is to be done unless he lives in what is not merely the present, but the present moment of the past, unless he is conscious, not of what is dead, but of what is already living.'

এলিয়ট সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সত্যই বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'তাঁর গদ্যে পদ্যে যতখানি জিজ্ঞাসার সন্ধান পেয়েছি, তা আধুনিক কালে একান্ত দুর্লভ। হয়তো এই জন্যে বর্তমান ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর প্রভাব এত পরিব্যাপ্ত, হয়তো এই জন্যে তিনি ভবিষ্যতের পূজ্য।' বাংলা সাহিত্যের হট্টগোলে যারা ক্ষুব্ধ লোভে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে কাণ্ডজ্ঞানহীন এবং মদ্যপাসক্ত হয়ে সাহিত্যিকের আভিজাত্য কুড়ানোতেই সর্বক্ষণ, তাদের দৃষ্টি- এবং রুচি পরিশীলনের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এবং সে অর্থে এলিয়ট-পাঠ অতি আবশ্যক।

শ্রীসুবর্ণন পাল

সমাজ ও সাহিত্য

আদর্শবাদী সাহিত্যের অপ্রতুলতা ।

নারায়ণ চৌধুরী

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের কতকগুলি লক্ষণ নিয়ে আজ আলোচনা করব। পূর্বের যুগের তুলনায় আজ লেখকের সংখ্যা অনেক বেশী; তাঁদের রচনার বৈচিত্র্য ও বিস্তারও চোখে পড়বার মত। নানা বিষয় নিয়ে আজ বই লেখা হচ্ছে এবং লেখায় তথ্যের প্রতি মনোযোগও বেড়েছে পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বেশী। এক সময়ে সমাজের উচ্চ স্তরের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা নিয়ে বই লেখাটাই ছিল রেওয়াজ। অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের সুখ-দুঃখের কাহিনী সাহিত্য রচনায় সবিশেষ স্থান জুড়ে থাকত। এখন আর সে কথা বলা যায় না। এখন নিম্নবর্গের ও অনুন্নত সমাজের মানুষদের নিয়েও বই লেখা হচ্ছে বিস্তর। গত পঁচিশ বছরের ভিতর এক ছেলে-ভোলা শ্রেণীর লোকদের জীবন নিয়েই পাঁচ-ছয় খানা বই লেখা হয়েছে দেখতে পাই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' দিয়ে যে প্রক্রিয়ার শুরু, অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম,' সমরেশ বসুর 'পদ্মা', আবদুল জব্বারের 'ইলিশ মারির চর' প্রভৃতি বইয়ে সে ধারাটি আরও বেশ কিছুদূর সম্প্রসারিত হয়েছে।

তার উপর, বিষয়ের বৈচিত্র্য ও পরিমাণস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ভূগোলেরও বিস্তার ঘটেছে। এখন আর বাংলা ভাষায় নাগাদের অথবা রাজস্থানীদের অথবা পাঞ্জাবী মেহতাদের নিয়ে উপন্যাস-গ্রন্থ রচনা করা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ এই-জাতীয় গ্রন্থ ইতোমধ্যেই দুই-চারি খানি লেখা হয়েছে। হয়তো এ সমস্ত বইয়ের ভিতর দৃষ্টিভঙ্গীর অগভীরতার ছাপ স্পষ্ট, চিত্রিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচয়ও যথেষ্ট নিবিড় নয়; তা হলেও ওই নূতন খাতে চেষ্টাটারই একটা দাম আছে। বাংলা ভাষায় লেখকদের কূপমণ্ডুকতার অখ্যাতি এতে আস্তে আস্তে কমে যাবার পথ প্রশস্ত হচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অজানার আকর্ষণ মনুষ্যস্বভাবের একটি অন্তর্নিহিত বৃত্তি। মানুষ সাহিত্যপাঠে এই অজানার আকর্ষণকে বিশেষভাবেই চরিতার্থ করতে চায়। এতে তার চিত্তের বিস্তার হয়। সুতরাং বর্তমানের অগভীরতা মেনে নিয়েও বলতে হয়, সাহিত্যের ভৌগোলিক পরিধির সম্প্রসারণ ঘটায় সাহিত্যের অগ্রগতিই সূচিত হচ্ছে।

কিন্তু সব লাভের পিছেই একটা ক্ষতির দিক থাকে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, ক্ষতির পরিমাণ লাভকেও ছাড়িয়ে যাবার মত হয়েছে; শুধুমাত্র ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্ত মনে করে এ ব্যাপারে সান্ত্বনা লাভের উপায় নেই। কোন এই ক্ষোভ প্রকাশ করছি সেটি একটু বিশ্লেষণ করে বোঝাবার অপেক্ষা রাখে।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের রচনাস্ফীতি ঘটেছে; বিষয়বৈচিত্র্য বেড়েছে, ভৌগোলিক পরিধির সম্প্রসারণ হয়েছে—এ-সব খুবই সত্য কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্যের মর্মবস্তুর প্রকৃতি ও চরিত্রের মাপকাঠিতে যদি সাহিত্যের বিচার করতে হয় তা হলে বলতেই হবে যে, সমকালীন বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সুস্পষ্ট নিম্নগামিতা ঘটেছে। বাংলা সাহিত্য থেকে আদর্শবাদী মনোভাব ও অভীপ্সা বলতে যে জিনিস বোঝায়, তা লোপ পাবার মত হয়েছে। জাতিগঠন, দেশগঠন, মানুষগঠনের কোন সংকেত আজকের সাহিত্য থেকে পাবার যো নেই। এখনকার লেখকবর্গ সাহিত্যের এই দিকটি নিয়ে বিশেষ কিছু মাথা ঘামান বলেও মনে হয় না।

আমাদের নিকট জাতিগঠন সমাজগঠন মানুষ-গঠন সাহিত্যকর্মের অত্যাবশ্যক এবং অতিশয় মূল্যবান এক দিক। আজকের দিনের বেশীরভাগ লেখক যোলহয় সাহিত্যের এই ধারণা স্বীকার করেন না। তাঁরা তাঁদের রচিত সাহিত্যের ভিতর সমাজের আলয়-মঞ্চে-দেখানো যথার্থ ছবিটি ফুটিয়ে তুলতে পারলেই মনে করেন তাঁদের দায়িত্ব তাঁরা যথাযথ ভাবে পালন করলেন। বড়জোর তাঁরা সাহিত্যের সৌন্দর্য বা আনন্দের তত্ত্বটিকে স্বীকার করেন; তার বাইরে তাঁদের দৃষ্টি পৌঁছয় না। অন্তরঙ্গকালীন সাহিত্যিকবর্গ বাস্তবতার আদর্শে বিশ্বাসী, ঔচিত্যানৌচিত্যের ধারণা তাঁদের মনে স্থান পায় বলে বোধ হয় না। অর্থাৎ সমাজের প্রকৃত রূপ যা, সেইটে বিকৃত হোক কুৎসিত হোক তাকেই ফোটোগ্রাফারের দক্ষতায় নির্ভুল ভাবে পরিবেশনে এঁরা সচেষ্ট, সুকুমারমতি পাঠকদের মনে এর কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা ভেবে দেখবার মত কল্পনা-শক্তি এঁদের মনেকের নেই। সমাজের মঙ্গলামঙ্গল নিয়ে চিন্তা করাটা যেন এঁরা সাহিত্যের বহির্ভূত বিষয় বলে মনে করেন।

পূর্বে এরকম ছিল না। আগেকার যুগে বাংলা সাহিত্য কেবলমাত্র নন্দনবাদী বা তাবান্তরে কলাকৈবল্যবাদী [Art for Art's sake] ধারণা নিয়ে চলত না, তার ভিতর আদর্শবাদী অভীপ্সারও সমূহ প্রয়োজনা ছিল। আমাদের পূর্বতন লেখকেরা জাতিগঠনকে সাহিত্যের বহির্ভূত বিষয় বলে গণ্য করতেন না, বরং এই দুইয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে এই বিশ্বাস করতেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর 'চরিত-কথা' গ্রন্থে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ মত প্রকাশ করেছেন যে, আমাদের দেশে সাহিত্য বস্তুটি ধর্ম থেকে বিশ্লিষ্ট ছিল না। বৃহত্তর অর্থে সাহিত্য ধর্মেরই এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। এই অর্থে রামেন্দ্রসুন্দর দেবেন্দ্রনাথকে একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক আখ্যা দিয়েছেন।

এই অর্থ অযথার্থ নয়। আমাদের পুরাতন প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থগুলির মর্ম একটু বিশ্লেষণ করে দেখলেই বোঝা যাবে যে, সমাজকল্যাণের আদর্শের সঙ্গে তাদের ওতপ্রোত সম্পর্ক ছিল। রামায়ণ-মহাভারতের কথা ছেড়েই দিলাম, এমন যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও আনন্দের আধার কালিদাসের কাব্য, ওই কাব্যেও আমরা দেখি যে কী নিপুণ হস্তেই না মহাকবি সেখানে সুন্দরের সঙ্গে শিবের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞান শকুন্তলা ও কুমারসম্ভব কাব্যদ্বয়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে এই কথাটি আমাদের ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আধুনিক কালের পটভূমিতে এসেও আমরা দেখতে পাই যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনা সমাজকল্যাণের আদর্শের দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল সমাজকল্যাণ। অনেকে এই বলে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পমানসের সমালোচনা করে থাকেন যে, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে শিল্পের দাবিকে অবদমিত করে নীতির দাবি তথা সমাজের দাবি বড় হয়ে উঠেছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে', 'চন্দ্রশেখরে' তিনি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ঊর্ধ্বে সমাজকে স্থান দিয়ে প্রকারান্তরে শিল্পের ঊর্ধ্বে নীতির স্থান নির্দেশ করেছেন। কিন্তু এই সমালোচনা ভঙ্গী ভাসা-ভাসা সমালোচনা মাত্র। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন লেখক। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে সৌন্দর্য ও সমাজকল্যাণের অদ্বয়ী সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। তাঁর মত উচ্চাঙ্গের সৌন্দর্যস্রষ্টা আমাদের কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে আর কে হয়েছেন? বিরুদ্ধবাদী সমালোচকেরা যে বলেন বঙ্কিমের ভিতর নীতিবাদের আধিক্য ছিল, তাঁদের সেই সমালোচনাকে এক কথায় নিরস্ত করা যায় এই বলে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় এতবড় কবি বাংলা সাহিত্যের মূলতঃ গদ্যলেখকদের মধ্যে আর জন্মান নি।

প্রকৃত প্রস্তাবে, বিরুদ্ধ কবি-সমালোচক মোহিতলালের একটা প্রধান দীক্ষাই ছিল এই যে, বঙ্কিম প্রথমে কবি, তারপর গদ্যলেখক। তাঁর গদ্য, কাব্যের শ্রেষ্ঠোৎকর্ষের লক্ষণযুক্তিত। প্রমাণ 'কপালকুণ্ডলা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'মৃণালিনী', 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রভৃতি গ্রন্থ।

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে নীতিবাদ তথা আদর্শবাদের আত্যন্তিক প্রভাবের অভিযোগ টেকে না। যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন পূর্ণাঙ্গ লেখক সেইহেতু বঙ্কিমের চিত্তর একই কালে আমরা সৌন্দর্য প্রাপ্তরা ও সমাজবোধের স্ফূর্তি লক্ষ্য করি। সাহিত্য তাঁর নিকট নিতান্ত রসাস্বাদ চর্চার উপলক্ষ্য ছিল না তিনি গভীর শিল্পপ্রাণ লেখক হয়েও জাতিগঠন তথা মনুষ্যত্বের সাধনার আদর্শকে তাঁর রচনায় অতি উচ্চমূল্য দান করেছেন। বস্তুতঃ প্রথম শ্রেণীর লেখকদের একটি লক্ষণই এই যে, তাঁরা শিল্প ও সমাজকে যুগপৎ তাঁদের রচনায় সার্থক সমাহারে সমাবিষ্ট করেন। তাঁদের লেখনীতে শিব ও সুন্দরের পাশাপাশি অবস্থান। এবং, বলাই বাহুল্য, সত্য শিব-সুন্দরের সহচর।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের মূলবাণী দেশাত্মবোধের বাণী, মনুষ্যত্ব সাধনার বাণী। অথচ কে না জানে যে উপন্যাস হিসাবেও এই গ্রন্থের দাবি অগ্রগণ্য? 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ও পরে 'দেবীচৌধুরাণী' গ্রন্থে হিন্দু-দাম্পত্য আদর্শের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষিত হয়েছে, তা বলে ওই দুটি গ্রন্থের শিল্পমূল্য কি কিছু কম? 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে দাম্পত্য-বিশ্বাসহীনতা আর অসংযমের অমঙ্গলকর পরিণাম বর্ণিত হয়েছে তা বলে কি ওই দুই উপন্যাসের সৌন্দর্যের আবেদন, শিল্পোৎকর্ষের দাবি খাটো হয়ে গেছে? মোটেইতা নয়। আসলে বঙ্কিম এখনকার লেখকদের তুলনায় অনেক, অনেক বেশী পূর্ণতাপ্রয়াসী লেখক ছিলেন। তাই তিনি শিল্পকেও উপেক্ষা করেন নি, সমাজকেও উপেক্ষা করেন নি। তাঁর শিল্পদৃষ্টিতে সমগ্র দেশ ও সমাজ সংহত হয়ে ধরা দিয়েছিল। এখনকার ক্ষুদ্রপ্রাণ একান্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত তথাকথিত শিল্পমনস্ক লেখকেরা সেই উদার বৃহৎ আদর্শের মহিমা কেমন করে উপলব্ধি করবেন?

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও আমরা দেখি যে, তাঁর শিল্পচৈতন্যের পশ্চাতেও একটি উদার বৃহৎ জাতিচেতনার পটভূমিকা ছিল। শুধু তাই নয়, ওই জাতিচেতনা ক্রমপ্রসারিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিকতায় পর্যবসিত হয়েছিল। জাতিপ্রেম দিয়ে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিণত জীবনের ভাবনায় ও মানবিকতায় বিশ্বমৈত্রীর উদার-বিস্তৃত আঙিনায় গিয়ে উপনীত হয়েছিলেন। যদিও রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি এবং সর্বকালের মননীয় একজন মহাকবি, তা হলেও এই জাতিপ্রেম তথা বিশ্বপ্রেমের পৃষ্ঠপটটি বাদ দিলে তাঁকে সামান্যই বোঝা যাবে। আদর্শবাদী অভীপ্সার দ্বারা কবির শিল্পী-মানস নীরন্ধ্র ভাবে ভরপুর ছিল। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ তো এখনকার সংকীর্ণ খণ্ডিত শিল্পাদর্শের সাধকার্থেই কবিমাত্র ছিলেন না; তিনি ছিলেন জাতীয় ভাবনা তথা বিশ্বভাবনার কবি। রবীন্দ্রনাথের সাধনায় সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মা তাঁর শ্রেষ্ঠ বাণীরূপ লাভ করেছিল। শেষের দিকের রচনায় তিনি পৃথিবীর কবি হয়ে উঠেছিলেন। কবির ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের ভিতর আদর্শবাদী মনোভাবের প্রভাব ব্যতিরেকে এ জিনিস কখনও সম্ভব হত কি না সন্দেহ। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথের মত একাল-সেকালের আর যাঁরা মহাকবি ছিলেন তাঁদের নিয়তিই এই যে, তাঁরা তাঁদের কাব্যে মনুষ্যত্বের জয়গান গাইবেন। যে কোন দেশের যুগজীবনে একজন মহাকবির ভূমিকা হচ্ছে তৎকালীন যুগচেতনাকে তাঁর রচনায় সার্থক শিল্পরূপ দান করা। সংশ্লিষ্ট কবির মধ্যে আদর্শবাদী প্রণোদনা ভিন্ন এই দায়িত্ব পালন যে সম্ভব নয় তা আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গোরা' ও 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে সমাজ-কল্যাণের আদর্শ বিশেষ ভাবে প্রচার করেছিলেন। 'গোরা' উপন্যাসে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বমৈত্রীর দৃঢ়তা সবলে উত্তোলিত হয়েছে। অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদ যে জাতিপ্রেমের নামে মানুষের জীবনে সমূহ অমঙ্গল ঘনিয়ে আনে এবং এই অমঙ্গলের কবল থেকে মুক্তির একমাত্র রাস্তা হোলো তুলে গিয়ে আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রের অনুশীলন—এই তত্ত্বটিকে কবি এই বিশালায়তন উপন্যাসটিতে একটি মনোরম কাহিনীর মধ্য দিয়ে অতি সুকৌশলে গ্রথিত করেছেন। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে প্রায় একই রূপ তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে। সেখানেও উৎকট জাতীয়তাবাদী মনোভাবের অসারতা প্রতিপাদিত হয়েছে, তবে লেখকের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাহিনী সেখানে অন্য দিকে বাঁক নিয়েছে। একটি ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনীর আবরণে রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে এই গ্রন্থে পুরুষ স্বার্থবুদ্ধি তথা লোভাতুর অধিকারচেতনার উপরে মহান ক্ষমাধর্মের জয় ঘোষণা করেছেন। তার উপর আছে হিংসার বীভৎসতার চিত্রাঙ্কণ। 'গোরায়' এই শেষোক্ত ভাবটি নেই। তা বরং পরে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে আরও পূর্ণতর রূপ পেয়েছে।

সে যাই হোক, এখানে আমাদের বলবার কথা হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ আদর্শবাদী অভীপ্সার দ্বারা সতত-চালিত হয়েছেন। তিনি নিছক ঔপন্যাসিক ছিলেন না। উপন্যাসের জন্যই উপন্যাস রচনার নীতিতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। একটি বাস্তবানুসারী কাহিনী অবলম্বন করে এবং কেবলমাত্র ওই কাহিনীকেই উপজীব্য করে উপন্যাস রচনার যে রেওয়াজ আজকের দিনে সবিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে, তেমন উপন্যাসশিল্পের আদর্শের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ছিল না। তা যদি থাকত, তা হলে তিনি কাহিনীসার-সার উপন্যাসই রচনা করতেন, উপন্যাসের মধ্যে জাতিকল্যাণের বাণী বিশ্বকল্যাণের বাণী অনুপ্রবিষ্ট করাবার চেষ্টা করতেন না। আসলে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণদৃষ্টির অধিকারী লেখক। উপন্যাসের শিল্পগত দাবি পুরোপুরি ভাবে স্বীকার করে নিয়েও তিনি শিল্পেই আত্মচেতন ছিলেন না, শিল্পকর্মের ভিতর শিল্পের অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করতেন। সেই 'অতিরিক্ত কিছু' হল আদর্শবাদ অনুপ্রাণিত সমাজ-কল্যাণ তথা জাতিগঠন তথা বিশ্বমানবতার বাণী। বলা প্রয়োজন, এই আদর্শবাদ কিছু শিল্পের বহিরঙ্গবস্তু নয়, তা যে-কোন মহতী শিল্প-ভাবনার মধ্যেই অনুস্যূত।

বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের পর থেকেই বাংলা সাহিত্যের সুর ক্রমশঃ নেমে গিয়েছে বলে মনে হয়। সত্যি বটে শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প-উপন্যাসে নির্যাতিত-শোষিত শ্রেণীর মানুষের প্রতি, বিশেষতঃ এতাবৎ-অত্যাচারিত নারীজাতির প্রতি, যথেষ্ট সহানুভূতি ও দরদ প্রকাশ করেছেন; তবে সচেতন ভাবে একটা বলিষ্ঠ আদর্শবাদ, একটা সজ্ঞান জাতিগঠনের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি লেখনী সঞ্চালন করেছেন এমন কথা বলা যায় না। সমাজকল্যাণের দিক থেকে বিচার করলে, পরোক্ষ সুফল শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি থেকে আমরা অনেক পেয়েছি, কিন্তু বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মত বোধ করি শরৎচন্দ্র সজ্ঞান জাতিগঠনের মনোভাব দ্বারা চালিত হয়ে সাহিত্য রচনায় অবতীর্ণ হন নি। 'পল্লীসমাজ' 'অরক্ষণীয়া' 'পণ্ডিতমশাই' প্রভৃতি উপন্যাসে আদর্শবাদী মনোভাবের কিছু অভিব্যক্তি আছে বটে, তবে তা খুব জোরালো নয়। পল্লীসমাজের রমেশ এবং পণ্ডিতমশাইয়ের বৃন্দাবন আদর্শবাদী মনোভাবের বশবর্তী হয়ে গ্রামগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে আমরা দেখতে পাই, কিন্তু তাদের এই ভূমিকাকে ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের ভূমিকা। রমার প্রতি রমেশের প্রেম এবং পরিত্যক্তা কুসুমের প্রতি বৃন্দাবনের স্নেহের আকর্ষণ তাদের জীবনের পরিবর্তনকে গঠনাত্মক খাতে চালিত না করে ভিন্ন খাতে চালিত করেছে।

রমেশ আর বৃন্দাবনই এই, অরক্ষণীয়ার অতুল তো সেই তুলনায় অনেক দুর্বল চরিত্রের মানুষ। 'শ্রীকান্তে' ইন্দ্রনাথ এবং 'শেষ প্রশ্নে' রাজেন আদর্শবাদ আর সমাজকল্যাণের ভূমিভূমির উপর দাঁড়িয়ে আত্মপ্রকাশ করল, কিন্তু পরক্ষণেই তারা ছায়ায় মিলিয়ে গেল। সংসার রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রমধ্যে বারেকের জন্য অবতীর্ণ হয়েই যেন তাঁরা পরমুহূর্তে অদৃশ্য হল। শরৎচন্দ্র আমাদের মনে গভীর দরদের উদ্রেক করেছেন, নির্যাতিতের প্রতি আমাদের চোখে মমতার অশ্রু ঝরিয়েছেন; কিন্তু যাকে বলা হয় সচেতন আদর্শবাদ বলিষ্ঠ জাতিগঠনাত্মক চেতনা, তেমন কোন অভীপ্সা তাঁর রচনাবলীর মধ্যে প্রকাশমান হয়ে উঠেছে কিনা সন্দেহ। শরৎচন্দ্র মূলতঃ শিল্পী এবং খুব উঁচুদরের শিল্পী; তবে খুব উঁচুদরের মনীষী বা চিন্তাশীল ব্যক্তি নন। তাঁর মনোগঠনের এই ত্রুটিটির জন্যই তিনি অপরাজেয় কথাশিল্পী হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ শিল্পী হওয়ার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

এখনকার কথাসাহিত্য, যতদূর আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্রের রেখাচিহ্ন অনুসরণ করে চলেছে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের ধারায় চলছে না। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের ধারায় না চলবার কারণ, এখনকার লেখকদের মধ্যে আদর্শবাদের অপ্রতুলতা। এঁদের অধিকাংশই বাস্তববাদী লেখক, বাস্তবকে অনুসরণ করতে ভালোবাসেন; কিন্তু সেই বাস্তবানুকরণের ফল ভালো হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে তা নিয়ে ওঁদের মাথাব্যথা নেই। সমাজকল্যাণ বস্তুটিকে তাঁরা সাহিত্যের সঙ্গে অসম্পর্কিত বিবেচনা করে তথাকথিত একদেশে শিল্পসৃষ্টিতে আত্মনিমজ্জিত থেকে নৈতিক সার্থকতা লাভের চেষ্টা করেন। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। এরকম বড় লেখকদের দ্বারা নয়। তাঁরা সমাজ ও শিল্পকে বেষ্টন করে একটি অখণ্ড দৃষ্টির অনুশীলন করেন ওঁদের সাহিত্যমধ্যে—মূল্য বেশীর ভাগ ওঁদের রচনার এক বেশী শিল্প ও অল্প বেশী সমাজাদর্শের খাতে বিন্যস্ত। যে শিল্প কেবলমাত্র বাস্তবের প্রতিফলন চেষ্টাতেই নিবদ্ধদৃষ্টি, সেই শিল্প যতই নিখুঁত আর যথাযথভাবে রূপায়িত হোক, তেমন সাহিত্যকর্মের ফল সমাজ মনের উপর খুব বেশী সুপ্রসারী হতে পারে না বলেই ওঁদের বিশ্বাস। তাই তাঁরা নিজ নিজ শিল্পসৃষ্টিতে শুধুমাত্র বাস্তবানুকৃতির নীতি মান্য করেই সন্তুষ্ট থাকেন না, কল্পনার উপাদানও তাতে যথেষ্ট মিশিয়ে দেন,—এমন কল্পনা যা পাঠককে উদ্দীপিত করে, তার মনুষ্যত্বের উন্মোচনে সহায়তা করে। নিছক বাস্তবানুকৃতি ফটোগ্রাফীর বাড়া শিল্প-কৃতিত্ব কোন সময়েই দাবি করতে পারে না। বলা বাহুল্য, ফটো-শিল্পী আর চিত্র-শিল্পী এক পর্যায়ের শিল্পী নন।

সমসাময়িক কালের লেখকদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আর সুবোধ ঘোষের লেখায় কিছু আদর্শবাদী অভীপ্সার পরিচয় পাওয়া যায়; অন্য লেখকেরা এর প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন বলে বোধ হয় না। তারাশঙ্করের 'পঞ্চগ্রাম'-এর জেলু ঘোষ ও 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথ আদর্শবাদের ছাঁচে ঢালাই দুটি চরিত্র। 'বিচারক' উপন্যাসের বিচারক আর 'সপ্তপদী' উপন্যাসের রেভারেণ্ড কৃষ্ণেন্দুর মধ্যেও আদর্শবাদী প্রেরণার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। কিন্তু কেন জানি না তারাশঙ্করের রচনার এই লক্ষণীয় আদর্শবাদ সত্ত্বেও জনমনের উপর তাঁর সাহিত্যের প্রভাব খুব সুদূরপ্রসারী হতে পারে নি। ওঁর রচনাদর্শের মধ্যে নিশ্চয় কোথাও একটা সূক্ষ্ম অপূর্ণতা আছে, যার ফাঁক দিয়ে ওঁর লেখার অনেক সদ্গুণের সুফলই ঝরে গিয়ে থাকবে।

সুবোধ ঘোষ একজন উচ্চ শক্তিসম্পন্ন লেখক, তাঁর রচনার ভিতর শিল্পনৈপুণ্যের যেমন নিঃসংশয় প্রমাণ রয়েছে, তেমনি তাঁর আদর্শবাদী মনোভঙ্গিটিও লক্ষ্য করবার মত। এমন কিছু তিনি লেখেন না

ধার ভিতর অস্পষ্ট ভাবে হলেও সমাজকল্যাণাদর্শের কিছু-না-কিছু ছায়াপাত না ঘটে। সমাজকে বিপথে চালিত করবার দায়িত্ব নিতে অন্ততঃ সুবোধ ঘোষ নারাজ, যেমন অধিকাংশ বাস্তবধর্মী লেখকই উৎসাহের সঙ্গে ওই দায়িত্ব মেনে নেন। সম্প্রতি সুবোধ ঘোষের কিছু নূতন গল্প পড়লুম। চমৎকার তাঁর লিখনভঙ্গি, চমৎকার তাঁর চরিত্র-চিত্রণের ক্ষমতা। প্রতি গল্পের মধ্যেই একটা বক্তব্য আছে, আর সেই বক্তব্য গঠনাত্মক, সমাজাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত, কল্যাণধর্মী। এইটেই তো চাই। লেখক শিল্পও সৃষ্টি করবেন, আবার সমাজকে প্রেরণাও যোগাবেন। কাহিনীর রস পরিবেশনে তাঁর মধ্যে ঔদাসীন্য থাকবে না; আবার অন্যদিকে সেই কাহিনীর বক্তব্যের মধ্যে বিশেষ হিতকর তাৎপর্য পরিস্ফুটনেও তিনি সাতিশয় যত্নবান হবেন। সুবোধ ঘোষের লেখায় এই দুই শর্তই যোগ্যতার সঙ্গে পরিপূরিত। তাই তাঁর সাহিত্যের একটা বিশেষ মূল্য আছে আজকের বাংলার সমাজে ও সাহিত্যে। শুধু ঘাটতির মধ্যে, তাঁর রচনায় রসের কিছু কম। মননের প্রাচুর্য তাঁর প্রাণাবেগ কিয়ৎপরিমাণে শুষে নিয়েছে বলে মনে হয়। সুবোধ ঘোষ যদি আর একটু রসজ্ঞ লেখক হতেন, তবে বর্তমান বাংলা কথা-সাহিত্যে তাঁর স্থান নিঃসন্দেহে সকলের পুরোভাগে হত।

শক্তিমান কথাসাহিত্যিক দীপক চৌধুরীর বিগতকালীন লেখায় আদর্শবাদী প্রণোদনা লক্ষ্য করেছিলাম। তাঁর 'শঙ্খবিষ' উপন্যাসখানা এই ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্যের সপক্ষে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু ইদানীং তাঁর ওই সুস্থ প্রবণতা কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হয়ে এসেছে বলে মনে হয়। খুব সম্ভব লেখার পরিমাণস্ফীতির দায় মিটাতে গিয়ে এই দিকটায় আর আগের মত মনোযোগ দেবার অবসর তিনি পান না।

সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের সম্পর্কে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এঁদের প্রায় সকলেই নিজেদের সমাজ-সচেতন বলে দাবি করেন, অথচ প্রকৃত সমাজকল্যাণকামী মনোভাবের বাষ্পও খুঁজে পাওয়া যায় না এঁদের লেখায়। উন্নত চরিত্রের কিংবা উন্নত ভাবের কোন আদর্শ এঁরা সমাজের সামনে ধরে দেন না। এঁরা আজকের দিনের প্রবহমান ভাবধারার মানদণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করতে চান; কিন্তু মজা এই যে, বঙ্কিমের রচনার মধ্যেই সমাজাদর্শ সচেতন ভাবে ক্রিয়াশীল ছিল, এখনকার লেখকেরা প্রচার তো সুবাদেই শুধু সমাজ-সচেতন, কার্যতঃ নন। কুলি-মজুর-খেপানো লেখাই যদি সমাজচেতনার নিরিখ হয় তো এঁরা সমাজ-সচেতন লেখক অস্বীকার করব না, তবে প্রকৃত সমাজচৈতন্যের আদর্শের প্রতিফলন থেকে যে এঁরা অনেক দূরে আছেন সে কথা অপ্রিয় হলেও স্বীকার করতে হবে বৈকি। যে সাহিত্যে উন্নত ভাব, উন্নত চরিত্রাদর্শ সজ্ঞানে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করা হয় না, তেমন সাহিত্যকে আদর্শবাদী সাহিত্য কোনমতেই বলা যায় না।

ভারত-ভ্রমণে

আলডুস হাক্সলী

ছেলেবেলায় হাক্সলীর বাসনা ছিল বড় হয়ে চিকিৎসক হবেন। বাড়ির সকলেও তাই চাইতেন। পড়াশুনোও সেইভাবেই এগোচ্ছিল, কিন্তু স্কুলের পড়া শেষ হবার আগেই ওঁর এমন একটা চোখের অসুখ দেখা দিল যে কয়েক মাসের মধ্যে উনি একেবারে অন্ধই হয়ে রইলেন। চোখ ভালো করবার জন্য নানা চিকিৎসা চলতে লাগলো। হাক্সলী কিন্তু এই সময়টাও পড়াশুনো চালিয়ে যেতে লাগলেন অন্ধদের জন্য ব্যবহৃত ব্রেইলী পদ্ধতিতে। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত এইভাবেই চললো হাক্সলীর, তারপর ক্রমশঃ ওঁর চোখ ভালো হ'তে লাগলো—বর্তমানে উনি আবার প্রায় স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন।

হাক্সলীর সাহিত্যিক জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যা প্রায় নাটকীয় বলা চলে। অত্যন্ত ট্র্যাজিক। ওঁর প্রথম রচিত উপন্যাসখানি কোনোদিনই উনি চোখে দেখতে পান নি। সে সময়ে হাক্সলী অন্ধ ছিলেন। টাইপ করে উপন্যাস রচনা করলেন একখানা। অনেকেই তারিফ করলো সে রচনার। কিছুদিন পর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে টাইপ করা সেই পাণ্ডুলিপি খুঁজতে আরম্ভ করলেন হাক্সলী। কিন্তু তা আর পাওয়া গেল না কোথাও। হারিয়ে গেছে।

আলডুস হাক্সলী [Aldous Leonard Huxley, born in 1894] সম্প্রতি ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এর আগেও একবার ভারতবর্ষ ঘুরে গেছেন হাক্সলী, সে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যে বিদেশী লেখকেরা এদেশে অকস্মাৎ সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন, হাক্সলী তাঁদেরই একজন। Erome yellow [1921], Antic Hay [1923], Those Barren Leaves [1925] প্রভৃতি প্রথম বইগুলি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বিদেশী সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহশীল মহলে হাক্সলীর একটি নিজস্ব পাঠকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এঁরা কারা? কি পেলেন এঁরা হাক্সলীর রচনায়? এ কথা মনে রাখা দরকার যে হাক্সলী এমন একটা সময় ইংরেজী সাহিত্যে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যখন মম, ওয়েল্‌স, বেনেট, জয়েস, উলফ্, ফরস্টার, লরেন্স প্রভৃতির অনুকরণ দিকে দিকে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে ফেলেছিল। আর তা ছাড়া এঁদের যাঁরা পূর্বসূরী অর্থাৎ কনরাড, মেরেডিথ, ওয়াইল্ড, শ, কিপলিং, হার্টলার, গলসওয়ার্দি এবং হার্ডি প্রভৃতির রচনাও প্রচুর পরিমাণে সর্বত্র সমাদৃত হ'তো। কাজেই, স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে: হাক্সলী নতুন কি কথা বললেন যার ফলে অতোগুলি অসাধারণ প্রতিভাশালী লেখকের যুগে আবির্ভূত হয়েও নিজের বিশিষ্ট আসন করে নিতে পেরেছিলেন?—এক কথায় বলতে গেলে হাক্সলীর সাহিত্যসাধনার মূল লক্ষ্য হ'লো সাহিত্যের নৈতিক মান উন্নয়ন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে একটানা বিশ-পঁচিশ বছর যখন বিভিন্ন দেশের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকদের রচনার প্রধান বিষয় ছিল হয় শ্রেণী সংগ্রাম আর না হয় ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থার জটিলতা পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরা; হাক্সলী ঠিক সেই সময়েই বলতে আরম্ভ করলেন যে বাইরের সমাজ ছাড়াও ব্যক্তির প্রবলতর শত্রু আছে। সে হ'লো ব্যক্তি নিজে বা তার একই শ্রেণীভুক্ত অন্য কেউ। জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যক্তি মানুষের যে অবিশ্বাস ও অনিশ্চয়তাবোধ এবং তার ফলে যে সততার অভাব দেখা যায় থিয়োডোর গামবিল (Antic Hay) নামে একটি স্কুল মাষ্টারের চরিত্রের ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে

হাক্সলী তা' দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এবং উনিশ শ' তেইশ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হাক্সলীর এই উপন্যাসখানি একাধিক কারণে স্মরণীয়। প্রথমতঃ এ বইতে হাক্সলীর জীবনদর্শন সর্বপ্রথম দানা বাঁধতে আরম্ভ করে এবং দ্বিতীয়তঃ এ বইখানা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে হাক্সলীর স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়।

Antic Hay-র পূর্বেও হাক্সলী আরও পাঁচখানা বই প্রকাশ করেছিলেন। যার একখানা কাব্য-[Leda, 1920] এবং এইখানাই হাক্সলীর সর্বপ্রথম প্রকাশিত বই। Antic Hay-র পরে আজ পর্যন্ত হাক্সলী আরো পনেরো ষোলোখানা বই প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে অন্ততঃ ছয়খানা বই বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী সংযোজন। এ ছয়খানা হ'লো Point Counter Point, Brave New World, Ends and Means Eyeless in Gaza, After Many a Summer Dies the Swan এবং The Perennial Philosophy. এ বইগুলির নাম কালানুক্রমিকতাবেই দেওয়া হ'লো। এর মধ্যে Brave New World একখানা নতুন ধরনের ব্যঙ্গাত্মক রচনা—এ বইএর রচয়িতা হিসেবে হাক্সলীকে অনেক সমালোচক গালিভার্স ট্রাভেলস-এর লেখক সুইফ্‌টের সঙ্গেও তুলনা করেছেন। ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সম্ভাব্য রূপ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের আলোকে আলোচনা করেছেন হাক্সলী। যার ফলে দেখা যায় যে জীব হিসেবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব শেষ পর্যন্ত নেহাত একটা কথার কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং মানুষ সর্বতোভাবে বিজ্ঞানের দাসে পরিণত হ'চ্ছে।

Ends and Means এবং The Perennial Philosophy রীতিমত দার্শনিক আলোচনা গ্রন্থ। বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে যে নীতিগত সমস্যাগুলি হাক্সলী পরোক্ষভাবে পাঠকসমাজের সামনে তুলে ধরেছেন, সেইগুলিই বিশদভাবে এবং একেবারে দার্শনিক পদ্ধতিতে আলোচনা করেছেন এই বই দু'খানাতে।

বাইবেল এবং খ্রীষ্টধর্মের প্রতি হাক্সলীর অনুরাগের বিষয় ওঁর উপন্যাসের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। হিন্দু ধর্ম-দর্শন এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধেও যে হাক্সলী যে কোনো সাধারণ শিক্ষিত হিন্দুর চাইতে কতো বেশী জানেন তা' ওঁর প্রবন্ধগুলির পাঠকমাত্রেই দেখলে বিস্মিত হবেন।

একসময়ে হাক্সলী সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত মহলে একটা বিশেষ কৌতূহল দেখা গিয়েছিল ওঁর ব্যক্তিগত জীবন যাপনের বৈশিষ্ট নিয়ে। হাক্সলী জাতিতে ইংরেজ, স্থায়ীভাবে বসবাস করেন আমেরিকার ক্যালিফর্নিয়ার চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে অথচ তিনি হলেন যাকে বলে ঘোরতর moralist—খৃষ্ট এবং বেদান্তের একনিষ্ঠ পাঠক। এ হেন ব্যক্তি অসাধারণ না হয়ে যায় না। হাক্সলী এ শতাব্দীর একজন অসাধারণ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে। কারণ উনি যে শুধু একজন প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিক বা প্রাবন্ধিক তাই নয়। মানব জীবনের নানা জটিলতা ভেদ করে তার মূল রহস্যের অনুসন্ধান করা এবং গোটা মানবজাতিকে একটা সুস্থতর নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ওঁর সারা জীবনের অক্লান্ত সাধনাও কম কথা নয়। অনেকের কাছে তো এইটেই আল্ডুস হাক্সলীর সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয়।

হাক্সলী পরিবার তিনপুরুষ ধরেই শিক্ষিত সমাজের আলোচনার বিষয় হয়ে রয়েছেন। গত শতাব্দীর প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখক টি. এইচ. হাক্সলী ছিলেন আল্ডুস হাক্সলীর পিতামহ। আল্ডুস হাক্সলীর বাবা ছিলেন বিখ্যাত 'Cornhill Magazine'-র সুযোগ্য সম্পাদক। হাক্সলীর বড়ভাই যুলিয়ান হাক্সলীও এযুগের একজন স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক।

—সুশীল কুমার নাগ

গ্রন্থ-পরিচয়

মানব বিকাশের ধারা—প্রফুল্ল চক্রবর্তী। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। ৩২৬ পৃষ্ঠা। দাম : বারো টাকা।

কথাটা রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বলেছিলেন। মনকে বাঁধতে ও গড়তে হলে যেমন আর্টের প্রয়োজন আছে, তেমনি বিজ্ঞানেরও। বাঁচতে যখন হবে, তখন চাই বাস্তব দৃষ্টি ও মনের শক্তি। জীবনের পথে পথে নানান সমস্যা ও সংশয়, নানা বাধা ও বিপত্তি; তাদের মুখোমুখি হয়ে লড়াই এবং সমস্যা-সংশয়-বাধা পেরিয়ে যাবার চেষ্টাতেই জীবনচর্যার যথার্থ সার্থকতা। জীবনের পালা তখন পরিণত হয় জীবনলীলায়, মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করে। মনুষ্যত্ব অর্জনের বিবিধ উপকরণ, বিজ্ঞান তাদের অন্যতম। সংস্কৃতির ভিত্তি গঠনে এর অবদান ও প্রয়োজন তাই অসামান্য।

আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রথম পর্বে বিজ্ঞান ছিল অন্যতম পাঠ্য বিষয়। মধ্যপর্বে বেশ কিছুদিন অবহেলার পর একে আবার প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুনতর শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলনের পর প্রসারতাও বেড়ে গেছে। তবু এই রীতির অসম্পূর্ণতা ঘোচে নি। যে বয়সে শিশু বিজ্ঞান পড়ে, সে স্তরে তার বোধ অর্ধজাগ্রত; যখন জাগরূক সচেতন হয়, ঠিক তখনই 'হিউম্যানিটিজ' ও 'সায়েন্স' বিধাবিভক্ত। যারা প্রথমদলে অপাংক্তেয় হয়, বিজ্ঞান তাদের অ-পাঠ্য; অথচ এই সময়েই বিজ্ঞানের সঙ্গে কিছু যোগ থাকলে পরবর্তী জীবনে তা কার্যকরী হতে পারে। কিন্তু তা হয় না। অন্যদিকে, বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থাও এমন গতানুগতিক; ছাত্রদের মনে কিছু তত্ত্ব বা বিধি সঞ্চিত হয়, বিজ্ঞান বুদ্ধি উদ্দীপ্ত হয় না। স্কুল ও কলেজ-পাঠ্য বইগুলি ছাত্রদের মন গড়ার দিক থেকে আদৌ সক্ষম। ফলে, বিজ্ঞান মুখস্থ হয়, মনস্থ হয় না।

এই পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করেই রবীন্দ্রনাথ বিদ্যায়তনের পরিধির বাইরে 'জনপ্রিয়' বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দিয়েছেন এবং স্বয়ং অগ্রণী হয়েছেন। এছাড়া বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং অন্য কয়েকটি সংস্থার প্রচেষ্টাও স্মরণীয়, ব্যক্তিগতভাবেও কয়েকজন প্রাগ্রসর। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও লেখক ও বই যেমন সংখ্যালঘু, তেমনি পাঠকসমাজও অন্যমনস্ক। এই কারণেই বিজ্ঞান-বিষয়ক যে কোন সৎ রচনা অকুণ্ঠ অভিনন্দনযোগ্য। এই ধরণেরই একটি বই প্রফুল্ল চক্রবর্তী রচিত 'মানব বিকাশের ধারা'।

'মানব-বিকাশের ধারা' জৈবিক অভিব্যক্তি এবং সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের গোড়াকার কথা। বিশ্বের বৃহৎ মঞ্চে প্রাকৃতিক নির্বাচনের পথে জীবনের যে প্রথম আবির্ভাব ঘটল, তার উল্লেখ করে লেখক গ্রন্থারম্ভ করেছেন। অতঃপর মাটি আবহাওয়ার পালাবদলে প্রাণের রূপবদল হল। দেখা দিল এককোষী জীব, মানুষ গঠন, উদ্ভিদ ও তার রূপান্তর, সরীসৃপ, ডিনোসর, স্তন্যপায়ীদের অভিযাত্রা। অভিব্যক্তির চলনপথে আবির্ভূত হল মানুষ। তার দেহের গঠন, সমান্তরাল অন্যান্য প্রজাতিদের সঙ্গে সম্পর্ক, এবং স্বাতন্ত্র্য বিচার করে লেখক মানুষের মনের গঠন, তার প্রবৃত্তি-অনুভূতি ইত্যাদিরও জাতি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন, সামাজিক বৃত্তির উৎস ও বিকাশের পর্যালোচনা করেছেন। পরবর্তী পর্বে আদি মানবের রূপরেখা আলোচিত হয়েছে, সেইসঙ্গে বংশগতি এবং জাতিবিভাগের রীতিও। এর পরের পর্বে প্রাগৈতিহাসিক জীবনযাত্রা স্বভাবতঃই আলোচ্য বিষয়, যেখানে প্রস্তরযুগের সংস্কৃতির অধিকার এবং কৃষির আবিষ্কারে ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার

শক্তি পেয়ে মানবসমাজে যখন বৈপ্লবিক রূপান্তর, ধীরে ধীরে নগর-সভ্যতার গোড়াপত্তন। সুমের-মিশর-ভারতের (সিন্ধুসভ্যতা) আদি সভ্যতার বর্ণনা দিয়ে গ্রন্থ শেষ হয়েছে।

সাধারণ ইতিহাসগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সুখর; প্রচলিত বিজ্ঞান-গ্রন্থগুলিতে প্রাণের বিকাশ আলোচিত, কিন্তু অতি সংক্ষেপে। 'মানব-বিকাশের ধারা'-র লেখক সেই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তকে বিস্তৃত পটভূমিকা দিয়েছেন, যে অস্পষ্ট সুদূর লোকে প্রাণের প্রথম স্পন্দন, যে স্পন্দনের পরিচয় সম্পর্কে বিজ্ঞান আজও অল্পজ্ঞানী। স্বভাবতঃই লেখকের প্রয়াস দুঃসাহসিক পথে পরিক্রমারত। ফলে, অনেক অজানা বিষয় যেমন পাঠকের গোচরে আসে, অনেক ভ্রান্ত ধারণারও নিরসন ঘটে। অপিচ, লেখক কেবলমাত্র জৈবিক অভিব্যক্তির সীমাতেই আবদ্ধ থাকেন নি, মানুষের সাংস্কৃতিক তৎপরতারও যথাযথ বিশ্লেষণ করেছেন। বইটি তাই কেবলমাত্র প্রাণের ক্রম-ইতিহাস নয়, মানবসভ্যতার আদি ও ক্রমিক ইতিবৃত্তও।

ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'মানুষের উদ্ভব ও উদ্‌বর্তনের কাহিনী মোটামুটিভাবে সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করেছি। বিশেষজ্ঞদের জন্য নয়। কাহিনীটি আমি সাধারণ পাঠকদের জন্য বলতে চেয়েছি।' ভূমিকা এবং ভূমির মধ্যে সাযুজ্য সহজেই চোখে পড়ে। ভাষা সহজ, বাগ্‌ভঙ্গি সরল, বিজ্ঞানসম্মত কঠিন শব্দের অনুপস্থিতি, সাধারণ পাঠকদের পক্ষে সহজবোধ্য। এই সঙ্গে সেকালের প্রাণ-জগতের কিছু ছবি, পরিভাষা এবং প্রকরণও সংযোজিত হয়েছে, যেগুলি স্বতঃ-মূল্যবান।

লেখক একথাও জানিয়েছেন যে, বিশেষজ্ঞদের আলোচনাগুলি তিনি সাজিয়েছেন মালার আকারে। মালাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হলে সুখী হতাম। যে নিরপেক্ষতা বিজ্ঞান আলোচনার স্বগত বৈশিষ্ট, তা এখানে সর্বত্র বজায় থাকে নি, বিশেষ একটি মতবাদের ধারণা মাঝে মাঝে উগ্র হয়ে উঠেছে। অনেক বক্তব্য বিতর্কমূলকও। বিশ্লেষণ-পদ্ধতি প্রায়শই প্রভু-সম্মিত এবং আলোচনার গতিও অচ্ছন্দ ও মন্থর। বক্তব্যকে আরও সহজ সরস সুতীব্র করার অবকাশ ছিল। যদিও বিভিন্ন মতবাদ ও ধ্যানধারণাকে লেখক পরিধির বাইরে রাখতে চেয়েছেন, তবু সর্বত্র তা পারেন নি। পারা সম্ভবও নয়। এবং সেইজন্যেই বক্তব্য যে, আদিম কৃষি ও তদ্ভিত্তি মৃত্যু-পুনরুজ্জীবনের ধারণার উল্লেখ যখন তিনি করেছেন, তখন আদিম 'কৃত্যের' বিস্তৃত বিবরণ দেওয়াও উচিত ছিল। সুমের-মিশর-সিন্ধু সভ্যতার ধর্মবিষয়ে আলোচনাও প্রত্যাশিত। এতদ্‌ভাবে সংস্কৃতির ছবিটি অসম্পূর্ণ। জীবনের উৎস ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা ও বক্তব্যের ঘনিষ্ঠতাও কাঙ্ক্ষিত।

তবু লেখকের প্রচেষ্টা সাধুবাদের যোগ্য এবং এ বই সাধারণের অবশ্যপাঠ্য। যে দেশে বিজ্ঞানের চর্চা সত্ত্বেও বিজ্ঞানবুদ্ধি পলাতক, মন অন্ধুপাক সাহিত্য-শিল্পে উল্লসিত এবং প্রাগাধুনিক অন্ধ কুসংস্কারে অবগাহনরত, সে দেশে এ জাতীয় রচনা সাদরে বরণীয়। এবং সবচেয়ে বড়ো দুঃখ এই, এমন একখানি উপকারী ও উপাদেয় বইয়ের ছাপা বাঁধাই ব্যাপারে প্রকাশক নিরুদ্যমভাবে ও যত্নসহকারে অবহেলী।

নবযাত্রা—পবিত্র মুখোপাধ্যায়। কবিপত্র প্রকাশ ভবন; ১সি, রাণী শংকরী লেন, কলকাতা ২৬। চল্লিশ পৃষ্ঠা। দাম দু টাকা॥

প্রচ্ছদে তন্দ্রাবৃত নরনারী, তার ওপারে ধ্রুবপদের অবস্থান, 'বলো, সুন্দর আছে কোন উপকূলে', কয়েক পাতা পরে রেখা-কলঙ্কিত একটি অসুন্দর মুখের ব্যঞ্জনা, তারপরে কাব্যারম্ভ। পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদশিল্পে এবং অলংকরণে যার আভাস, উদ্ধৃত ধ্রুবপদে যার বিভাব, কাব্যদেহের স্থায়ীভাবই তার বীজ-সূত্র। পড়তে পড়তে কিছুদূর অগ্রসর হলে স্বতঃ মনে পড়ে তিনজন কবিকে : গোটে, মিলটন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় তরুণ কবি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দর্পণে অনেক মুখ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়জনের দৃষ্টি তিনি স্বাধিকারে আকর্ষণ করেছিলেন। 'শবযাত্রা' তাঁর নতুনতম প্রকাশিত রচনা। মুক্তবেণী কবিতার সংকলন নয়, স্বয়ং একটি দীর্ঘায়ত কাব্য, যার পাঁচটি সর্গ : পতন-আর্তনাদ-শবযাত্রা—সহমরণ—প্রার্থনা। সর্গগুলি বিচ্ছিন্ন নয়, সংশ্লিষ্ট ; কাহিনী নয়, কবিমানসের সন্ধি-প্রবাহ। স্বর্গভ্রষ্ট এক দেবশিশুর যন্ত্রণা ও অবসাদ, কান্না ও জ্বালাময়ী প্রার্থনা কাব্যটির বিষয়বস্তু। এই দেবশিশু স্বয়ং কবি। কিন্তু শুধু কবিই নয়, কবিকণ্ঠে বিশ শতকের ব্যথা ও বিলাপ রূপ নিতে চেয়েছে। একের অন্তরে অনেকের বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে। সমষ্টির বেদনা সংহত হয়েছে ব্যষ্টির লেখনীতে।

কাব্যের মূল ভাবের উদ্দীপনে গ্যেটে ও মিলটনের কথা কবির সচেতন মনোজগতে ছিল কিনা জানিনা, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উপস্থিতি যত্ন-প্রয়াসিত। সুন্দরের সন্ধানে 'নিখিল নাস্তির' সেই বহুখ্যাত ভাবনা এখানেও, এবং সেইসঙ্গে পরিচিত শব্দ বাক্যাংশ এবং 'অর্কেস্ট্রা'-র রূপকর্মের প্রতিভাস। সমগ্র কাব্যটি বহুবৃত্তময়ী ছন্দে লেখা, ভাবের অনুসমনে যার পদধ্বনি এবং তাল-লয় বারে বারে বদলে গেছে।

তা ব'লে কবি অনুকারক মাত্রেও নন। চিন্তার স্বাতন্ত্র্যে, ছন্দের বৈচিত্র্যে, চিত্রকল্পের কারুকার্যে স্বগত বিশিষ্টতাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবিধর্ম চরিত্রবান এবং কবিকর্ম স্তুতিসুখদ। বিশেষতঃ, ছোট কবিতার জনতায় দীর্ঘ কাব্যের যে অনুশীলন ও নিরীক্ষা তিনি এখানে করেছেন, তা নতুন স্বাদ সৃজনের দাবি রাখে।

আঙ্গিকগত রূপসজ্জায় কবিপত্র প্রকাশ ভবনের সযত্ন আন্তরিকতা এবং রুচিবোধ সুন্দরের অভিসারী।

গুরুদাস ভট্টাচার্য

সাময়িক পত্রের লেখকদের লক্ষ্য হওয়া উচিত পাঠক চিত্তের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে আসা। প্রবন্ধ এমনভাবে লিখতে হবে যার আবেদন সর্বজনীন। একই বিষয়কে বিভিন্নভাবে লেখা যেতে পারে এবং তার আবেদনও বিভিন্ন। কোন এক বিখ্যাত মাসিকপত্রের সম্পাদক মার্গ এ রোজ একটি বিষয়ের ছ'টি বিভিন্ন নাম দিয়েছেন এইভাবে :—

১। মোটর গাড়ী শিল্পের অর্থনীতি।
২। আমেরিকার ধনী ব্যক্তিগণ—একটি অনুসন্ধান।
৩। আমেরিকার মিলিওনেয়ার।
৪। হেনরি ফোর্ড কিভাবে ধনী হলেন।
৫। আমি কিভাবে বিত্তশালী হলাম—ফোর্ড।
৬। আপনি কিভাবে ধনী হতে পারেন।

কোন্ শিরোনামার আবেদন অধিক তা কি ব্যাখ্যা করে বলতে হবে?

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ৪ ॥

সাউথ রাজা স্ট্রীটের চৌমাথার মোড়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে পুলিশ অফিসটা পড়ে ঠিক বাঁ দিকে। এন্টনী দেখল সেই পাগলাটা সটান গিয়ে দাঁড়াল পুলিশ অফিসের সামনে কাঁকড়া পান্নীর ফুল গাছটার তলায়। সারাটা গাছ থোকা থোকা ফুলে ছেয়ে গেছে। শুধু তাই নয় সমস্ত ফুটপাথটাই বিছিয়ে আছে ঝরে পড়া পান্নীর ফুলে। দুপুরের রোদে আতপ্ত বাতাস পান্নীরের হাল্কা মিষ্টি গন্ধে এই কর্মব্যস্ত এলাকাটুকুতে যেন খানিকটা আরামের আমেজ বুলিয়ে দিচ্ছে। এন্টনীর নাকেও সেই ঘ্রাণ এসে লাগল।

এদিকে লোকজন সব একে একে সরে যেতেই সেও আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াল পান্নীর ফুল গাছটার তলায়। শাদা লম্বা লম্বা ফুলগুলো অবহেলায় পড়ে আছে। কত লোক তাদের মাড়িয়ে চলে গেছে। তবুও কতকগুলো বেশ তাজাই রয়েছে। এন্টনী তার ছেলেবেলার অভ্যাসমতো পান্নীর ফুল কুড়োতে লেগে গেল। এই পান্নীরের একটা দুর্নিবার আকর্ষণ আছে এন্টনীর মনে। এই পান্নীরের গন্ধের সঙ্গে তার অবচেতন মনে বহুদিনের সঞ্চিত সেই মুখখানা আবার চেতন মানসে ভেসে এল। সেই অদ্ভুত মেয়ে! সেই তামার সঙ্গে কাঁচা সোনার খাদ মেশানো রং। সেই হাল্কা লিপ্‌স্টিকে রাঙা চ্যাটালো পুরু দুটি ঠোঁট। সেই মুক্তোর পাতির মতো সাজান নিটোল শুভ্র দাঁতের সারি। সারা অঙ্গ ঘিরে তার অপরূপ রূপ-লাবণ্য খেলা করত ওরাট যৌবনের। তারই মাথায় সে প্রথম দেখেছিল এই পান্নীরের গোড়ে। তার বিনি-বাহার খোঁপা ঘিরে সাপের ফণার মতো উদ্ধত হয়ে ছিল লম্বা লম্বা পান্নীরের দল।

অবাক হবারই কথা। পান্নীর এখানকার অতি সাধারণ ফুল হলেও কোন মেয়ে একে মাথায় পরে না। সেই প্রথম এন্টনী একজন মেয়ের মাথায় এই ফুল দেখল।

ছেলেবেলা থেকেই এন্টনীর পান্নীরের ওপর বড় ঝোঁক। পান্নীরের এমন একটা হাল্কা মিঠে মেজাজ আছে যে অন্য কোন ফুলের সঙ্গেই তাকে তুলনা করতে পারে না এন্টনী। সিচ্চি ফুলের গন্ধ খুবই মিষ্টি বটে, কিন্তু উগ্র রকমের মাতাল করা গন্ধ তার। মল্লিকাই-এর গন্ধ হয়তো তার থেকে কিছুটা নরম, কিন্তু পান্নীরের মতো এত স্নিগ্ধ নয়। মেয়েটিকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, এ ফুল কেউ মাথায় দেয় নাকি?

মেয়েটি তার শাদা মুক্তোর মতো দাঁতের সারি ঈষৎ উন্মুক্ত করে একটু হেসেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল—এ ফুলের নাম জান?

হ্যাঁ, জানি বৈকি। এতো পান্নীর।

মেয়েটা বলেছিল—পান্নীর হল এর সাধারণ নাম। এর আসল নাম হল নাগমল্লি। কেউ কেউ একে নাগমল্লিও বলে। দেখ সাপের ফণার মতো কি রকম উদ্ধত হয়ে আছে এর সারা দেহটা। আমার

খু-উ-ব ভাল লাগে। এর গন্ধ হাল্কা বটে কিন্তু বেশীক্ষণ শুঁকলে একটা নেশা লাগে দেখেছ? এক রকম সাপ আছে জান, তাদের চোখের দিকে চেয়ে থাকলে অল্প অল্পর নেশা লেগে যায়। তখন সেই সাপটা তাকে আস্তে আস্তে গ্রাস করে। সেদিক থেকে নাগমল্লি নামটা এর অদ্ভুত সার্থক।

এন্টনী কথা বলে নি। কিন্তু মনে মনে বুঝেছিল সেই সাপটা তাকে আস্তে আস্তে গ্রাস করছে। সে তার সমস্ত মুখটা ডুবিয়ে দিয়েছিল মেয়েটির সাম্পু করা অজস্র চুলের রাশির মধ্যে। তারপর এন্টনী মনে মনে নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল হঠাৎ। তাই সে ফুল কুড়ানো বন্ধ করে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে তার নজর পড়ল একটু দূরে এক জোড়া অলন্ত চোখ তার দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। লোকটা একটু দূর থেকে তাকে দেখছে। তার দু'চোখে জ্বলছে যেন আগুনের খাপরা! এন্টনীর চোখে তার চোখ পড়তেই সে তখনি তার দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল। তারপর বলতে লাগল—এই নেঃ দু'লাখ। এই নেঃ পাঁচ লাখ। হল তো? যা যা হতভাগারা—এখন সব ভাগ—বলতে বলতে সে বন্দরের দিকে এগিয়ে চলল।

কিন্তু এন্টনী সেই জলন্ত চোখ দুটোকে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। যেন বহুদিনের অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে থাকা একটা স্মৃতিকে মনে করিয়ে দিল চোখদুটো। ও চোখ কি এন্টনী আর কোথাও দেখেছে? বার বার সে আপন মনে নিজেকে এই প্রশ্ন করে চলল, যতক্ষণ না সে বন্দরের বড় গেটটার সামনে হাজির হল।

বন্দরের খোলা গেট দিয়ে সে নিতান্ত অন্যমনস্কেই বন্দরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই কিন্তু তাকে থমকে দাঁড়াতে হল। তার ভাবনায় ছেদ পড়ল একটা অদ্ভুত মেয়েলি গলায় চড়া আওয়াজে—হল্ট্।

সম্মুখে তাকিয়ে দেখল একটা বিরাট জন্তু জোয়ান লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার গোলপানা মুখে প্রকাণ্ড একজোড়া গালপাট্টা গোঁফ। হাড়ির নিচের দিকটা কামানো। কিন্তু গালপাট্টা গোঁফে আর ঝুলফিতে মিলে তাকে দেখাচ্ছে যাত্রার ভীমের মতো। সেই গোঁফের ওপর খেবড়া মতো একটা নাক। তার দু'পাশে জোড়া ভুরুর নিচে লাল টকটকে জেলার মতো দুটো চোখ। কার্নিভ্যালের মেট কিপার।

ওই শরীর থেকে এই রকম মেয়েলী আওয়াজ! সত্যিই হাসির কথা বটে। এন্টনী দাঁড়িয়ে পড়ে লোকটার মুখের দিকে চাইল। সেও তার লাল লাল চোখদুটো ঠিক তেড়ার চোখের মতো ঢুলু-ঢুলু অবস্থায় তুলে ধরল এন্টনীর মুখের দিকে। আশ্চর্য লোকটা আর কোন কথা বলে না। হল্ট বলে সেই যে সে চুপ করেছে তারপর তার মুখে আর কোন কথা নেই। মুখে চোখেও অন্য কোন ভাব নেই। এন্টনী অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

শেষে বললে—কি ব্যাপার?

মেয়েলি গলার লোকটা উত্তর দিলে—এ গেট দিয়ে গাড়ি যাবার রাস্তা, পায়ে হেঁটে লোকেরা এখান দিয়ে যেতে পারে না। এন্টনী চেয়ে দেখল সত্যিই—তাই। তাকে পাশ কাটিয়ে গোরুর গাড়ির দল মচ মচ শব্দ করতে করতে চলেছে। শুঁটকিমাছ বোঝাই সব ক'টা। তাদের তীব্র বীভৎস গন্ধে এদিকটা যেন নরকে পরিণত হয়েছে। এন্টনী একটু সচেতন হতেই সেই গন্ধটা তার নাকে গিয়ে গা গুলিয়ে তুললো। বহুকালের অভ্যাস তার। তাছাড়া পাশীরের গন্ধে মনে যে আমেজটুকু এসেছিল তার এতটুকুও এখন খুঁজে পেল না এন্টনী মনের মধ্যে। প্রায় দৌড়ে গেটের বাইরে চলে গেল সে। গেটের বাইরে পা দিতেই একটা লোক হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে তার হাত জড়িয়ে ধরল। এন্টনী তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে থমকিয়া যাবার।

আইয়ো, আইয়ো, আইয়ো [হায় হায় হায়]—আইয়া বাড়ি থেকে কখন কাউকে না বলে চলে এসেছেন। এই দুপুর রোদে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এমন করে ঘুরো যায় কেউ? এমনি করলে ক'টা দিনই বা শরীর ভাল থাকবে?

এন্টনী ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রাস্তার ওপর। মারিয়া ধাসনকে কোন রকমে ঠাণ্ডা করে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

গেটের বড় গেট থেকে পার হতে গিয়ে আবার তার নজর পড়ল সেই পাগলাটির ওপর। সে এবার এসে দাঁড়িয়েছে রাস্তার বাঁ দিকে রেভেনিউ অফিসের সামনে ফুটপাথের ওপর। ফটমট করে চেয়ে আছে এন্টনীর দিকে। এন্টনীর অজানতেই তার পায়ের গতি একটু খানির জন্যে বন্ধ হয়ে এল। সে পাগলাটির মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে পাগলাটা আকাশের দিকে চেয়ে কিছু দিয়ে দেবার ভঙ্গিতে হাত ছুঁড়তে লাগল—নেঃ নেঃ এই দু'লাখ, এই চার লাখ। তুই কতো চাস? সতের লাখ! তা' এই নেঃ। যা হতভাগারা—ভাগ এখন। শালা বলছি!

বলতে বলতে শূন্যে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে কতকগুলো কাল্পনিক লোকের দিকে তেড়ে গেল। এন্টনী এবার হাঁটতে শুরু করল বাড়ির দিকে। হাঁটতে হাঁটতে খালি মনে পড়তে লাগল পাগলাটার দাঁড়ি গোঁফ আর জটাবাঁধা চুলে ঢাকা মুখটা। সেই মুখের মধ্যে লুকোন দুটো চোখ যেন এন্টনীর কতো চেনা।

এন্টনী বাড়িতে ঢুকতেই গেটের দারোয়ান লম্বা সেলাম বাজিয়ে জানাল—সুসান কার্ভোজা অনেকক্ষণ তার জন্যে বৈঠকখানায় বসে অপেক্ষা করছে।

সুসান কার্ভোজার নাম শুনেই তার মনে পড়ল তার বাবা মারা যাবার ঠিক আগেকার সেই দিনটির কথা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল মারিয়া ধাসনের কথাগুলোও। ভাবল, কি মতলবে এসেছে সুসান তার কাছে? বৈঠকখানায় ঢুকতেই সুসান সোফা থেকে লাফ দিয়ে উঠে তার হাত জড়িয়ে ধরল—এই যে ইয়ং ম্যান। এসো এসো। আমি যে তোমার জন্যেই বসে আছি।

পরম হৃদ্যতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাল সুসান এন্টনীকে, যেন সেই-ই এই বাড়ির মালিক। তারপর বললে—তুমি যদিও আমাদের খুবই আপনার জন তবুও তোমাকে এখানে নবাগতই বলব আমি। তাই ভাবলাম যাই একবার একলা কেমন করে তোমার দিন কাটছে একটু খোঁজ নিয়ে আসি। যদিও আমার এই সময়টুকুর দাম অঙ্কের পাঁচঘর ছাড়িয়ে যাবে, তবুও—

বলে চোখে মুখে বেশ খানিকটা ধাঁকের হাসি হাসতে হাসতে সুসান বলতে লাগলেন—তবুও তুমি হলে আমার এক ঘরের লোক, আমার বিশিষ্ট বন্ধু গভ উইনের ছেলে। তোমার ওপর আমার একটা সামাজিক কর্তব্য আছে তো? বরতে গেলে আমিই তোমার একরকম লোক্যাল গার্জেন।

বলতে বলতে ধূর্ত চোখ মেলে সুসান এন্টনীর মুখের ভাবটা খুঁটিয়ে দেখে নিল। সেখানে কোন রকম পরিবর্তন না দেখতে পেয়ে সে হি হি শব্দ করে একটা মোলায়েম হাসি হেসে আবার বললে—অবশ্য গার্জেন না বলে বন্ধু বললেই ভাল হয়। আজকালকার ছেলেরা আবার গার্জেনি বড় একটা মানতে চায় না তো? তা তুমি এতদিন ছিলে কোথায়?

এন্টনী নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিল—লণ্ডনে।

সুসান গলার স্বরে সন্দেহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল—এই দারুণ যুদ্ধের সময় তুমি লণ্ডনেই ছিলে?

—না, মাবে প্যারিস, বার্লিনেও ছিলাম।

—ওরে বাবা, সে যে আরও ভয়ংকর, আঁতকে উঠে বললে সুসান। বার্লিনে কি করতে গিয়েছিলে?

—জার্মানরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সমানভাবে জবাব দিল এস্টনী। গলার স্বরে তার কোন পরিবর্তন নেই।

সুসানের চোখ দুটো ঠেলে যেন বার হয়ে আসছে নিদারুণ বিস্ময়ে। ভুরু দুটো ধনুকের মতো বেঁকে উঠে গেছে প্রায় কপালে। সে জিজ্ঞাসা করল—সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে কি করে?

এস্টনী সেই আগের মতোই নিস্পৃহ কণ্ঠে উত্তর দিল—সে অনেক কথা। অত কথা বলে আপনার দামী সময় আর নষ্ট করতে চাই না। তা একটু কফি খান দয়া করে!

ইতিমধ্যে বেয়ারা এক পেয়ালা গরম কফি আর কিছু কেকের টুকরো একটা ট্রের ওপর সাজিয়ে নিয়ে এল। সুসান সেদিকে তাকিয়েই হাঁ হাঁ করে উঠল—না না কিছু নয়। কফি টফি আমি খাইনে। যে কোন মিষ্টি আমার পক্ষে বিষ। তা ছাড়া পেটের দারুণ গণ্ডগোল. যা খাই হজম করতে পারি না। ডায়েবিটিস্, ডিস্-পেপ্সিয়া, ব্লাডপ্রেসার আর হার্ট-ট্রাবলই আমাকে কেরদার করে দিলে।

বলতে বলতে সুসানের ঘূর্তমীভরা চোখ দুটো কেমন যেন করুণ হয়ে উঠল। মুখখানা কিছুক্ষণের জন্যে ম্লান হয়ে গেল। গলার স্বরে নেমে এল রাজ্যের হতাশা। সুসান ভাঙা ভাঙা গলায় বললে—যদি তোমাদের মতো বাবা পেতাম তো একবার দেখিয়ে দিতে পারতাম।

কাকে যে সে কি দেখতা সে সব কথা উহ্য রইল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুসান কোঁৎ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আগের আলোচনাটা সেই দীর্ঘশ্বাসের ঘাড়ে উড়িয়ে দিয়ে বললে—তা তুমি উইলের প্রোবেট নেবার কি করছ?

এস্টনীর যদিও প্রশ্নটা ভাল লাগল না—তবুও জবাব দিল—সে তার রামচন্দন আয়ারকে দেওয়া আছে। তিনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন।

সুসান এবার ভাঙা গলার স্বরটা নিচে নামিয়ে এনে প্রায় গোপনীয় কথা বলবার ভঙ্গিতে এস্টনীকে বললে—দেখ, এই তুতুকুড়ি বড় ভয়ানক জায়গায়। হিটলারের জার্মানীও বোধহয় এত ভয়ংকর ছিল না। কাজেই খুব সাবধান হয়ে থাকবে। বিশেষত তুমি এখানে নবাগত আগন্তুক, তার ওপরে এই বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়েছ তুমি। তোমার বিপদ এখন পদে পদে। তবে তুমি যদি আমার বিশ্বাস করো তো আমার সবচেয়ে বড় কর্তব্য হবে তোমায় বাঁচান। এত বড় সম্পত্তির দেখাশুনো যদি নিজে না করতে পার—মানে তোমার তো আর এসব অভ্যাস নেই হে, তাই বলছিলাম তুমি আমার সাহায্য যে কোন সময়ে নিতে পার।

সুসানের কথার ফাঁকে এস্টনী তাকে দেখে নিচ্ছিল। সুসানের কথা শেষ হতেই সে জিজ্ঞাসা করল—কি রকম বিপদের কথা বলছেন আপনি?

গলা নামিয়ে প্রায় ফিস ফিস করে সুসান জবাব দিল—মেনেজারয়া আমাদের ভয়ানক শত্রু। আমাদের মানে কামারকারদের। এই কামারকারদের মধ্যে সবচেয়ে পয়সাওলা লোক ছিলেন তোমার বাবা, অনেক মেনেজারকে তিনি টাঁকে গুজতে পারতেন। তাই তিনি ছিলেন মেনেজারদের এক নম্বরের শত্রু। আর আমি,—আমি চিরদিনই অবিচার অনাচার সহ্য করতে পারি না। আমি তাদের প্রতিবাদ সব সময়েই করে থাকি। আমি তাদের দু' নম্বরের শত্রু।

সুলতান তার অতি মূল্যবান সময়ের কথা ভুলে গেল এসব কথা বলতে বলতে। সে সোফার ওপর বেশ ভালো করে জাঁকিয়ে বসল। এন্টনী তার ভাব দেখে আবার অনুরোধ করল—একটু কিছু অন্ততঃ গলা ভেজাবার জন্যে—

সুলতান বললেন—তা'হলে আমার একটা সোডার বোতল এনে দাও।

একটা বেয়ারা তক্ষুনি একটা সোডার বোতল খুলিয়ে গ্লাসে ঢেলে দিয়ে গেল। তাতে চুমুক দিয়ে সুলতান বললে—আমি জানি তোমার মনে আমার সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আছে। কেন যে আছে তাও জানি। আমি তোমার বাবার কফিনের পিছনে যাই নি তাঁর মৃত্যুর পর। এ নিয়ে তোমার মনে আমার ওপর অভিযোগ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু একটা কথা তোমায় সত্যি করে বলছি এন্টনী, তোমার বাবা যে আমার কতোবড় বন্ধু ছিলেন তা আমি যদি বিশ্বর মতো আমার বুকটা চিরে দিতে পারতাম তো দেখতে পেতে। সেই অতি বড় বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমি আর ক'দিন বিছানা থেকে উঠতে পারি নি।

সুলতানের গলার স্বরটা এই কথাগুলোর বলতে বলতে আরও ভাঙা আরও ভারী হয়ে উঠল। গলাটা ঝেড়ে সাফ করে নিয়ে সে বললে—তারপর আজ আসব কাল আসব করে নানান কাজে আটকে গেলাম। কিন্তু তার মধ্যেই অনেক কথা আমার কানে আসতে লাগল। শুনলাম মেনেজারদের চাই কার্মেল ভাজ, তোমাকে খতম করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। আর তোমার দুই মামা মোসেজ আর এলবার্ট তার সঙ্গে জুটেছে। এরা যদিও কাস্বারকার ঘরের তবুও তোমার বাবা তাদের সম্পত্তির কোন অংশ না দেওয়াতে তারা ক্ষেপে গিয়ে তোমার ওপর শোধ তুলছে। খুব সাবধান তাবি [ভাই, অথবা স্নেহ সম্বোধন], খুব সাবধান।

এন্টনী চুপচাপ এতক্ষণ সব কথা শুনে যাচ্ছিল। এবার প্রশ্ন করল—আচ্ছা এই মেনেজার আর কাস্বার-দের ব্যাপারটা কি? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

সুলতান একগাল হাসল।—ও আমার কপাল, তুমি তাই-ই জাননা! তুমি কি রকম পারোয়ার ছেলে হে? তবে শোন। যখন এই করমাণ্ডেল উপকূল পর্তুগীজদের হাতে ছিল তারা পর্তুগালে বসে এ রাজ্য শাসন করত। তারাই এই কীল পারোয়ারের ভিতর একজন সর্দার গোছের লোকের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সেই সর্দারকে আমাদের ভাষায় নাম দিয়েছিল জাতি-তাদৈবরয়োর। এ সব সম্বন্ধে আমি অবিশ্যি খুব বেশী কিছু জানি না। খুঁটিয়ে সব কিছু যদি জানতে চাও তো তুত্তুকুড়ির সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি যেন্দ্র থিরাস্বার কাছে যেতে হবে। তা সেও যে সব কথা ঠিক বলবে এমন কোন কথা নেই, কারণ সে নিজের মেনেজার কিনা। তা যাই হোক, এর মধ্যে মোদ্দা কথাটা হল এই যে, ওই জাতি তাদৈবরয়োর চিরকাল আমাদের সমাজের সাধারণ লোকদের ওপর লাঠি ঘুরিয়ে এসেছে। রাজার খেতাব পেয়ে নিজেরাই রাজবংশ বনে গেছে। ওই তাজেরাই আবার নিজেদের সুবিধে অনুযায়ী পরে পারোয়া সমাজে দুটো ভাগ এনে ফেলে। রাজবংশের লোকেরা কয়েকটা ঘরকে বলে নিয়ে তাদের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের বিয়ে সাদী দেয়। এই সব ঘরগুলিই হল মেনেজার। মেন্ মানে জানতো—টেবিল। এই সব ঘরের লোকেরা টেবিলে বসে খানা খায় —তাই এরা মেনেজার; চলতি কথায় টেবিলাইট্। এরা নিজেদের এ্যারিস্টোক্র্যাট বলে মনে করে। আর সমাজের যেটা বৃহত্তর অংশ যারা কারুর মাথার ওপর লাঠি ঘোরায় না, সমুদ্রে নৌকো নিয়ে গিয়ে মাছ ধরে, গভীর সমুদ্রে ডোবে শাঁখ মুক্তো কুড়োবার জন্যে, তারা হল খেটে খাওয়া লোক। তারাই নাম পেল কাস্বারকার। তারা কাজ করে বলে তারা হল নীচুস্তরের লোক। তারা খানা খেতে বসিতে

বসে। মেনেজারদের সঙ্গে কাস্যারকার ঘরের ঝিয়ে সাধী অনেকদিন বন্ধ হয়ে গেছে। এক সঙ্গে তারা খেতেও বসে না। দীর্ঘদিন ধরে এই দু' দল খাঁড়ায়-ভূমড়োয় হয়ে আছে। আমি এই মেনেজারদের অত্যাচার থেকে কাস্যারকারদের বাঁচাবার জন্যে কাস্যারকার মহা সমিতির প্রতিষ্ঠা করি। তোমার বাবা আমাকে বলেছিলেন—সুলান সমস্যার জন্যে ভেবো না, যত টাকা লাগে আমি দেব। তাঁরপর তারও দেহান্ত হল আর আমিও সেঁতিয়ে গেলাম। কিন্তু মেনেজাররা আবার উৎপাত সুরু করবার চেষ্টা করছে তাতে করে তোমাকে সব কথা না জানিয়েও পারলাম না। কথা শেষ করেই সুলান উঠে দাঁড়াল।—উঃ বড় দেরী হয়ে গেছে। আসি তা'হলে এখন।

বলে সুলান দু'হাত বাড়িয়ে এস্টনীর হাত দুটো মুঠোতে পুরে একটা ঝাঁকানি দিল। তারপর ঘর থেকে বার হয়ে গিয়ে বসল তার চাউল গাড়িটার মধ্যে। গাড়িটা গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

[ক্রমশঃ

আপনি কি ভাবে দেখেন? আমার মনে হয় আত্মপরীক্ষার ভেতর দিয়েই আপনি দেখেন। আপনার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর সকল মানুষের সম্ভাবনা। আপনার মধ্যেই রয়েছে নিষ্ঠুরতা, মূর্খতা, বিকৃতি—রয়েছে মহত্ব, সহানুভূতা নিরমানুবর্তিতা। অন্য মানুষের সঙ্গে আপনার তফাৎ কেবল গুণ বা দোষের মাত্রার কম বেশীতে।

সুতরাং মানব প্রকৃতিকে জানা মানে নিজেকে জানা। উপন্যাস লেখার অর্থ আত্মোপলব্ধি—আপন আত্মার মধ্যে অভিযান—আত্ম-আবিষ্কার।

—এ. বি. গাথরি।

ইতিহাসের পাতা থেকে

শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর ॥

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জার্মানির পতনের তিন সপ্তাহ পরে সোভিয়েট নিরাপত্তা পুলিশেরকর্তা মেজর নিকিফাইন রিপোর্ট দেন যে, হিটলার আত্মহত্যা করেন নি এবং তিনি জীবিত আছেন। ১৯৪১ সনেও রাশিয়ানরা সেই কথাই বলেছে। ১৯৪৪ সনে জেনারেল আইসেনহাওয়ার এ বিষয়ে ব্যাপক তদন্তের ব্যবস্থা করেন এবং হিটলারের শেষ জীবনে যে ২৮ জন ব্যক্তি তাঁর পাশে ছিল তাদের নানা ভাবে জেরা করে এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করে এই কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন যে হিটলার বেঁচে নেই। ১৯৪৫ সনের ৩০শে এপ্রিল আনুমানিক অপরাহ্ণ ২-৩০ টার সময় হিটলার তাঁর পাতালপুরীর ঘরে বসে মুখের মধ্যে পিস্তল ভরে গুলি ছোঁড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সদ্য পরিণীতা পত্নী ইভা ব্রন সায়নাইড সেবন করেন। সেই রাত্রে ১০-৩০ টার সময় তাঁদের দু'জনের দেহ পেট্রোলে চুবিয়ে চ্যানসালারির বাগানে পুড়িয়ে ফেলা হয়। মস্কো থেকে কিন্তু সে রকম কোন রিপোর্ট প্রচার করা হয় নি। অপর পক্ষে পটসড্যাম সম্মেলনে স্বয়ং স্টালিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে বলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন হিটলার বেঁচে আছেন এবং স্পেন বা আর্জেন্টিনার কোন স্থানে অজ্ঞাতবাস করছেন। অনেকে মনে করেন রাশিয়ানরা এই যে ইচ্ছা করে হিটলারকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় এবং মাঝে মাঝে হিটলারের রহস্যময় অন্তর্ধান সম্বন্ধে মতামত প্রচার করে—তাদের এই প্রচার কার্যের পিছনে কোন বিশেষ গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। হিটলার বেঁচে আছে, এই অছিলায় ইওরোপে তাদের কার্যকলাপ অব্যাহত রাখা যেতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে তারা হয়ত এভাবে প্রচার কার্য করে থাকে বলে অনেকের ধারণা। যাই হোক ভিন্ন শক্তির প্রাথমিক কাগজ-পত্র থেকে হিটলারের শেষ সময়ের যে ইতিবৃত্ত জানতে পারা গেছে তারই সারাংশ এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল।

১৯৪৫ সনের ২০শে এপ্রিল হিটলারের জন্মদিন। চানসেলির বাগানে ৫০ ফুট মাটির নিচে অবস্থিত জার্মানদের সেনানায়ক ও দলের কর্তারা হিটলারকে অভিবাদন জানাবার জন্য সমবেত হয়েছে। চকচকে জুতো ধবধবে পোশাক জলজলে সমরভূষণ সকলের অঙ্গে—কিন্তু মুখ সকলের পাংশু, হাসি নেই কারো মুখে। সকল রণাঙ্গনেই জার্মানদের হার হচ্ছে। রুশ সৈন্য বার্লিনের উপকণ্ঠে সমবেত হয়েছে। মার্কিন সৈন্যও কাছে এসে পড়েছে। আর বোধহয় রক্ষা নেই। রক্ষা নেই? ননসেন্স—উত্তেজিত হিটলার বক্তৃতা দিতে লাগলেন, বজ্রকণ্ঠে বললেন, বার্লিনের দ্বারপথে রুশ সৈন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হবে আর তারপর মিত্রপক্ষের সৈন্যদের তাঁড়ো তাঁড়ো করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। হিটলার ঘন ঘন ম্যাপ দেখতে লাগলেন। নানা আদেশ জারী করলেন, হয় রণজয় না হয় মৃত্যু। অন্য পথ নেই। যে তার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবে তাঁকে তৎক্ষণাৎ গুলি করে মারা হবে। অমোঘ আদেশ! কারুর মুখে রা নেই।

২২শে এপ্রিল বিকালে হিটলার তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষদের কাছে ঘোষণা করলেন যে, তাঁর নির্দেশে যে আক্রমণাত্মক সংগ্রাম আরম্ভ করা হয়েছে তার প্রথম ধাক্কায় জার্মানরা জয়লাভ করেছে। এস্ এস্ বাহিনীর নেতা হিমলার টেলিফোনে জানিয়েছেন যে, সেনানায়ক স্টীনারের আক্রমণে বার্লিনের উপকণ্ঠে রণবাহিনী

পর্যুদস্ত হয়ে পিছু হটেছে। হিটলারের ঘোষণা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বার্তার পর বার্তা আসতে লাগল। পরিচালনা বিভাগের অধিনায়ক কর্ণেল জোডল্ সেই খবরগুলি পর পর সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

হিটলার উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিলে 'খবর কি জোড্ল্, আমরা জিতেছি তো?'

গম্ভীর কণ্ঠে জোডল্ উত্তর দিলেন—'মাপ করবেন, ফুরের, স্টীন'র আক্রমণ করে নি, সে পিছু হটে চলে গেছে।'

তারপর খবর এলো মার্শাল জুকভের বাহিনী বার্লিনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। চীৎকার করতে লাগলেন হিটলার,—"তোমরা সকলে প্রতারক! সকলে বিশ্বাসঘাতক! কুত্তার দল।"

হিটলারের সেই রক্তচক্ষু আর উন্মত্ততার সামনে সকলে পাথর হয়ে গেল। তিন ঘণ্টা ধরে হিটলার চিৎকার করে অবশেষে শ্রান্ত হয়ে বললেন,—"সব শেষ। এখন আমার মরা ছাড়া অন্য পথ নেই। আমি শেষ পর্যন্ত এখানে থাকব। আর লড়াই করে লাভ নেই, গোয়েরিংকে খবর পাঠাও, সন্ধির জন্যে ব্যবস্থা করুক।"

খবর গেল গোয়েরিংএর কাছে। উত্তরে গোয়েরিং বেতারে জানালো—'মহামান্য ফুরের, যদি আপনি আমার সর্বময় কর্তৃত্ব দান করতে পারেন তা হলে আমি অগ্রসর হই। আজ রাত দশটার মধ্যে যদি কোন খবর না পাই তা'হলে বুঝবো আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত আছেন, এবং তা হলে আমি তদনুরূপ ব্যবস্থা করব।'

গোয়েরিং তার পার্শ্বরক্ষীদের জানালো যে আগামীকাল জেনারেল আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এরোপ্লেনে রওনা হবে। অন্তরে অন্তরে মহাখুশি গোয়েরিং। আইসেনহাওয়ারের কাছে একটি বেতার বার্তা পাঠাবার জন্যে খসড়া তৈরি করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেতারে প্রত্যুত্তর এলো—'গোয়েরিং, তোমার আচরণ মৃত্যু-দণ্ডাদেশ পাবার উপযুক্ত। তুমি এখনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে। তা না করলে তোমার সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে। —অ্যাডল্ফ হিটলার।'

বড় বড় চোখে গোয়েরিং বেতার বার্তাটি পড়ছে এমন সময় এস্ এস্ বাহিনীর লোক এসে ঘরে ঢুকলো। গোয়েরিংকে গ্রেপ্তার করবার আদেশ এসেছে। সুতরাং তাঁকে হাজতে যেতে হবে। অবিশ্বাস্য ঘটনাচক্র।

তারপর হিটলারের আদেশে বার্লিনের পথে পথে যে লড়াই চলল, দেশের উদ্ধার নেতার আদেশে প্রাণ বলিদানের সে এক মর্মন্তুদ দৃশ্য। হাজার হাজার জার্মান পথের ধারে মরে পড়ে রইল। একস্থানে একদল বন্দুকধারী সৈন্য নিহত হয়ে শুয়ে আছে। তাদের কারুর বয়স বোধহয় কুড়ির বেশী নয়, ওরানার্স পোলের কাছে ৬০০ জার্মান বালক হাত বোমার সাহায্যে রুশ ট্যাঙ্ক বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে মারা পড়ল। মৃত সৈন্যের স্তূপে পথঘাট আকীর্ণ হল।

এদিকে ফুরের-এর বাংকারে [পাতালপুরীতে] অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটতে লাগলো। সেখানে সর্বসমেত ২৩ জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং তাদের ৩০ জন মেয়ে-সেক্রেটারী আর কয়েকজন রক্ষী অবস্থান করছিল। তারা সবাই যেন পাগল হয়ে গেল। রুশ কামানের গোলা পড়ছে চারিদিকে। কাঁপছে ধরাতল। ভ্রূক্ষেপ নেই তাদের। পাতালপুরীতে তখন মদের স্রোত বইছে। জামা খুলে ফেলে জার্মান অধিনায়করা উন্মত্তের মত তাদের মেয়ে-সেক্রেটারীদের কোমর জড়িয়ে ধরে নাচতে শুরু করেছে। মদের নেশায় আবোল তাবোল বকছে সবাই। হাসছে পাগলের মতো।

২৮শে এপ্রিল খবর এলো হিটলারের শেষ বিশ্বস্ত সেনানায়ক হিমলার শত্রুপক্ষের কাছে আত্ম-সমর্পণের প্রস্তাব জানিয়েছে। ভেঙে পড়লেন হিটলার,—শেষ পর্যন্ত হিমলার তুমিও। অতএব শেষ হোক সব।"

২৯শে এপ্রিল সকালে হিটলারের সঙ্গে ইভাব্রনের বিবাহ হল। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে কাজ সারা হোল। কুল কামানের গোলা তখন প্রায় তাদের মাথার ওপর এসে পড়ছে। কাঁপছে পাতালপুরী থরথর করে। ৩০শে এপ্রিল সংবাদ এলো আগামীকালের মধ্যেই রাজধানীর পতন হবে। হিটলার বললেন—"তা হলে আর দেরী নয়, তারা জীবন্ত পাবে না আমায়। যে আদেশ দিয়েছি তা যেন মনে থাকে। আমাদের দেহ পুড়িয়ে ফেলবে। নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। বিদায় বন্ধুগণ।"—এই বলে বিদায় নিলেন সকলের কাছে। তাঁর দুই চোখ তখনো জ্বলছে। কীণ কণ্ঠস্বর যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে। নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন ধীরে ধীরে।

তখন আবার শুরু হল নাচ গান। উন্মত্ত চীৎকার চারিদিকে। মদের বোতল খোলার শব্দ। মাথার ওপর কামান গর্জন শোনা যাচ্ছে। ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্।

ইভাকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন হিটলার। একজন রক্ষী দরজার সামনে পাহারায় দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত কাটলো নীরবে, তার পর ঘরের মধ্যে পিস্তলের শব্দ শোনা গেল। শেষ হল সংগ্রাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমরনায়ক ছিলেন সার আর্চিবল্ড ওয়াভেল। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একবার কেম্ব্রিজে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

সেনাধ্যক্ষ হওয়ার কলাকৌশল সম্বন্ধে আলোচনাকালে তিনি বলে উঠলেন,—'যখন তোমাদের যুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করতে হবে তখন সমরবিদ্যার রূপরেখা বা যুদ্ধের মূলনীতি পড়তে যেও না; তখন পড়বে জীবনী-সাহিত্য, স্মৃতিকথা, ঐতিহাসিক উপন্যাস—যেমন The Road to Glory বা Schoenbrunn, সমর বিদ্যার কঙ্কালরূপ বর্ণন না করে তার রক্ত মাংসের পরিচয় নিও।'

জীবনের ব্যাপকতা এ যুগের সাহিত্যে প্রতিফলিত। এ যুগের মানুষ তার মধ্যে অন্বেষণ করছে জীবনের জটিলতা।

সেকালের সভা সমিতি

কলিকাতা সারস্বত সম্মিলনী

ঊনবিংশ শতকের আর একটি সভা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যমে স্থাপিত হয়। সঞ্জীবনী সভার উদ্যোগে যখন দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন সম্ভব হইল না তখন বাঙলা ভাষার উন্নতির জন্য "কলিকাতা সারস্বত-সম্মিলনী" স্থাপিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সমসাময়িক সকল প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণই এ সভার সভ্য ছিলেন। বঙ্কিমবাবু এ সভার নাম ইংরাজীতে 'Academy of Bengali Literature' রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সহযোগী সভাপতি ছিলেন।

সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তিনটি। প্রথম, বঙ্গ ভাষার অভাব মোচন; দ্বিতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থসমালোচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতিসাধন ও উৎসাহবর্ধন; এবং তৃতীয়, বঙ্গ সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ স্থাপন। এই সভা স্থাপন কালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত অনুষ্ঠানপত্র ও নিয়মাবলীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

বিদ্বজ্জনগণের একত্র সম্মিলনের অনেকগুলি শুভফল আছে :—

(১) সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরস্পর দেখাশুনা হয়, ও সৌহার্দ জন্মে।

(২) পরস্পরের মধ্যে ভাবের ও মতের আদান প্রদান হওয়ায়, একদেশদর্শিতা ঘুচিয়া যায় ও উদারতার বৃদ্ধি হয়।

(৩) এই বিদ্বজ্জন-সম্মিলনের উপলক্ষ্যে, আমাদের বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে বহুবিধ শুভ কার্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যথা—

(ক) বঙ্গভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শনের অনুশীলন করিতে হইলে যে সকল নূতন কথাসৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তাহা আলোচিত ও নির্ধারিত হইতে পারে এবং তৎসঙ্গে বঙ্গভাষার সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ একখানি অভিধানও সঙ্কলিত হইতে পারে।

(খ) বিদেশীয় ভাষার শব্দসমূহ বাঙলা অক্ষরে প্রকাশ করিতে হইলে, নূতন যে সকল অক্ষরের আবশ্যক হয়, তাহা সৃষ্টি করিয়া প্রচলিত করা যাইতে পারে।

(গ) বাঙলা গ্রন্থের নিরপেক্ষ ও যথাযোগ্য সমালোচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধন হইতে পারে।

(ঘ) সুলেখক দিগকে সভা হইতে যথোপযুক্ত সম্মান দেওয়া যাইতে পারে।

(ঙ) প্রবন্ধ বা পুস্তক রচনা করিয়া অথবা সংবাদপত্র বা সময়পত্রের সম্পাদকতা করিয়া যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা বাঙলা ভাষার অনুশীলনে বিশেষ অনুরাগী, তাঁহারাই এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন।

(৪) যাঁহারা গ্রন্থাদি না লিখিলেও যাঁহাকে সভ্যগণ সারস্বত সভার যোগ্য বিবেচনা করিবেন, অর্থাৎ যাঁহার দ্বারা সভার উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য হইতে পারিবে, তাঁহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারিবে

(৬) সভায় বাঙ্গলা গ্রন্থসমূহ বঙ্গভাষায় সমালোচিত হইবে, অথবা ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোন বিষয়ক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ, অন্য ভাষায় রচিত হইলে সভায় তাহারও সমালোচনা হইতে পারিবে।

(৭) যে সকল সমালোচ্য গ্রন্থ সভায় উপস্থিত হইবে, সম্পাদক তাহা সভা-সমক্ষে উপস্থিত করিলে সভাপতি তাহার সমালোচক স্থির করিয়া দিবেন।

(৮) যে অধিবেশনে পুস্তকের সমালোচনা পাঠ হইবে—তাহার পরের অধিবেশনে সমালোচনা-লিখিত তর্ক-বিতর্কের সারাংশ ও সমালোচ্য গ্রন্থখানি সম্বন্ধে সভাপতি তাঁহার নিজ মত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিবেন।

(৯) সভার অন্যান্য কার্য্যবিবরণের সহিত লিখিত সমালোচনার সংক্ষিপ্তসার ও তর্ক-বিতর্কের সারাংশ এবং তৎসম্বন্ধে সভাপতির অভিপ্রায় সাধারণের অবগতির জন্য কোন প্রসিদ্ধ সমবর্ত্তপত্রে প্রকাশিত হইবে। সভায় যে কোনও মত ব্যক্ত হইবে, তাহা সভার মত বলিয়া গৃহীত না হইয়া ব্যক্তিগত মত স্বরূপে গৃহীত হইবে।

(১০) সমালোচনা প্রভৃতি কার্য্য না থাকিলে অথবা কার্য্য শেষ হইয়াও যথেষ্ট অবসর থাকিলে, সভ্যদিগের মধ্যে কেহ সভার নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয় সম্বন্ধে পাঠ অথবা মৌখিক বক্তৃতা বা পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারিবেন, ও তাহা লইয়া বাদানুবাদ চলিতে পারিবে। সমালোচনা, প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদির কার্য্য না থাকিলে সঙ্গীতাদি হইতে পারিবে।

কথায় আছে 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।' জ্যোতিবাবুর মাথায় এই কল্পনা উদয় হইতেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পরামর্শের জন্য গেলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—'তোমরা বড়মানুষের ছেলে, কোনও বদ-খেয়ালি না করিয়া এই সব লইয়া যদি সময় কাটাও, ত সে ভালই। কিন্তু, বাবা, একটা কথা আমি তোমাদের বলিয়া দিতেছি। বড় বড় হোমরা-চোমরা লোকদের ইহার মধ্যে লইও না—তাহা হইলেই সব মাটি হইয়া যাইবে।' ঈশ্বরচন্দ্র উৎসাহ দিলেন কিন্তু সভায় যোগ দিতে রাজী হইলেন না।

কিন্তু কার্য্যতঃ হোমরা-চোমরা লোক লইয়াই কার্য্য আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় হইলেন সম্মিলনীর প্রথম সভাপতি। ভূগোলোর ইংরাজী শব্দের পরিভাষা তিনি নিজেই লিখিতে সুরু করিয়া দিলেন ও 'ভৌগোলিক পরিভাষা' [? ১২৯০] প্রকাশিত হইল। দুই তিন অধিবেশন পর্য্যন্ত বেশ কাজ চলিয়াছিল—কিন্তু তাহার পরেই নানা কারণে সভা বন্ধ হইয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গেল। সভা একটুখানি অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইয়া গেল।

পুরাতন পাত্র

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা [গত সংখ্যার পর]

'পরব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা জানাইবার নিমিত্ত আমাদিগের শাস্ত্রের সারমর্ম সংগৃহীত হইবেক।

'বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক।

'কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

'বৈষয়িক সম্বাদপত্রে পরমার্থঘটিত রচনা প্রকাশের প্রথা না থাকাতে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি আপনাদিগের অভিলষিত রচনা প্রকাশ করিতে অশক্ত ছিলেন। অতএব এই পত্রিকা প্রকাশ হইয়া তাঁহাদিগের সেই বিষয়তা এইক্ষণে নিবৃত্ত হইল এবং সর্বসাধারণ সমীপে মনোগত জ্ঞানালোকের প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় হইল।

'এই অমূল্য পত্রিকা তাহার চিরজীবন, এক বৎসর কাল পর্যন্ত প্রতি মাসের প্রথম দিবসে উদিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের এবং তাহার বন্ধুদিগের মনোরঞ্জন করিবেন। যদি তাহাদিগের স্নেহের দ্বারা এই পত্রিকার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, তবে তৎকালে ইহার সমাচার দেওয়া যাইবেক।'

পত্রিকাতে রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী এবং অন্যান্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রসঙ্গী গ্রন্থ প্রকাশের কথা বড়ই সময়োপযোগী ও শিক্ষিতমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের জীবিতকালে এ-দেশবাসী অনেকে তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর দেহান্তর প্রাপ্তির পর এ-দেশের শিক্ষিতমণ্ডলী তাঁর মহত্ত্ব উপলব্ধি করে, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর প্রতি যে দেশের লোকের একটা টান হয়েছিল, তাহা উপরোক্ত ঘোষণাপত্র থেকে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। তাই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী প্রকাশের কথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে বড়ই উপাদেয় লেগেছিল। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণের কাছে পত্রিকা বিনামূল্যে প্রেরিত হইত।

ঘোষণাপত্রের আরো দু'একটি বিষয় শিক্ষিত পাঠক সম্প্রদায়ের এবং সমগ্র হিন্দু সমাজের প্রীতিদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থে আমাদের শাস্ত্রের সারমর্ম সংগ্রহ করা তাদের অন্যতম। এইখানেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়িক ভাব দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু এর ফলে ব্রাহ্মসভার পক্ষপাতী ও বিরোধী উভয় সম্প্রদায়ের বিবাদ-বিসম্বাদ ঘুচে গিয়ে মিলনের পথ প্রশস্ত হলো। শাস্ত্র-সাহায্যে ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করবার কারণে আমাদের জাতীয় সম্মান পরিরক্ষিত হোল এবং সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাও হিন্দুসমাজের আদরের সামগ্রী হয়ে উঠতে লাগল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আর একটি বিষয়ের সূত্রপাত করে বঙ্গের তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজকে চমকিত করে তুলেছিল। বঙ্গ ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয় নিয়মিতরূপে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হওয়া সে কালের লোকদের কাছে খুবই নূতন বোধ হয়েছিল। ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা ও অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করবার অঙ্গীকারবশে বিজ্ঞান বিষয়ক নানা প্রবন্ধ সচিত্র হয়ে পত্রিকার অঙ্গ ভূষিত করতে লাগল। আমরা জানি যে সেকালে বঙ্গের শিক্ষিত মণ্ডলীর অনেকে এই সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ প্রতীক্ষা করে থাকতেন। তাঁরা প্রথম প্রথম বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সুচারুরূপে লেখা যেতে পারে।

এই উন্নত ঘোষণাপত্র সম্মুখে রেখে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে স্বীয় কর্তব্য সাধন করে চলতে লাগল। দেবেন্দ্রনাথ একটি বৎসর কারো সঙ্গে কোন প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদে যাবেন নি। প্রথমে তাঁর আশাই ছিল না যে, পত্রিকা এক বৎসরেও জন্য লোকের তত্ত্বতত্ত্বক হয়ে চলতে পারবে। কিন্তু এক বৎসরের পরিবর্তে পত্রিকা নির্বিঘ্নে দুই বৎসর কাটিয়া গেল এবং পত্রিকার মতামতের উপর লোকে শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে লাগল। ডফ্ সাহেব হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের উপর গালাগালি বর্ষণ করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ সেটা ভুলতে পারেন নি। যখন, বলতে গেলে, পত্রিকার পাঠক তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য এবং ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষিত সভ্য নিয়ে একটি সম্প্রদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হোল, তখন দেবেন্দ্রনাথ ডফ্ সাহেবের সেই 'India and India's Missions' পুস্তিকার প্রতিবাদে 'Vedantic doctrines vindicated' এবং 'Rational analysis of the Gospel' নামক দুইটি প্রবন্ধ লিখে পত্রিকায় প্রকাশ করেন। শুনেছি যে, শেষোক্ত প্রবন্ধে খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব খণ্ডিত হয়েছে দেখে ডফ্ সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, তার নাম দিয়েছিলেন 'The irrational paralysis of the Gospel'। পূর্বেই বলে এসেছি যে, ডফ্ সাহেবের প্রচারগুণে তদানীন্তন শিক্ষিত মণ্ডলীর অনেকে খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কেহই আশা করতে পারেন নি যে, কোন শিক্ষিত ভারতবাসী আবার হিন্দুধর্মের সমর্থনে লেখনীধারণে অগ্রসর হবেন। উপরোক্ত দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শক্তিমত্তা শিক্ষিত সমাজে স্বীকৃত হোল। আর ডফ্ সাহেবের সঙ্গে বাদানুবাদের ফলে, তত্ত্ববোধিনী সভার এবং সেই সভার ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছিল, সেই ব্রহ্মসমাজেরও জাতীয় হিন্দুভাব পরিস্ফুট হয়ে পড়ল। এইরূপে নানা উপায়ে বলতে গেলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই এদেশে প্রথম জাতীয় ভাবের পত্তন করে দেয়।

লেখকদের পক্ষে লেখা আরম্ভ করাটাই একটা মহাসমস্যা। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে লেখবার আগে কুড়িটা পেনসিল কাটতেন। উইলা ক্যাথার লেখা আরম্ভ করার পূর্বে প্রত্যহ বাইবেলের একটি অধ্যায় পড়তেন। টমাস উলফ্ সারা রাত ধরে ব্রুকলিনের পথে পথে হাঁটতেন।

উপেন্দ্রনাথ স্মরণে

দু'বছর হল উপেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেছেন। তিনি ইহলোকে নেই, কিন্তু তাঁর অকৃপণ সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে বাঙালা পাঠকসমাজে নিত্য তিনি বিরাজমান। গল্প-ভারতীর সহিতও তাঁর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। উপেন্দ্রনাথের স্মৃতি আমাদের মর্মের মণিকোঠায়।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে উপেন্দ্রনাথ ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন গল্প-ভারতীকে তিনি মনের মতন করে সাজিয়ে তুলবেন রবীন্দ্রস্মৃতি চারণায়। 'গল্প ভারতীর' রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যার বিপুল সার্থকতা তিনি স্বচক্ষে দেখে যেতে পারেন নি। দেশ-বিদেশ অভিনন্দিত 'গল্প ভারতীর রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী' সংখ্যা উপেন্দ্রনাথের রবীন্দ্র অনুরাগ সিক্তির বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

উপেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র অনুরাগী ভক্ত এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন। 'বিচিত্রা' সম্পাদনাকালে রবীন্দ্রনাথের সহিত উপেন্দ্রনাথের দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ মেলামেশার অনুরাগমণ্ডিত কাহিনী 'স্মৃতিকথা' এবং 'বিগত-দিনের' পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর শেষ পর্যায়ে উপেন্দ্রনাথ রচিত একটি রবীন্দ্র-স্মৃতি কাহিনী মুদ্রিত করে আমরা উপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বার্ষিক মৃত্যু তিথি পালন করলাম।

অমর্ত্য উপেন্দ্রনাথ।

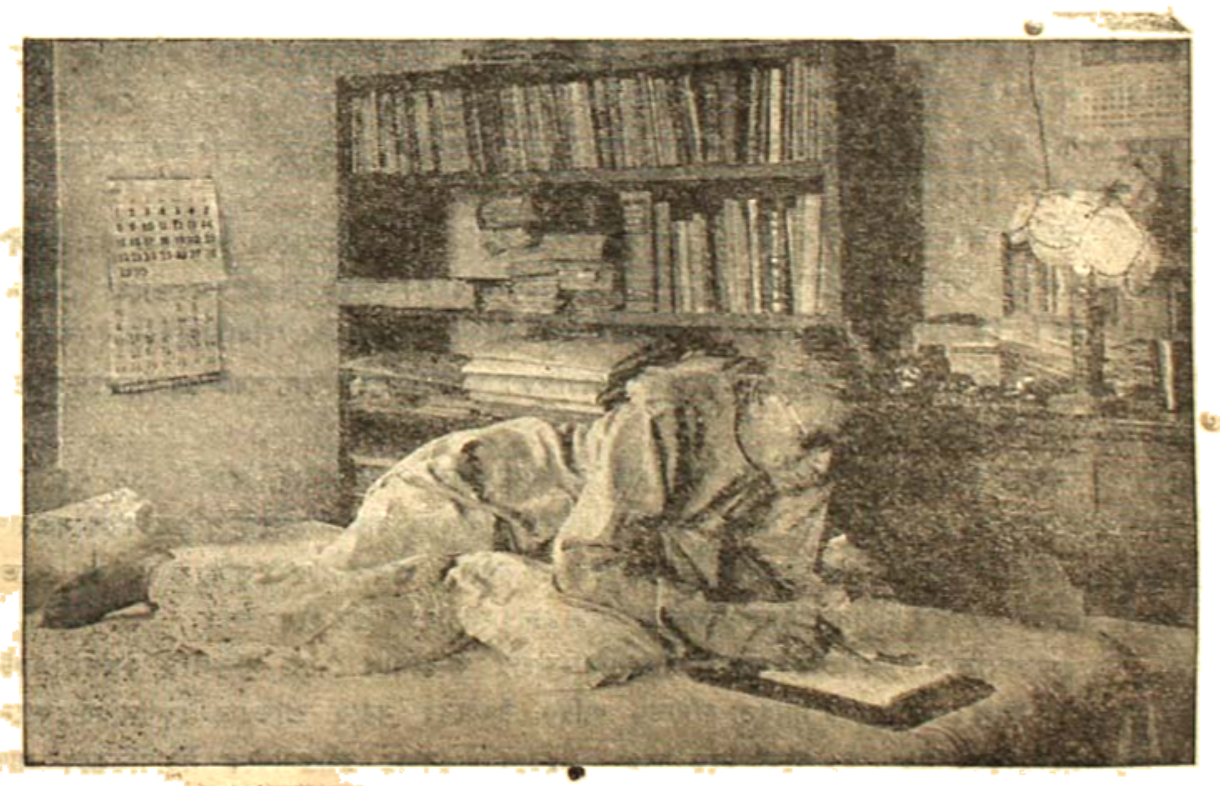

গল্প-ভারতী সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ "মাটির পথ" উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত।

উপেন্দ্র-স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথ

যথাসাময়িকতা বনাম সময়নিষ্ঠা

তখনকার দিনে আমরা ভারতবর্ষীয়েরা বিশেষত বাঙালীরা, মনে-প্রাণে আলস্য-বিলাসী। আলস্যের সঙ্গেও দীর্ঘ সূত্রতার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তাই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলীন 'Translation and Retranslation' গ্রন্থে Procrastination-এর প্রতিশব্দ 'দীর্ঘসূত্রতা' পাওয়া গিয়েছিল: 'Procrastination is the thief of time—দীর্ঘ সূত্রতা সময়াপহারক বাক্যটির মধ্যে বেঞ্জামিন অবশ্য Punctuality-র সম্বন্ধে ওকালতির সূত্রপাত করেছিলেন, কিন্তু সময় রক্ষা ক'রে চলার গুণটিকে ইংরাজী Punctuality শব্দ হতে বাংলার প্রতিশব্দে মূর্তিমান করতে সক্ষম হন নি তিনি।

Punctuality শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নির্ণীত করতে অসমর্থ হয়ে আমরা অবশেষে আমাদের সহপাঠী বন্ধুবর নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হলাম। নিম্নশ্রেণী হতে নলিনী সংস্কৃতে বড়। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই সে সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে এসেছে। পরে সংস্কৃত ভাষার এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করে। একদা 'প্রিন্স্' গভর্ণমেণ্ট কলেজে'র সুযোগ্য অধ্যক্ষ নলিনী শাস্ত্রীকে না চিনত এবং না শ্রদ্ধা করত, আসাম প্রদেশে লেখাপড়া জানা এমন লোকই ছিল না।

নলিনী অবিলম্বে আমাদিগকে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু দান করলে,—যথাসাময়িকতা। পেলাম বটে, কিন্তু মনের মধ্যে গভীর বেদনাও পেলাম। সাড়ে পাঁচটার মীটিঙে হন্তদন্ত ক'রে কোনরকমে সাড়ে পাঁচটার সময়ে উপস্থিত হতে পারলে যথাসাময়িকতা রক্ষা করা হবে? একি ব্যাপার। বেলা দশটার সময়ে আসবে ব'লে নাপিত এগারোটার সময়ে এলে তাকে বলতে হবে, ওহে, তুমি আর একটু যথাসাময়িক হতে পার না? তবেই হয়েছে।

নলিনী আমাদের আশ্বাস দিলে যথাসাময়িকতা পদটি প্রত্যয়-প্রকরণের কয়েকটি পয়ঃপ্রণালী নির্বিঘ্নে পার হয়ে আমাদের তটে পৌঁছেছে.—সুতরাং তার ব্যাকরণ-বিশুদ্ধির বিষয়ে অপ্রত্যয়ের কোনো কারণ নেই। কি উপায়ে 'যথাসময়' 'যথাসাময়িকে', এবং 'যথাসাময়িক' 'যথাসাময়িকতাই' উপনীত হতে পারল, সে বিষয়ে নলিনী আমাদিগকে একটা বৈয়াকরণ ব্যাখ্যা দিয়ে বললে, পদটি শুধু ব্যাকরণ-সম্মতই হয় নি, পরন্তু সুললিতও হয়েছে।

আমরা যখন ব্যাকরণ-কৌমুদীর অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে হোঁচট খাচ্ছি, নলিনী তখন মুগ্ধবোধ-পাণিনি-মহাসাগরের তলদেশ মথিত ক'রে জ্ঞানের মণিমুক্তা আহরণের দ্বারা নিজেকে পণ্ডিত ব'লে সপ্রমাণ করেছে। সুতরাং প্রকান্তে নিরুত্তর থেকে আমরা মনে মনে বললাম, রাজার নন্দিনী তুমি, যা বল তা শোভা পায়। মনের মধ্যে কিন্তু যথাসাময়িকতার বিরুদ্ধে একটা জোর অবাধ্য জাগ্রত হয়ে রইল।

সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই যথাসাময়িকতার অট্টোপাশ থেকে মুক্তিলাভ করবার একটা সুযোগ দেখা দিলে। আমাদের সাহিত্য-সমিতির বার্ষিক উৎসবের সময়ে প্রতিবার কোনো-না-কোনো বিশিষ্ট সাহিত্যিককে সভাপতির পদের জন্যে সংগ্রহ করতাম। সেবার রবীন্দ্রনাথকে সভাপতিরূপে লাভ করবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জাগ্রত হ'ল। যতদূর মনে পড়ে, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ

সেন, শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় ও আমি—বন্ধু চতুষ্টয়, একদিন জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের গৃহে গিয়ে হাজির হলাম। সে সময় রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ ছিলেন ব'লে সভাপতির পদ গ্রহণ করতে পারলেন না, কিন্তু আমাদের সাহিত্য-সমিতির প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আগ্রহশীল হয়ে সে বিষয়ে অনেক আলাপ আলোচনা করলেন।

কথায় কথায় এক সময়ে আমি বললাম, 'একটা বিষয় নিয়ে আমরা একটু কাতর হয়ে আছি, আপনি যদি দয়া ক'রে একটা উপায় করেন।'

আমার অনুরোধ শুনে যৎপরোনাস্তি কৌতূহলী হয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "বল কিহে! তোমরা কাতর হয়ে আছ,—আর আমি তার উপায় করতে পারি?"

বললাম, "আমার তো মনে হয় নিশ্চয় পারেন।"

"কি ব্যাপার বল দেখি?"

বললাম, "ইংরাজী পাংচুয়ালিটি শব্দের ছোটখাট বাংলা প্রতিশব্দ কি হবে, তা আমরা কিছুতেই ঠিক ক'রে উঠতে পারছিলাম না। আমাদের একজন সংস্কৃতবিশারদ বন্ধু 'পাংচুয়ালিটির' বাংলা করেছেন 'যথাসাময়িকতা।' তিনি বলেন, যথাসাময়িকতা ব্যাকরণশুদ্ধ; কিন্তু এত লম্বা কথা আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিনে।"

আমার কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ একটু চিন্তা করলেন; তারপর বললেন, "পাংচুয়ালিটির" বাংলা 'সময়নিষ্ঠা' হতে পারে, কাজে কাজেই পাংচুয়ালের বাংলা 'সময়নিষ্ঠ।'

একটা অন্ধকার ঘরে সুইচ নামিয়ে দিলে সহসা ঘরটা যেমন আলোকিত হয়ে ওঠে, আমাদের মনও ঠিক তেমনিভাবে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। কি চমৎকার! যেমন অর্থপূর্ণ, তেমনি শ্রুতিমধুর, আর তেমনি অর্থব্যঞ্জক। গভীর জ্ঞান এবং সৌন্দর্যবোধের ফলই আলাদা।

এর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'সময়নিষ্ঠা' শব্দ নিজে কখনো ব্যবহার করেছিলেন কি না, অথবা অপরকে ব্যবহার করতে দেখেছিলেন কি-না, তা জানিনে; কিন্তু যেভাবে তিনি আমার কথা শুনে একটু চিন্তা ক'রে তারপর কথাটি বলেছিলেন, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেইদিন সেই সময়েই তিনি কথাটি রচিত করেছিলেন। অর্থাৎ 'সময়নিষ্ঠা' এবং 'সময়নিষ্ঠ' শব্দ দুটি সেইদিনই প্রথম সৃষ্টি লাভ করেছিল।

'যথাসাময়িকতা'কে পশ্চাতে ফেলে হালকা মন নিয়ে আমরা সেদিন ভবানীপুরে ফিরেছিলাম।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দেশ-বিদেশ

তাসখিকিস্তানে ভারতীয় কলা কেন্দ্র

ভারতের ভারতীয় কলা কেন্দ্রের নৃত্য সম্প্রদায় তাজিক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী স্তালিনাবাদের সফর শেষ করিয়াছেন। সফরকালে তাঁহারা "কুমারসম্ভব" ব্যালে নৃত্য-নাট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুষ্ঠানে সকলের মধ্যেই প্রচুর উৎসাহের সঞ্চার হয়।

তাজিকদের নিকট নৃত্য খুবই প্রিয়। সুতরাং ভারতীয় কলা কেন্দ্রের ব্যালে নৃত্য দেখিবার জন্য সকল টিকিট নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বিক্রয় হইয়া যাওয়াতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। ভারতীয়দের মূল নৃত্য দেখিবার জন্য এত লোকের মধ্যে আগ্রহ দেখা যায় যে, এই অতিথি নৃত্য-সম্প্রদায়ের পরিকল্পিত দুইটি অনুষ্ঠানের পরিবর্তে তিনটি অনুষ্ঠানে রাজী হইতে হয়।

ভারতীয় নৃত্য-সম্প্রদায়ের নৃত্যাংশে অংশগ্রহণকারী সকলেরই অপূর্ব ছন্দায়িত মনোরম প্রকাশভঙ্গি দেখিয়া স্থানীয় সংবাদপত্র কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে।

নৃত্যপরিকল্পনা ও নৃত্যে অংশগ্রহণকারী ব্রিজমোহন মহারাজ বিশেষভাবে প্রশংসা অর্জন করেন। "কমিউনিস্ট তাজিকিস্তানা" উহার ব্যালে নৃত্যের পর্যালোচনায় উল্লেখ করেন যে, ব্রিজমোহন মহারাজ তাঁহার কামদেবের ভূমিকায় অপূর্ব গতিশীল এবং চরিত্রানুগ ছিলেন। তাঁহার নৃত্যের উৎকৃষ্ট প্রকাশ ক্ষমতার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তবে উক্ত সংবাদপত্রটি উল্লেখ করেন যে নৃত্যে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কাহাকেও বিশেষভাবে চিহ্নিত করা কঠিন, কারণ তাঁহারা সকলেই হৃদয়গ্রাহী অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। তাঁহাদের অনুষ্ঠান নূতন ধরনের, বিরল রস এবং অমূল্য ভাবধারার সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহাদের অবসর সময়ে অতিথি নৃত্যসম্প্রদায় স্তালিনাবাদের দৃশ্য দেখিয়াছেন এবং তাজিক চলচ্চিত্র স্টুডিও পরিদর্শনের সময় তাঁহারা তাজিক ব্যালে চিত্র "লাইলি এবং মজনু" দেখেন। শিল্পীরা সারা শহর ঘুরিয়া বেড়ান, সহরবাসীদের সহিত আলাপ আলোচনা করেন এবং সর্বত্রই গভীর আদর আপ্যায়ন লাভ করেন। নৃত্যে অংশগ্রহণকারীরা শ্রীমতী কুমুদিনী লাখিয়া তাঁহার ধারণা বর্ণনা করিয়া বলেন,—"আমি দীর্ঘ সময় ধরিয়া স্তালিনাবাদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি এবং পুনঃ পুনঃ আমার এই প্রতীতিই জন্মিয়াছে যে, সহরবাসীদের আমাদের প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা! স্তালিনাবাদ বাসীদের অকপট ও আন্তরিক ভালবাসায় আমি এবং আমার সাথীরা সময় সময় ভুলিয়া যাইতাম যে আমরা আমাদের দেশে নাই। ইহা আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি।"

নৃত্য সম্প্রদায়ের পরিচালক শ্রীযুক্তা আর. এন্. আর. সিং তাজিকিস্তান সম্পর্কে তাঁহার ধারণা বিবৃত করিতে গিয়া বলেন,—"সোভিয়েত ইউনিয়নে আমাদের প্রথম সফর আমরা কখনোই ভুলিব না। আমরা সেখানে আমাদের কলা কৌশলই শুধু প্রদর্শন করি নাই পরন্তু আমরা নিজেরা সেখানে অনেক কিছু দেখিয়াছি এবং শিখিয়াছি। আমাদের ব্যালে নৃত্যে দর্শকমণ্ডলীর ভীড় ও দর্শকমণ্ডলীর হর্ষধ্বনি বিবেচনা করিয়া আমরা বলিতে পারি, উহা যথোপযুক্ত প্রশংসা লাভ করিয়াছে। আমরা স্তালিনাবাদের কলাকুশলীদের সহিত নিঃসংকোচে মিশিয়াছি এবং আলাপ পরিচয় করিয়াছি। তাঁহাদের সহিত একটি অপরিকল্পিত ঐক্যতানে অংশগ্রহণও করিয়াছি। আমরা যাহা দেখিয়াছি তাহাতে এই সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে, উজবেক ও কাজাকদের আমরা কিছুদিন পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি তাঁহাদের

সোভিয়েত প্রজাতান্ত্রিক জর্জিয়ার লোকনৃত্য।

কলাকৌশলের মত তাজিকদের কলাকৌশলও সুস্বরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে। প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রেই অপূর্ব নাট্যশালা, ঐক্যতানের গৃহ এবং বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ রহিয়াছে। এইগুলিই প্রকৃত শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ গড়িয়া তুলিবার পক্ষে সাহায্য করে। উক্ত কলাকুশলীরাই তাঁহাদের শিল্পের মারফত জনগণকে সত্য ও জীবনের অর্থ সম্পর্কে এবং মানবতার উচ্চ নীতিসমূহ সম্পর্কে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। ভারতের বিরাট কলা কৌশলের ক্ষুদ্র একটি অংশ হিসাবে সোভিয়েতের জনগণ আমাদের কলা কৌশলের যে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন তাহাতে আমরা খুবই আনন্দিত। শিল্পের মাধ্যমেই বিভিন্ন দেশের জনগণ

ঘনিষ্ঠতা লাভ করে এবং আমরা উক্ত দেশের জনগণের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক শক্তিশালী করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

বের্লিনের মানবজাতি-তত্ত্ব যাদুঘর

জার্মানীর যাদুঘরগুলোর মধ্যে পশ্চিম বের্লিনের মানবজাতিতত্ত্বের যাদুঘর একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। অতীতে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত রাজা মহারাজাগণ অনেক দুর্লভ বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন তা'ছাড়া বহু ব্যবসায়ী ও গবেষক দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক বিরল সামগ্রী সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন। এইসব অজানা অচেনা জাতির সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলো অনেক সময় ইওরোপীয় সাংস্কৃতিক বস্তুর চাইতে অনেক প্রাচীন।

রাজা ফ্রীড্রিস বিলহেলম ফন ব্রাণ্ডেনবুর্গ সংগৃহীত শিল্প আর দুর্লভ বস্তুর সাহায্যে একটা ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র যাদুঘর স্থাপন করেছিলেন। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বের্লিনের শাসনকর্তা ছিলেন, এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্যে জনসাধারণকে বিভিন্ন অজানা অচেনা দেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে উৎসাহ দান করা ছিল তাঁর একটা প্রধান কাজ। ১৮২৯ সনে তাঁর ব্যক্তিগত যাদুঘরের দুর্লভ বস্তুগুলো রাজপ্রাসাদের বাইরে নিয়ে আসা হয় এবং এগুলো "এথ্‌নগ্রাফিক সংগ্রহ" নাম পরিগ্রহ করে। সাথে সাথে বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিকও এইসব বস্তু সম্পর্কে অনেক কিছু জানবার সুযোগ পান। ১৮৭০ সনে দেশের সাধারণ নারী পুরুষ এইসব বস্তু প্রথম চোখে দেখে। কারণ এই সময় থেকেই এই সব দুর্লভ বস্তুর সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত মানবজাতি-তত্ত্বের একটা সরকারী যাদুঘর দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির সাথে জার্মানীর মানুষের পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

পশ্চিম বের্লিনের ডাহলেম-এলাকায় অবস্থিত মানবজাতি তত্ত্বের যাদুঘরে বর্তমানে সারা দুনিয়ার প্রায় ৪০০০০০ দুর্লভ বস্তু দেখতে পাওয়া যায়। যাদুঘরের বিভিন্ন বিভাগে অতি যত্নের সহিত সাজিয়ে রাখা হয়েছে এইসব বস্তু। যাদুঘরের সমগ্র-আফ্রিকা, প্রাচীন আমেরিকা, সুদূরপ্রাচ্য, উত্তর ও পূর্ব এশিয়া, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, ইওরোপ প্রভৃতি বিভাগগুলো দেখতে দেখতে দর্শকের মনে এক অপরূপ অনুভূতির সঞ্চার হয়।

বের্লিনের এই যাদুঘরের ৪০০০০০ সংগ্রহ অবশ্য একসাথে দেখানো সম্ভব নয়। প্রদর্শনের জন্যে কর্তৃপক্ষ তাই ৪২০০ মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক বস্তু বেছে নিয়েছেন। দর্শকদের জন্যে প্রদর্শনী-কক্ষে এগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা যাদুঘরের ২৭০০০০ বস্তু প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে পারে। যাদুঘরের এক-তৃতীয়াংশ সংগ্রহ বেঁধে-ছেঁদে তুলে রাখা হয়েছে।

বের্লিনের মানবজাতি-তত্ত্ব যাদুঘরের অনেকগুলো সংগ্রহ সত্যিই অনুপম উদাহরণস্বরূপ। তুরস্কান এবং গান্ধারের প্রাচীর-চিত্র ও ভাস্কর্য, আফ্রিকার দুর্লভ সাংস্কৃতিক বস্তু, মধ্য ও দক্ষিণ। আমেরিকার বৃহৎশিল্প সংগ্রহ ও আমেরিকার অন্যান্য অসাধারণ সামগ্রী এবং ক্যাপ্টেন কুকের সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কিত বিভিন্ন সংগ্রহের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রতিদিন বহুসংখ্যক নরনারী বের্লিনের এই যাদুঘর দেখতে আসে। অজানা অচেনা দেশ আর এইসব দেশের মানুষের সংস্কৃতি আর শিল্প সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চায় তারা। গত কয়েক বছরে এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার অনেক দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে, আর তার সাথে সাথে এইসব দেশ সম্পর্কে জার্মানীর জনসাধারণের অনুসন্ধিৎসা আরও বেড়ে গেছে।

জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্র এবং স্বাধীন পশ্চিম বের্লিনের মানুষ এইসব তরুণ রাষ্ট্রকে কতো বেশী আপন মনে করে এই অনুসন্ধিৎসাই হলো তার প্রকৃত নিদর্শন।

॥ শিল্পীর তুলিতে ॥

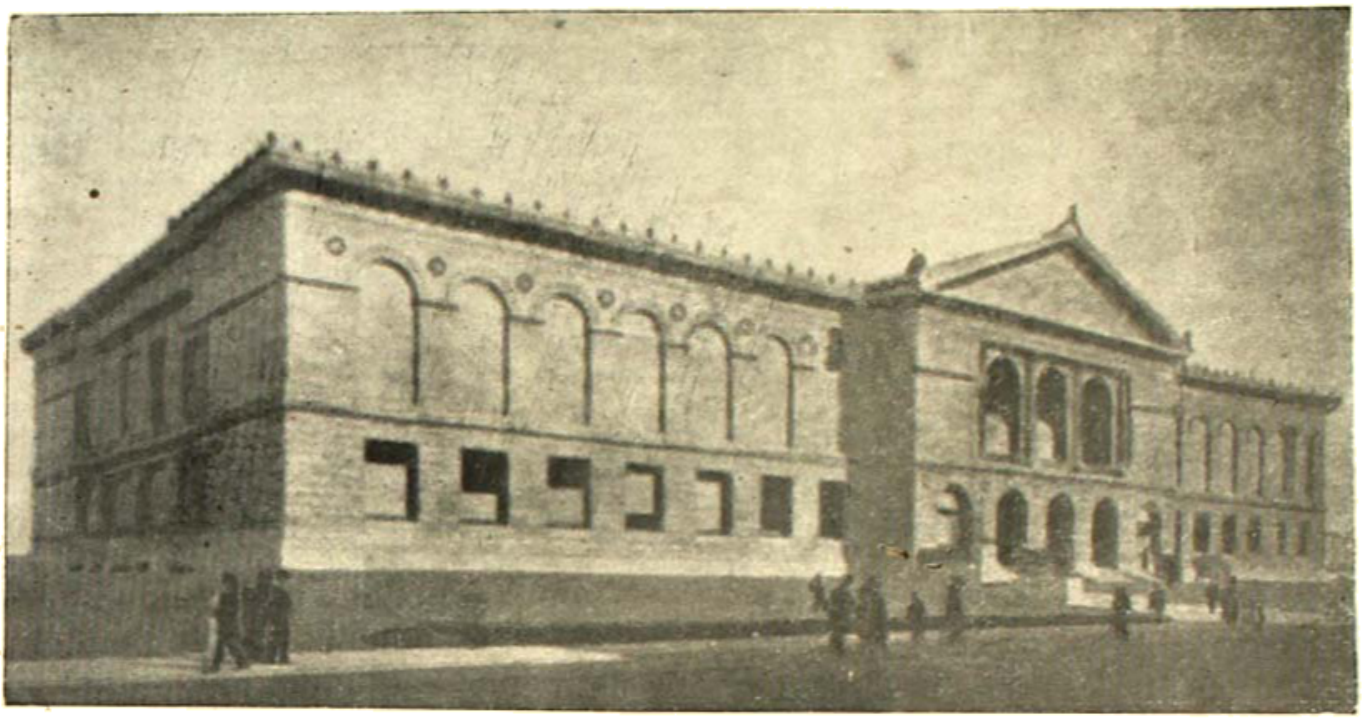

চিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউট—এখানে চিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ)

চিকাগোর 'হেল পরিবারে'র বাড়ী। স্বামী বিবেকানন্দ এই পরিবারের বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং তিনি চিকাগোতে এই বাড়ীতেই বাস করতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ—কায়রো ১৯০০ খৃষ্টাব্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ—মন্টেশ্বর, ১৯০০ খৃষ্টাব্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণে

এ যুগের দিগন্তব্যাপী ঘোর অন্ধকারে যেখানে আমাদের মধ্যে, স্বামীজীর ভাষায়—"মনোবৃত্তির স্ফূর্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, আশার তরঙ্গ নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, তীব্র সুখানুভূতি নাই, বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই, উদ্ভাবনী শক্তির উদ্দীপনা একেবারে নাই, নূতনত্বের ইচ্ছা নাই,—সেখানে তাঁর ইচ্ছাশক্তির অপরূপ প্রকাশ আমাদের চেতনার কঠিন আঘাত দিক।

সাহস, শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস অর্জনের মন্ত্র আমরা স্বামীজীর জীবন থেকে গ্রহণ করব। টাকায় যে কিছুই হয় না, 'নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছুই হয় না, ভালবাসায় সব হয়'—চরিত্রই যে বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে এই জলন্ত সত্য স্বামীজীর জীবন থেকে সংগ্রহ করব। 'আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই, যাহাতে আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে। আমাদের এমন সব মতবাদের আবশ্যক—যাহা আমাদিগকে মানুষ করে। যাহাতে মানুষ প্রস্তুত হয়, এমন সর্বাঙ্গসম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজন।' স্বামীজীর কাছে আমরা মানুষ হওয়ার মন্ত্রে দীক্ষা নেব। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এই অভয়বাণী শোনাবার জন্যই তাঁর পবিত্র আবির্ভাব। তাঁরই আদর্শ অনুসরণ করে আমরা এ যুগের সমস্যার সমাধান অন্বেষণ করব।

এ দেশের মানুষ মানুষকেই ভুলে গিয়েছিল। স্বামীজী তাঁর জীবনাদর্শে মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুললেন। তিনি সকল দেশবাসীর কাছে উদাত্ত আহ্বান প্রেরণ করলেন, আবার তোমরা মানুষ হও। হে বীর জাগ্রত হও। উপেক্ষিত, নির্যাতিত নরনারীর সেবায় নিজেদের উৎসর্গ কর। দেশ ও জাতির সেবার মধ্যেই তোমাদের সকল শক্তি নিহিত রয়েছে, রয়েছে তোমাদের মুক্তি।

স্বামীজীর বজ্রগর্ভ বাণী আমাদের কানে ধ্বনিত হচ্ছে। ভারত আজ স্বাধীন কিন্তু কোথায় ভারতের আত্মধর্ম! কোথায় মানুষের মর্যাদা! মানুষের মত মাথা উঁচু করেই আমাদের বাঁচতে হবে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার পথ স্বামীজী জাতিকে দেখিয়েছেন। আমরা সকলে বাংলার সেই বীর সন্ন্যাসীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করব। স্বামীজী জাতিকে সেবা শক্তি ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করুন।

ভারতের শাশ্বত আত্মার যে অনির্বচনীয় প্রকাশ স্বামী বিবেকানন্দ আজ তাঁর মহাপুণ্যময় স্মৃতির পদতলে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করব, স্বাধীন ভারতের নরনারী তোমার সাধনা ও সিদ্ধির উত্তরাধিকারী হয়ে মানুষের মধ্যে দুর্জয় শক্তি ও প্রেমের লীলা প্রত্যক্ষ করুক। তোমার অভয় আশীর্বাদের সঞ্জীবনী মন্ত্রে কঙ্কালে প্রাণের সঞ্চার হোক, আজ নিশ্চয় করে উপলব্ধি করব—নির্জীব জড় পদার্থের মত পড়ে থাকার দিন গেছে, বীরের মত উন্নত মস্তকে স্বাধিকার ও কর্তব্যকে নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে গ্রহণ করার শুভ মুহূর্ত সমাগত। আমাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ও তুচ্ছ লোভের ওপর তোমার রোষবহ্নি পড়ুক,—তোমার অভয়বাণী আমাদের মনুষ্যত্বকে কঠিনবীর্য পৌরুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুক, "বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু! তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না, কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে।"

ভালবাসা কখন বিফল হয় না। আজই হউক, কালই হউক, শত শত যুগ পরেই হউক, প্রেমের জয় হইবেই। তোমরা কি মনুষ্যজাতিকে ভালবাস? ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? প্রেমের সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস সম্পন্ন হও।

স্বামী বিবেকানন্দ

কেবল কৃষির উন্নতিতেই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে না। তার জন্যে চাই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে শিল্পোন্নয়নের সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা। পরিকল্পনা গঠনকারীদের স্থিরচিত্তে বিচার করতে হবে, কোন কোন দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন করা সম্ভব, আর কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদন নীতি গ্রহণ করা কর্তব্য। আধুনিক শিল্পবিপ্লবকে আমরা যতই অপছন্দ করি, ইচ্ছে থাকলেও আর শিল্পপূর্ব যুগে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

আজ আমি জানি, বাংলাদেশের জননায়কের প্রধান পদ সুভাষচন্দ্রের, সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি যে আসন গ্রহণের সাধনা করে আসছেন সে পলিটিক্সের আসরে। আজকেকার এই গোলমালের মধ্যে আমার মন আঁকড়ে ধরে আছে বাংলাকে, যে বাংলাকে আমরা বড় করব সেই বাংলাকে বড়ো করে লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ। তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবেন এই আশা করে আমি সুদৃঢ় সংকল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং এই অধ্যবসায়ে তিনি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে। বাংলাদেশের সার্থকতা, বহন করে বাঙালী প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতীয় রাষ্ট্রসভায়। সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ হোক সুভাষচন্দ্রের তপস্যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুভাষচন্দ্র

গুরুদেব! আপনি বিশ্বমানবের শাশ্বত কণ্ঠে আমাদের সুপ্তোত্থিত জাতির আশা আকাঙ্খাকে রূপ দিয়েছেন। আপনি চিরকাল নবকুসুমী যৌবনশক্তির বাণী শুনিয়ে আসছেন। আপনি শুধু কাব্যের বা শিল্পকলার রচয়িতা নন। আপনার জীবনে কাব্য এবং শিল্পকলা রূপ পরিগ্রহ করেছে। আপনি শুধু ভারতের কবি নন—আপনি বিশ্বকবি। আমাদের স্বপ্ন মূর্ত হতে চলেছে দেখে যে সমস্ত কথা, যে সমস্ত চিন্তা, যে সমস্ত ভাব আজ আমাদের অন্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে তাহা আপনি যেমন উপলব্ধি করবেন, তেমন আর কে করবে? যে শুভ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তার হোতা আপনি ব্যতীত আর কে হতে পারবে?

গুরুদেব! আজকার এই জাতীয় যজ্ঞে আমরা আপনাকে পৌরোহিত্যের পদে বরণ করে ধন্য হচ্ছি। আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা "মহাজাতি সদনের" ভিত্তি স্থাপন করুন। যে সমস্ত কল্যাণ প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্তজীবনের আস্বাদ পাবে এবং ব্যক্তির ও জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হবে—এ গৃহ তারই জীবন কেন্দ্র হয়ে মহাজাতি সদন নাম সার্থক করে তুলুক—এই আশীর্বাদ আপনি করুন। এবং আশীর্বাদ করুন যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদের সংগ্রাম পথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সাধনাকে সকল রকমে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে তুলি।

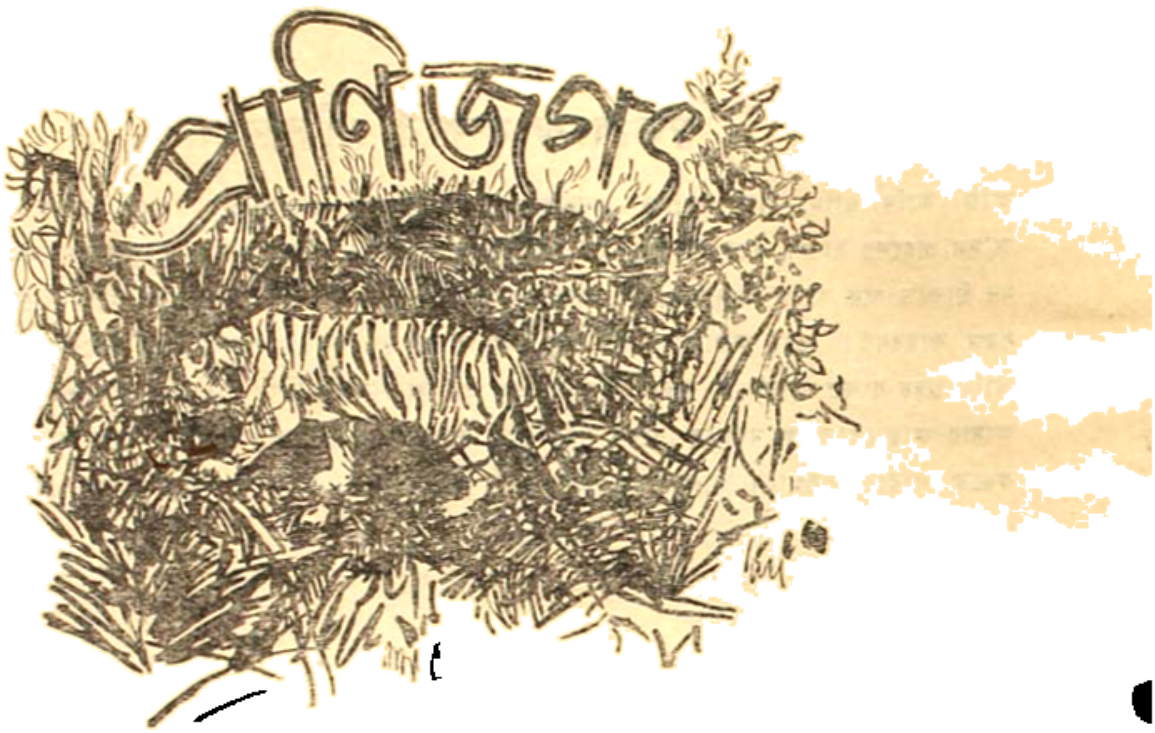

মানুষ সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা হয়ে থাকে কিন্তু প্রাণিজগৎ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সংবাদ রাখি না। অথচ প্রাণিজগতের মধ্যে বিপুল বৈচিত্র্য বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিরাট সমস্যাও দেখা দিয়েছে প্রাণিকুলে। মানুষের সঙ্গে জীবজগতের নূতন নূতন সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে মানুষের উগ্র লোভ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে প্রাণিজগতের কয়েকটি অমূল্য নিদর্শন চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে প্রাণিজগত সম্পর্কে আলোচনা কেবল কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নয়, শিক্ষালাভের জন্য এবং প্রাণিজগৎকে রক্ষা করার মানবিক আবেদনে সাড়া দেওয়ার জন্যও বটে।

এই কথা স্মরণে রেখে প্রাণিজগৎ সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশ করা হোল।

এই প্রসঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চিড়িয়াখানা সম্পর্কে ও চিড়িয়াখানায় রক্ষিত জীবজন্তুর জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

প্রাণিজগৎ কোন পথে ?

ক্রমবিবর্তনের পথে মানুষের আবির্ভাবের বহুপূর্বে এই পৃথিবীতে এসেছিল বন্য-জানোয়ার। একদিন এ পৃথিবী ছিল তাদেরই। ক্রমে মানুষ হয়েছে পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিকারী, অথচ জীবজগতের অংশীদার হিসেবে মানুষের সঙ্গে তাদেরও দাবি রয়েছে এই পৃথিবীর ওপর। কিন্তু আজ পৃথিবীর বহু জীবের প্রাণধারণের ন্যূনতম দাবিও উপেক্ষিত। পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নততর প্রাণী যে মানুষ তার লোভ অবহেলা ও ঔদাসীন্যের ফলে গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জের বৃহৎ কচ্ছপ ও এশিয়ান ব্যাকট্রিয়ান ক্যামেল থেকে শুরু করে ব্রিটেনের গায়ক পক্ষী ও প্রজাপতি পর্যন্ত সমূহ বিনষ্টির পথে।

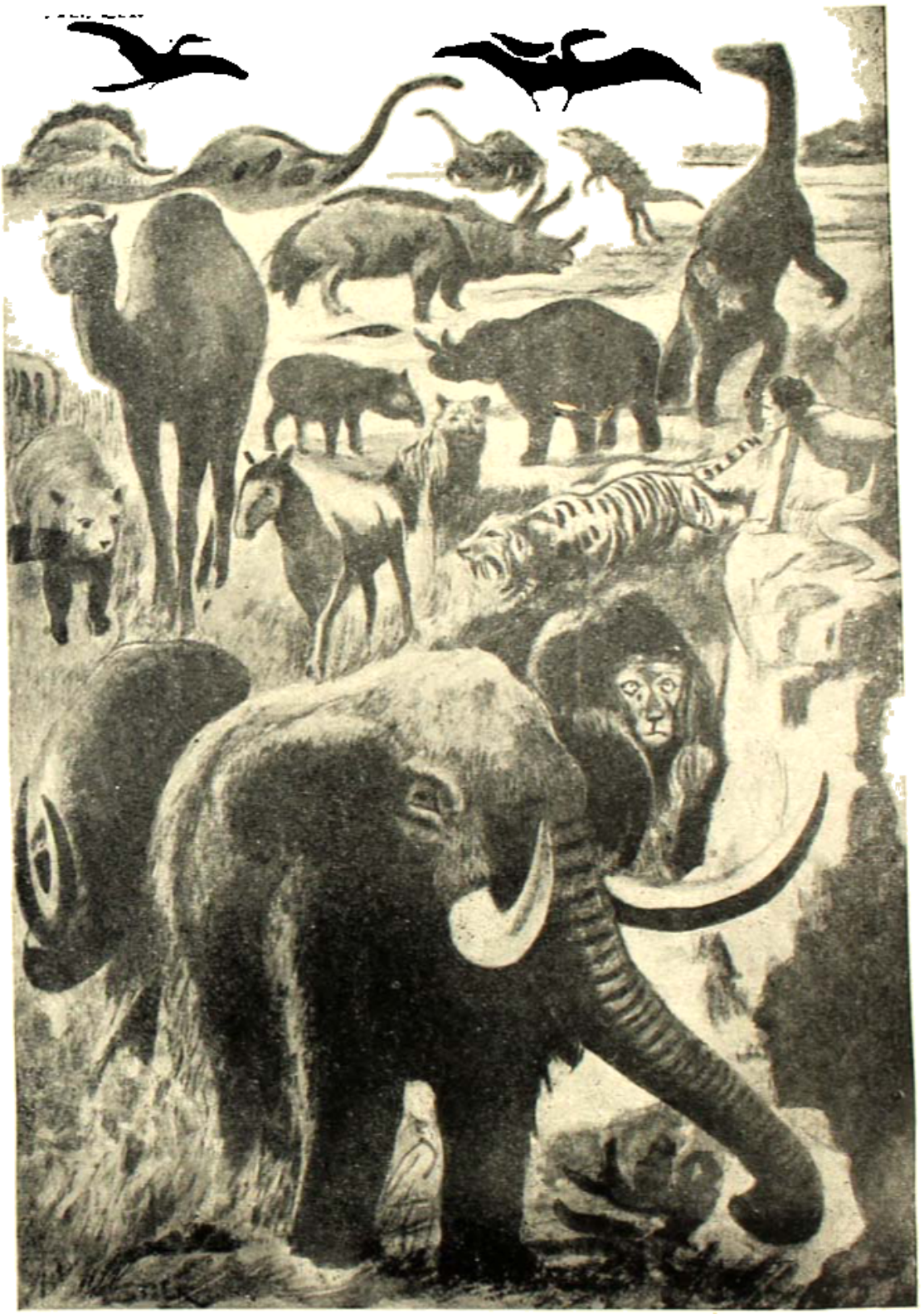

অতীতে কত বিচিত্র জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল এই পৃথিবী—
কালক্রমে এদের অনেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

আপনি জানেন কি
মানুষের লোভ, হিংসা ও
অবহেলার ফলে পশুরাজ
সিংহও আজ বিপন্ন
হতে চলেছে ?

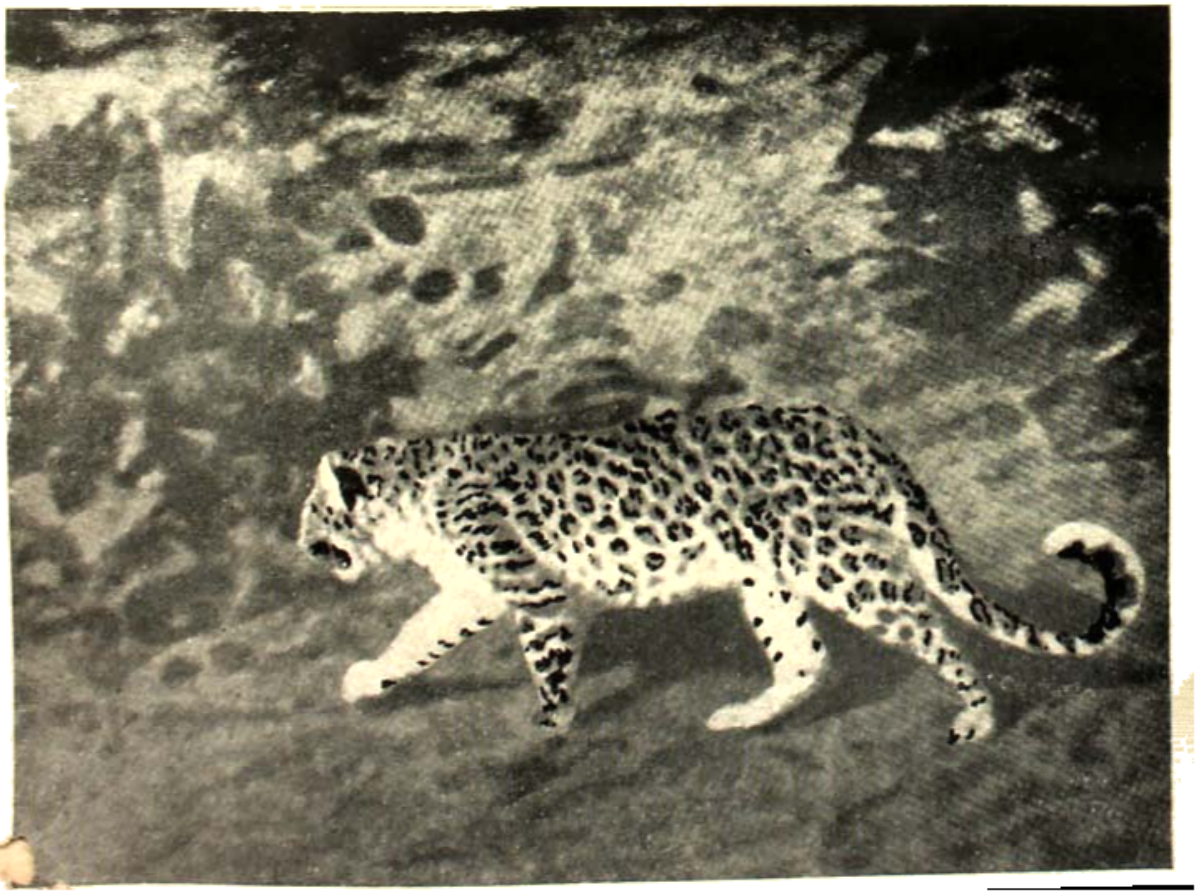

চিতাবাঘের
সংখ্যাও দ্রুত
কমে আসছে।

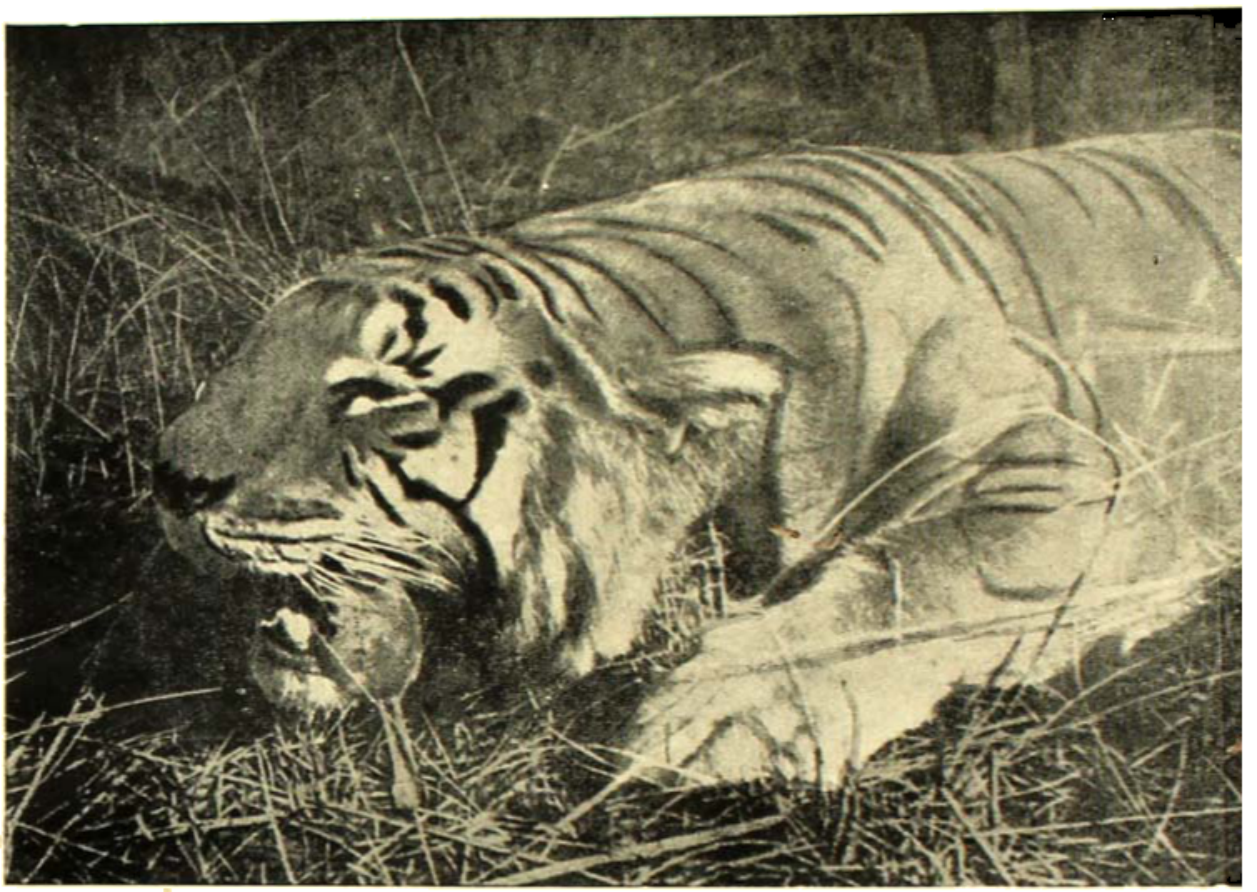

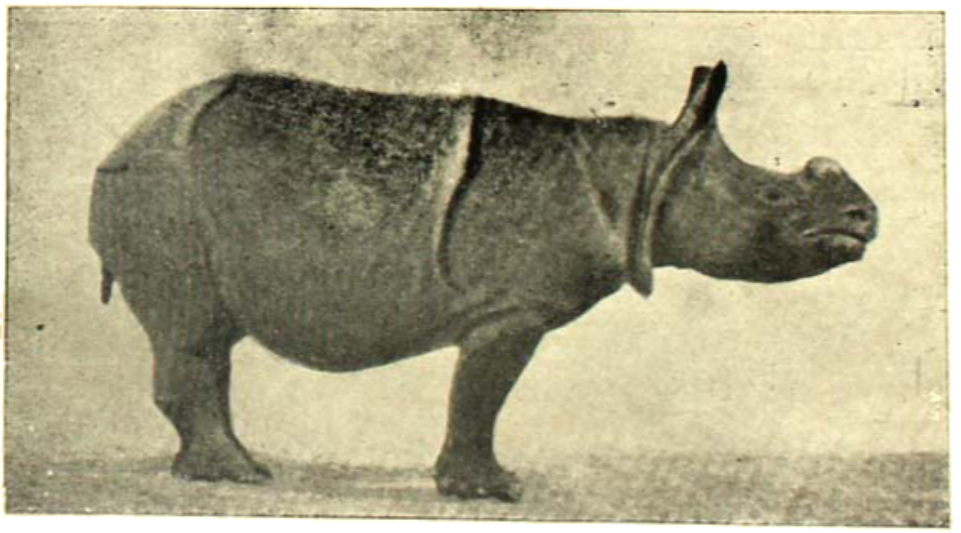

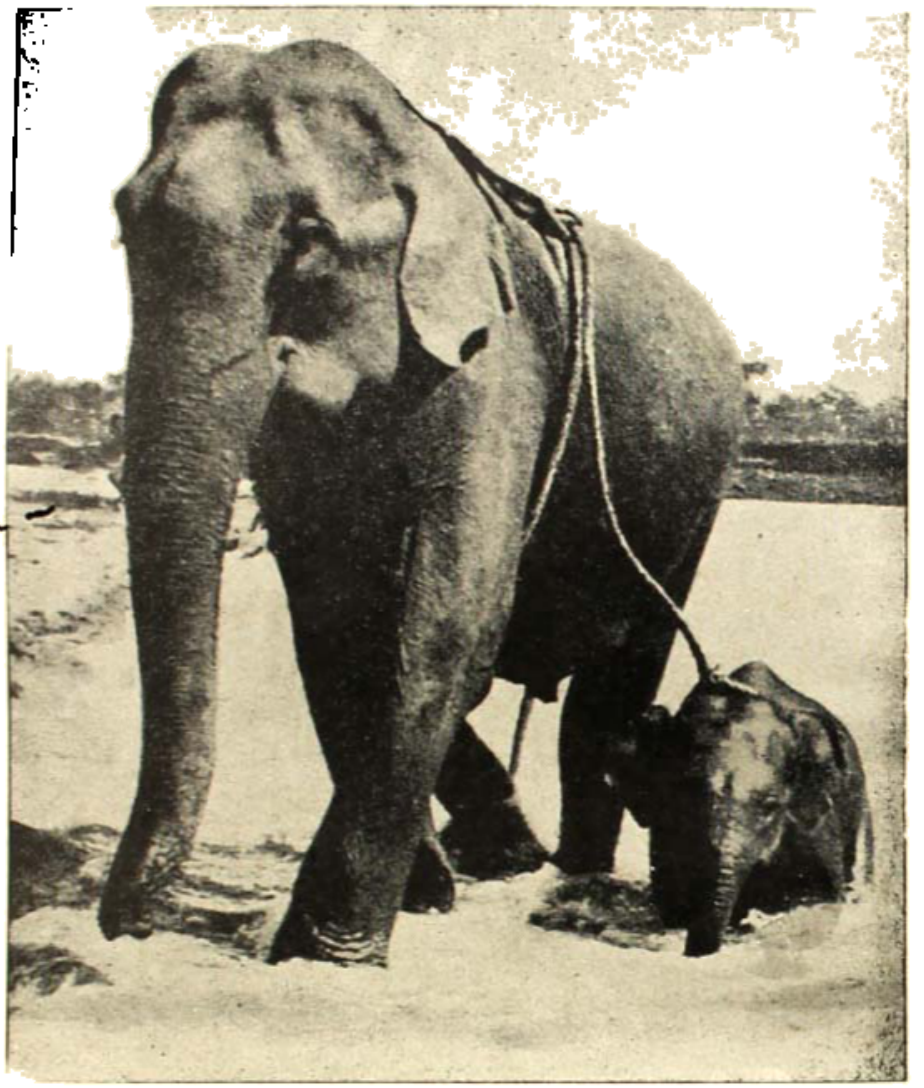

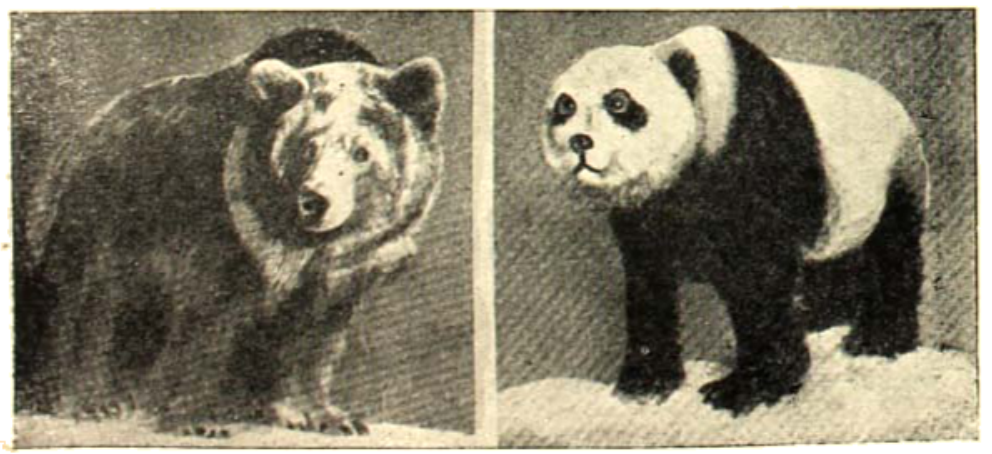

পাণ্ডা ভল্লুক

অধুনা দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডা ভল্লুককে বহু চেষ্টায় ধরা হচ্ছে।

বিগত শতাব্দীর সময় বিশেষ করলে দেখা যায় আজ পর্যন্ত প্রায় ১০০ রকমের প্রাণী পৃথিবী থেকে চিরকালের মত মুছে গেছে। এর মধ্যে ৬৮ প্রকার প্রাণী এত একশ বছরের মধ্যে নিঃশেষ হয়েছে। আরো চমকপ্রদ তথ্য হচ্ছে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ৩৩টি জাতের প্রাণী একেবারে শেষ।

ঠিক এই সময়ের মধ্যেই প্রায় উপরোক্ত সংখ্যক বিভিন্ন শ্রেণীর পক্ষীকুলও চিরতরে অন্তর্হিত।

বহুকাল আগে মারা গেছে এক জাতের সমস্ত পাখী—তার নাম ডোডো, প্রাণের চিরবিলুপ্তির প্রতীকী বেদনা বহন করছে এই নাম।

আরো বহুবিচিত্র ও দুষ্প্রাপ্য প্রাণী—হাতী, হুপিং, ক্রেন, চিতা, ঝাড়া শিংওয়ালা এন্টিলোপ (Oryx), গরিলা, কাশ্মীরীলাল হরিণ (Stag), স্টেলার্স অ্যালবাট্রস, সিনমি জলহস্তী প্রভৃতি আজ মানুষের মূঢ়তা এবং স্বার্থপরতার ফলে একেবারে লুপ্ত হতে চলেছে।

এই ভয়াবহ অবস্থার দিকে বর্তমানে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। জন্তু-জানোয়ারের বিপন্ন অস্তিত্বের প্রতি তার যে বিরাট নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে এ বিষয়ে তাকে সচেতন করতে হবে।

দুষ্পূরণীয় সম্পদ এবং অনুপম বর্ণন গণ্ডারকে মানুষ নির্মমভাবে হত্যা করেছে এবং তাকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। অত্যন্ত অল্পসংখ্যক গণ্ডারই আজ জীবিত। পৃথিবীতে বহু জাতের হাতী ছিল, সব একে একে শেষ হয়ে আজ দুটি জাতে এসে ঠেকেছে। ভারতীয় হাতী ধরা হয় নানা কাজে লাগাবার জন্যে, আর আফ্রিকার হাতীকে হত্যা করা হয় কেবল শিকারের জন্যেই তা ছাড়া আর দাঁতের মূল্যও বড় কম নয়।

বন্দী অবস্থায় হাতীর খুব কমই বাচ্চা হয়। ডোডো পাখির মতই একদিন তারা সব মরে যেতে পারে।

বিলুপ্তির পথে এসে দাঁড়িয়েছে আরবের অরিক্স।

গরিলাকে দেখে মনে হয় খুবই হিংস্র। কিন্তু তার শান্তিতে ব্যাঘাত না করলে সে কখনোই মানুষকে আক্রমণ করে না।

কিন্তু মানুষই হচ্ছে তার নিকৃষ্টতম শত্রু। বাচ্চা গরিলাগুলি বন্দী হচ্ছে তার হাতে, চিড়িয়াখানার শোভাবর্ধন করবে এরা, আর পূর্ণবয়স্কগুলি লুটিয়ে পড়ছে বুলেটের আঘাতে আঘাতে।

পশ্চিম আফ্রিকায় জলহস্তী আজ সংখ্যালঘুদের দলে।

কাশ্মীরী লাল হরিণের শিংগুলি ভারী সুন্দর। শিকারীরা তার পেছনে ছুটল, কিন্তু আশ্চর্যই সেই অরণ্যে, সৌন্দর্যরক্ষার কোন বাসনা তাদের ছিল না, ফলে ওরাও আজ অরক্ষণের মুখে।

হুপিংক্রেন নামে উত্তর আমেরিকার এক জাতীয় সারস পাখি পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ প্রাণীরূপে পরিগণিত। ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্টের ডাইরেক্টর পিটার স্কটের মতে আর মাত্র তিরিশটি পাখি জীবিত আছে। আমেরিকার প্রাচীনতম অধিবাসী এই সারস, আমেরিকার নবীনতম আগন্তুক সভ্য মানুষের হাতে তার সংহার না সংরক্ষণ—এই চিন্তায় আজকের প্রকৃতিপ্রেমী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আকুল হয়ে উঠেছে।

গভীর নৈরাশ্যের মাঝে একটু আধটু আশার আলো দেখা যায়। গতকের লোভে এতকাল শিকারীরা হত্যালীলা চালিয়ে আসছিল স্টেলার্স অ্যালবাট্রসের ওপর। অতি সুন্দর এই পাখীগুলি নির্বংশ

হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা যাতে নিশ্চিন্তে এদের নীড়ে বাস করতে পারে তার জন্যে দরকার মত রেলপথের পরিবর্তন সাধন করবে বিশেষ তোড়জোড় চলেছে। এ ঘোষণায় পক্ষীপ্রেমিক মাত্রেই উল্লসিত।

জায়াণ্ট পাণ্ডা খুবই দুষ্প্রাপ্য জন্তু। ঠিক সময়ে সচেতন না হলে এটিরও নিদর্শন মিলত কেবল মাত্র মাদুঘরে। বিশ শতকের দুর্ভাবনার মাঝে মানুষের শুভবুদ্ধি যে একেবারে আচ্ছন্ন হয় নি তারই প্রতীক বহন করছে পাণ্ডা।

জন্তু-জানোয়ারের এই মৃত্যুর মিছিলের অন্যতম কারণ হচ্ছে মানুষের অবহেলা। প্রকৃতির মাঝে বিরাজ করছে এক ভারসাম্য। মানুষ যখন এই ভারসাম্য নষ্ট করে তখনই বিপর্যয় উপস্থিত হয়। ধরা যাক জেব্রার কথা। দলে দলে এরা যে প্রান্তরে চরে বেড়ায় সেখানে প্রকৃতি তাদের জন্যে রেখেছে সবুজ ঘাস। মানুষ সেই বিশাল মাঠকে করলে গৃহপালিত পশুচারণ ক্ষেত্র। গোরুতে সমস্ত ঘাস খেয়ে তৃণক্ষেত্র মরুভূমি করে ফেললে। ফলে অনাহারে মারা পড়ল জেব্রা।

মাঝে মাঝে হৃদয়বিদারক দৃশ্য অরণ্য অঞ্চলে দেখা যায়। একটা কঙ্কাল পড়ে আছে মাটিতে, অদূরে তার জলের উৎসটি শুকনো। হয়তো সে জল খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পথেই লুটিয়ে পড়েছে, পৌঁছতে পারে নি জলের ধারে, কিংবা গর্তের কাছে এসে জল না পেয়ে প্রাণ হারিয়েছে আকণ্ঠ তৃষ্ণায়।

পানীয় জল চাই অরণ্যে, আর চাই অবগাহনের সুযোগ। শুধু পানীয় জলে জলহস্তীর তৃষ্ণা মিটবে না। শুধু তাই নয়, নদী শুকিয়ে গেলে গাছপালা জন্মাবে না, মাছ অদৃশ্য হয়ে যাবে, তৃণভোজী-দের খাদ্য মিলবে না, মিলবে না এতটুকু ছায়া, যে সব প্রাণী মাছ খায় তাদেরও ঘটবে চরম খাদ্যাভাব। আফ্রিকার কেনিয়ার Tsavo East National Park-এ দশ হাজার জন্তুজানোয়ারের মৃত্যু হয়েছে। এটা মাত্র এ বছরের প্রথম ছ'মাসের খবর। প্রতি বছর মাত্র ১২০টি গণ্ডার শাবক পৃথিবীর আলো দেখে, আর পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় বছরে পাঁচশোটি। এদেরও বংশ শেষ হয়ে এল।

মানুষের আবিষ্কৃত বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য লক্ষ লক্ষ বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, লক্ষ লক্ষ পাখি মারা পড়ছে তাতে, অথচ ওই পাখিই ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ বিনাশ করে মানুষের উপকার করে। চতুর্দিকে আজ বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারিং প্রজেক্টের মহিমা। এতেও প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

আজকাল ট্যুরিস্ট আকর্ষণের জন্যে প্রতিটি দেশ তার শিল্প নিদর্শন সাজিয়ে দোকান খুলেছে। উদ্দেশ্য, বিদেশীদের কাছে নিজের দেশের কুটিরশিল্পের নমুনা তুলে ধরা। আফ্রিকার শহরে শহরে এক ধরনের অদ্ভুত দোকান দেখা যায়—সে পণ্য যাঁটি দেশজাত সন্দেহ নেই কিন্তু তার উপাদান বহু প্রাণীর অঙ্গ, রক্ত, অস্থি, চর্ম··হাতির পা, জেব্রার লেজ, গণ্ডারের খড়্গ, হাতীর দাঁত, সিংহের চামড়া ও থাবা—সবই পাওয়া যায় দোকানে, বিদেশী ট্যুরিস্ট চড়া দামে এসব কিনে নিয়ে যায়, দেশে ফিরে হয়তো সবলকে তা লাগিয়ে দেয়—এ সবই তার শিকারের ফসল।

একদিকে এই লোভ, আর একদিকে মানুষের অন্ধ বিশ্বাস—এ দুয়ে মিলে আরণ্য প্রাণীর মৃ· ত্যুরান্বিত করেছে।

এশিয়ার ব্যবসায়ীদের অন্ধ বিশ্বাস, গণ্ডারের খড়্গ অসীম শক্তি। এ জিনিস খেলে তাদের যৌবনশক্তি ফিরে আসবে। খড়্গচূর্ণ তারা জলে মিশিয়ে পান করে।

আফ্রিকার অরণ্যে ঘুরে বেড়ায় মানুষ, হাতে তাদের অস্ত্রশস্ত্র, কি করে জন্তুকে ফাঁদে ফেলতে হয়, কি করে তাদের নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দিয়ে দিনে দিনে হত্যা করতে হয়—এসব তথ্য তাদের আয়ত্তে।

ফলে মুক্তার ফাঁদে ধরা পড়ে বাঁদরটা, তার গলায় চেপে বসে শক্ত তার, অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার মৃত্যু হয়। চামড়াটা অবশ্য কালোবাজারে বিক্রি হয় চড়া দামে।

এই হত্যাকাণ্ড বন্ধের একটিমাত্র পথ খোলা আছে। সেটি হচ্ছে সংরক্ষিত অরণ্যে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, আর এজন্যে দরকার বিরাট সংগঠনের।

ইংলণ্ডে সম্প্রতি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্যে কোর আন্দোলন শুরু হয়েছে, প্রকৃতি-প্রেমিক মানুষ একে দ্বিতীয় ক্রুসেড অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধ আখ্যা দিয়েছে। এজন্যে প্রচুর অর্থ, বিরাট সংগঠনী শক্তি এবং প্রাণি-জগৎ সম্পর্কে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন। আর সর্বোপরি চাই প্রেম, নিখিল বিশ্বের বেদনার অনুভব।

নির্মলেন্দু মায়া।

বিস্ময়ের বিষয় কোন জন্তু কি ভাবে চলে—এ বিষয়টি এখনও অবহেলিত হয়ে গেছে। প্রাণি জগতে শারীরিক গঠন বৈচিত্র্যের সঙ্গে সমতা রেখে চলারও বহু বিচিত্র ছন্দ বর্তমান। যারা বেঁটে মোটা আর ছোট পা-ওয়ালা তারা চলে হাঁসের মত দেলে-দুলে। হাতীর মত যারা ভারী আর মোটা তারা সব সময় দুটি কিংবা তিনটি পা রাখে মাটির ওপর। আর যারা চিতার মত তারা ছুটতে পারে লাফিয়ে লাফিয়ে।

হাতী ছুটতে পারে ঘণ্টায় তিরিশ মাইল গতিতে। চিতা ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ছোটে।

এখন পিলকার-প্রুফ ক্যাপযুক্ত শিশিতে পাওয়া যায়

- ঝরঝরে লেখা হয়
- তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়
- সাবলীল গতিতে কালি নামে

রেনবো কালি

রেনবো ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ
২২এ, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্যের তথ্য-সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক আলোচনা ও আধ্যাত্মিক রূপায়ণ। [১৫৲]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

এই চিরায়ত কাব্য ও ধর্মগ্রন্থটিকে সুন্দর চিত্রাবলী ও মনোরম পরিবেশে মূলরুচিসম্মত একটি অনিন্দ্য প্রকাশন করা হইয়াছে। সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। শিল্পী শ্রীহর্ষ রায়ের বহু রঙীন ও একবর্ণ চিত্রে শোভিত। প্রকাশন পারিপাট্যে ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। [২৲]

রমেশ-রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত; তাঁহার যাবতীয় উপন্যাস ঔপনিবেশিকালীন শেষ সংস্করণ হইতে গৃহীত ও একত্রে গ্রথিত মোট ছয়খানি উপন্যাস : বঙ্গবিজেতা মাধবীকঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত, সংসার এবং সমাজ। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। [২৲]

সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে তিন হাজারের অধিক শব্দসংখ্যা যোগ হইয়া চৌতাল্লিশ হাজারের মত শব্দের ব্যাখ্যা ও ব্যুৎপত্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। লাইনো হরফে ছাপা; সুদৃশ্য বাঁধাই। [৮৲০]

SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY

বহু প্রশংসিত উচ্চ-মানবিশিষ্ট ইংরেজী-বাঙ্গালা আধুনিক শব্দকোষ।
১৬৭২ পৃঃ [১২৲০]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সংকলন, টীকা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক পদসূচী সম্বলিত পদাবলী সাহিত্যের আধুনিকতম আকরগ্রন্থ। অধুনা অপ্রাপ্য 'পদকল্পতরু' ও 'পদামৃত-মাধুরী' হইতেও অধিকতর পদ সংযোজিত এবং বহু অপ্রকাশিত পদ এই প্রথম প্রকাশিত। ডিমাই অক্টেভো আকারে লাইনো হরফে মুদ্রিত হওয়ায় সহজ ব্যবহার্য হইয়াছে প্রকাশনা সৌষ্ঠবে অনুপম। [২৪৲]
গ্রন্থাগার, পদাবলী-রসিক ও কীর্তনীয়াগণের অপরিহার্য গ্রন্থ।

পুস্তক-তালিকার জন্য লিখুন :
সাহিত্য সংসদ
৩২-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায়

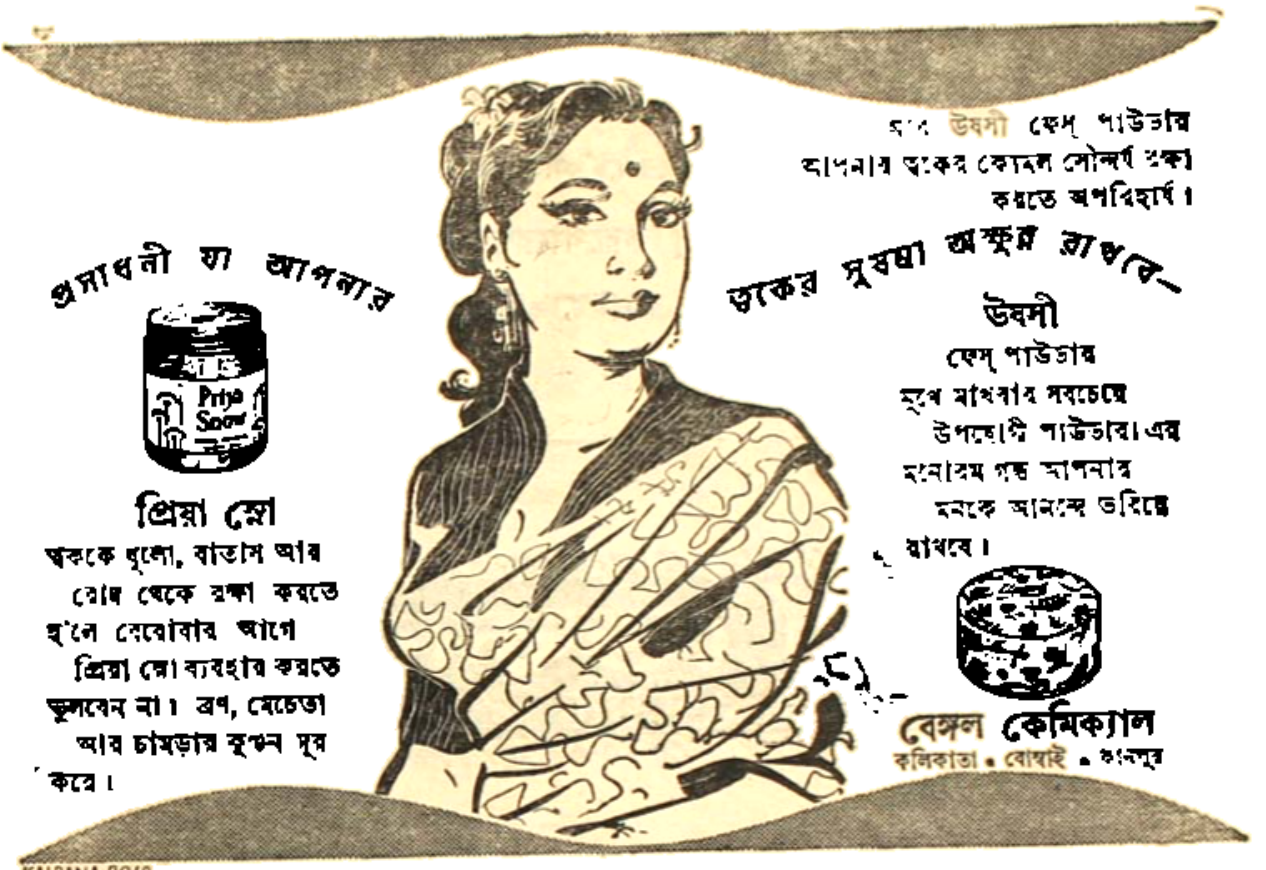

KALPANA.BCJ8

॥ একটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ ॥

বাংলাসাহিত্যের বৃহত্তম উপন্যাস

বিমল মিত্রের

কড়ি দিয়ে কিনলাম

॥ প্রথম খণ্ড—ষোল টাকা ॥

ক্রেতাগণ এই বইয়ের ভি: পি: অর্ডার দিবার সময় অনুগ্রহ পূর্বক
অন্যূন তিন টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এনামেলের বাসন

দামে সস্তা ● ভারে লঘু ● ব্যবহারে টেঁকসই ● বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর।

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিমিটেড

২৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—২

মজুমদার ডেকরেটরস

৬৫ এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ফোন-৫৫-২৫৪৯

বস্ত্রশিল্পে অগ্রগতি

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলসের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। গত ৫০ বছরেরও উপর বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতি শাড়ী আর নানারকম বস্ত্রসম্ভার লক্ষ লক্ষ গৃহের শুধু চাহিদা মেটাইনি সেইসঙ্গে আনন্দও বিতরণ করেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি আর প্রয়োজনও বদলেছে আর সেইমত বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস ও নিজেকে সম্প্রসারিত করেছে। সম্প্রতি নানারকম নূতন যন্ত্রপাতি আমদানী করে দেশের চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

*

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেড্

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

একালের কথাসাহিত্যে, গল্পে ও উপন্যাসে প্রেম ও প্রেম; বৃহৎ ও মহৎ-এর অসামান্য দ্যোতনায় বিভূতে সিন্ধুর যার প্রবেশের ঐতিহ্যনিষ্ঠ কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জীবন-দর্শন তাঁর সাহিত্য শিল্পকর্মে এনেছে এক অনন্য তাৎপর্য যা আধুনিক কালের সাহিত্যকর্মে ও জীবনধর্মে বিরল হয়ে আসছে। শ্রেষ্ঠত্বের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পেয়েছেন তারাশঙ্কর। এই শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পীর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি আমরাই প্রকাশ করেছি।

আরোগ্য নিকেতন (৭ম মু:) ৭·০০
[আকাডেমী) রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ]

মহাশ্বেতা (৩য় মু:) ৫·৫০

রচনা সংগ্রহ (১ম খণ্ড) ১০·০০

সপ্তপদী (১৮শ মু:) ২·৫০

বিস্ফোরণ (৩য় মু:) ২·০০

০ সদ্য প্রকাশিত ০

সীতা দেবীর
মহামায়া

নবগোপাল দাসের
প্রেম ও প্রণয় ৪·০০

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
আর চাঁদ ৩·০০

বিমল ভট্টাচার্যের
রানী পালঙ্ক ২·৫০

ধীরেশচন্দ্র শর্মাচার্যের
গোধূলির রঙ ৩·৫০

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নিকষিত হেম ৩·০০

০ পুনর্মুদ্রণ ০

সমরেশ বসুর
সওদাগর (২য় মু:)

সতীনাথ ভাদুড়ীর
জাগরী (১০ম মু:) ৪·০০

আনন্দকিশোর মুন্সীর
ভেলকি থেকে ভেনজ (৪র্থ মু:) ৬·৫০

নরাসিংহের
ভারতম (৪র্থ মু:) ৬·০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
নব সন্ধ্যায় (৪র্থ মু:) ৮·০০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
প্রাগৈতিহাসিক (৪র্থ মু:) ৩·০০

মনোজ বসুর
সোভিয়েতের দেশে দেশে (৩য় মু:) ৬·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
লিলালিপি (৫ম মু:) ৬·৫০

সীতা দেবীর
অলখ ঝোরা (১ম সংস্করণ) ৫·৫০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিপিনের সংসার (৪র্থ মু:) ৪·০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর
চতুরঙ্গ (৩য় মু:) ৪·৫০

নীলকণ্ঠের
অন্ত ও প্রত্যহ (২য় মু:) ৫·০০

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-বারো ॥

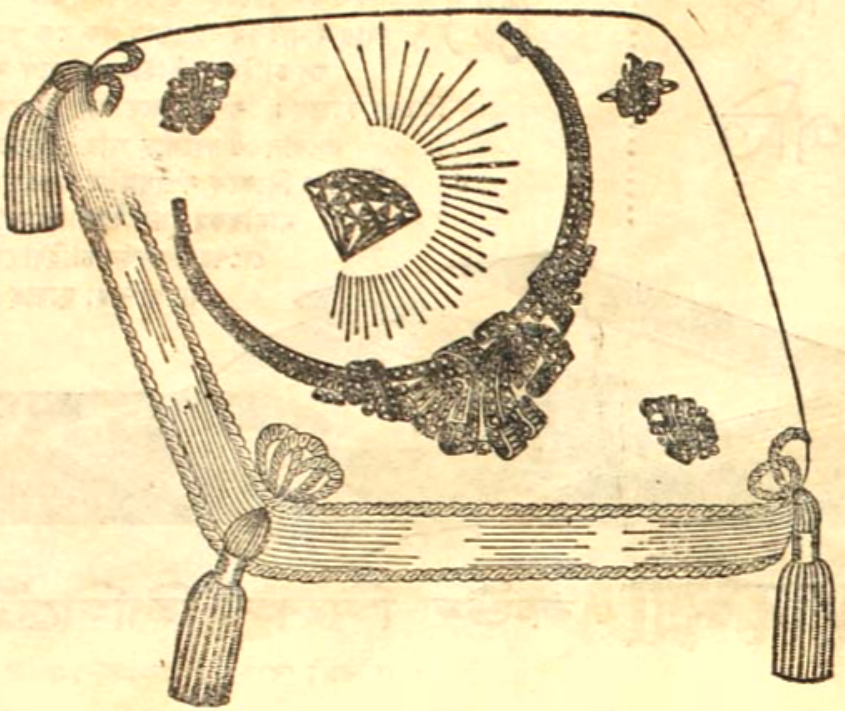

আধুনিকতম রুচির সর্ব্বপ্রকার স্বর্ণ-অলঙ্কার, মণি, মুক্তা, হীরা,
জহরত প্রভৃতির অপূর্ব্ব সম্ভার।
বিবাহ ও উৎসব অনুষ্ঠানে প্রিয়জনকে উপহার দিবার
নানাপ্রকার অভিনব ও চিত্তাকর্ষক অলঙ্কার।

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেন্টস্

স্থাপিত ১৮৮২

১-এ, বেন্টিক ষ্ট্রীট (মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস্), কলিকাতা।

ফোন : ২২-২২৭০

ব্রাঞ্চ :—৮৪, আশুতোষ খাস্তগির রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ফোন : ৪৭-১২৫৮

উৎকৃষ্ট বার্লি

বলিতেই

লিলি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, টাট্‌কা ও স্বাস্থ্যপ্রদ

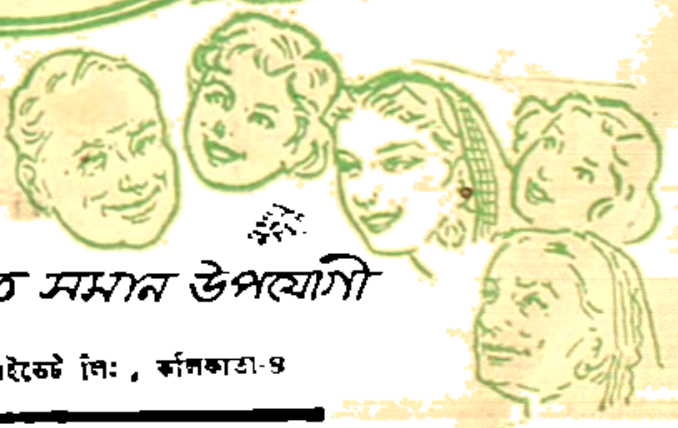

সকল বয়সে ও ঋতুতে সমান উপযোগী

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

GALPA-BHARATI Bengali Monthly. Regd. No. C3643. Price : Re. 1/- Feb.

PHONE 55-

1987

সুঠাম সুন্দর দেহ

গড়ে তুলতে

লক্ষ্মীঘি

অপরিহার্য্য

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী • কলিকাতা - ১২ • ফোন ২২-৭২৪৩

এখন লক্ষ্মী ঘি "আগ মার্ক" লেবেল যুক্ত টিনে বিক্রয় হয়।

Printed by :—
KARTICK ART PRESS, CALCUTTA-12